KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫ সার্কাস মার্কেট প্লেস, কল-১৭
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 7/3 7/4 8/1 8/2	Year of Publication : Aug 1984 July - Sep 1984 Feb 1985 April 1985
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিভাব

সম্পাদক ॥ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

২৬

The Source of instant power

VINYLITE

Powered by

Kirloskar-Cummins Engine & alternators
Available in Single / Three phase
220/440 Volts from 1 KVA to 4000 KVA
With Kirloskar—Cummins
Engines & Alternators

CONTACT AUTHORISED OEM

WESTERN INDIA MACHINERY CO.

24, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-700013
Phone : 27-8931, 27-8962, Gram : DHINGRASON

শারদীয়র শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন)
৩২, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

সূচীপত্র

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
কার্তিক ১৩৯১ শরৎকালীন সংখ্যা
বিভাব

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রবন্ধ

'জলাভূমির কবিতা' ॥ অশোক মিত্র ৩
উষার দুয়ারে পাখির মতন ॥ নিতাপ্রিয় ঘোষ ৬৫
দেবী : তত্ত্বে, নৃতত্ত্বে ॥ দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ৯৭

গল্প

মানত ॥ মহাশ্বেতা দেবী ১৭
সোনামণির অশ্রু ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৪১

কবিতাগুচ্ছ

মল্লিকা সেনগুপ্ত'র কবিতা ॥ উৎপলকুমার বসু ৫৩
মল্লিকা সেনগুপ্ত'র দীর্ঘ কবিতা ৫৪

বিশেষ রচনা

রামকিংকর : কিছু স্মৃতি ॥ সম্বরণ মল্লিক ৩২

আলোচনা

সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান ॥ শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ ৬৩
দুর্নীতি ও তার প্রতিকার ॥ বিচিত্র গুপ্ত ১১৯

সাময়িক প্রসঙ্গ

অন্নদাশঙ্কর ॥ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৪৯

অনুবাদ

এই মর্ত্যের রাজত্ব ॥ আলেহো কার্পেন্তিয়ের উপন্যাস
অনুবাদ এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনা
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বিশেষ ক্রোড়পত্র ১—১০৩)

সম্পাদকমণ্ডলী

পবিত্র সরকার,
শুভকুমার বসু, শচীন দাশ
প্রদীপ দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ মজুমদার

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলকাতা-১৭

সম্পাদক
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী
অলংকরণ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস কলিকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত এবং সত্যনারায়ণ প্রেস, ১, রমাপ্রসাদ রায় লেন এবং ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, এবং করুণা প্রিণ্টার্স, ১৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা থেকে মুদ্রিত।

প্রবন্ধ

'জলাভূমির কবিতা' ?

অশোক মিত্র

অমুক গুরুর তমুক ভক্তশিষ্য একশো তেইশ বছর আগে ঠিক কবে কত তারিখে কোন্ বাগানবাড়িতে দিব্যদর্শন করেছিলেন, তা পর্যন্ত প্রতিদিন খবরের কাগজে বিস্তারিত আলোচনার বিষয়। কিন্তু, তা হ'লেও, একদেশদর্শী সমাজ আমাদের। অন্য অনেক জরুরি ইতিহাস তলিয়ে যায়। সুতরাং তেমন কী লাভ এটা জোর ক'রে মনে করিয়ে দিয়ে যে আজ থেকে ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে, 'পুতুলনাচের ইতিকথা' বেরোতে শুরু করেছিল ? কিংবা সেই সঙ্গে এটা যোগ ক'রে যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়স তখন ? 'পুতুলনাচের ইতিকথা' অবশ্য সৃষ্টি হিশেবে তলিয়ে যায়নি, যেতে পারে না। বাঙালিদের অশিক্ষার ঋতু শেষ হ'লে, হয়তো আজ থেকে দশ বছর বাদে, অথবা কুড়ি বছর বাদে, নয় তো আরো যোজন-যোজন সময়ের সীমা অতিক্রম ক'রে, যতদিন বাংলা ভাষা বেঁচে থাকবে, 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় বঙ্গভাষীকে ফিরতেই হবে, কারণ, ভেবেচিন্তেই বলছি, বাঙালির সাহিত্যকর্ম, গদ্যের পরিষঙ্গে, যদি কোথাও মহত্ত্ব ছুঁয়ে থাকে, তা এই গ্রন্থে। কিন্তু এই প্রত্যয়োক্তি শোনবার জন্য বর্তমান মুহূর্তে ক'জনের আগ্রহ ? সংবাদপত্র ও সাহিত্যপত্রিকা একাকার হয়ে গেছে, কিস্তিবন্দী হয়ে সেখানে বুম্বাইয়ের বাঘা-বাঘা ফিল্মি নায়কদের জীবনচর্চা তথা জীবনদর্শন নিয়ে ভারি-ভারি প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা 'পুতুল নাচের ইতিকথা' নিয়ে সময় নষ্ট করবার তাদের অবকাশ কোথায় ? উপন্যাসটি রচিত হবার এই অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হবার বছরে, আলাদা ক'রে

বাজারে তা পাওয়া যাচ্ছে কিনা তা পর্যন্ত আমার জানা নেই। যদি পাওয়াও যায়, কৌতূহল রইলো বৎসরান্তে খোঁজ নেবো সাকুলো ক'টি কপি গোটা বছর ধ'রে বিক্রি হলো। আজ থেকে আঠাশ বছর আগে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত আত্মহনন, মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয়, সম্ভবত এই কারণে যে তিনি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন, জানতেন জাতি হিশেবে আমরা কোন্ অধঃপাতের দিকে এগোচ্ছি।

নিশ্চয়ই ভুল বলা হলো। অন্তত 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় বিষাদাশ্রিত যে-বাণী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত, তা অগ্রসরমান সর্বনাশের নয়, স্থবির-নিশ্চল পঙ্ককুণ্ডের : 'রোগে ভুগিয়া অকারণে মরিয়া ওরা বড় আনন্দে থাকে। স্ফূর্তি নয়—আনন্দ, শান্ত স্তিমিত একটা সুখ। স্বাস্থ্যের সঙ্গে, প্রচুর জীবনীশক্তির সঙ্গে ওদের জীবনের একান্ত অসামঞ্জস্য। ওরা প্রত্যেকে রুগ্ন অনুভূতির আড়ত, সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে ওদের মনের বিস্ময়কর ভাঙা-গড়া চলে, পৃথিবীতে ওরা অস্বাস্থ্যকর জলাভূমির কবিতা : ভাপসা গন্ধ, আবছা কুয়াশা, শ্যামল শৈবাল, বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা, কলমি ফুল, সতেজ উত্তপ্ত জীবন ওদের সহিবে না'।

তবে কি 'পুতুল নাচের ইতিকথা' রূপকাহিনী, গাওদিয়া গ্রাম সাংকেতিক বাঙালিসমাজ, যে-সমাজের মানসিকতার সারাৎসার পঞ্চাশ বছরেও সামান্যতম পরিবর্তিত হয়নি, যুদ্ধ-দেশভাগ-সহস্র সামাজিক-আর্থিক সংকট-রাজনৈতিক উপপ্লব-অপপ্লাবন সত্ত্বেও না? 'সতেজ উত্তপ্ত জীবন' নয়, একই বিন্দুতে নিরংশক, নিঃসাড়, থুবড়ে প'ড়ে থাকা? আমাদের ঘিরে সমগ্র পৃথিবী এগোচ্ছে, আমরা স্থিত আছি, থাকবো, আত্মকলহে দীর্ণ, আত্মস্তরিতার কুস্তিপাকতৃপ্ত, অপাপবিদ্ধ-ঊর্ধ্বহিতাহিত? 'পুতুল নাচের ইতিকথা' কি নিছক এই ইঙ্গিত দিচ্ছে? তাই কি, উপস্থিত সামাজিক অনুশাসন যা-ই হোক না কেন, আমি সম্মোহিত-আবেগমূক, বার-বার এই উপন্যাসে ফিরে-ফিরে যাই, আমার সেই দশ বছর বয়স থেকে শুরু ক'রে? এবং প্রতিবারই, আমার দশ বছর বয়সে, সতেরো বছর বয়সে, উদ্দাম পঁচিশ বছর বয়সে, ঈষৎ-সংহত মধ্যতিরিশে, চল্লিশোর্ধ্বের সায়াহ্ন-শঙ্কিত মুহূর্তে, এবং এই ষাটের কাছাকাছি স্তব্ধ প্রহরে, একই প্রত্যয়ে নিজেকে সান্ত্বনা জানাই : শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে, বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে যদি কোনো সৃষ্টিকে ধ্রুপদচিহ্নিত করতে হয়, যে-ধ্রুপদের প্রধান চরিত্রলক্ষণ শেষের পরেও শেষহীনতার আশ্বাস, তা 'পুতুল নাচের ইতিকথা'। এবং তার কারণ কি এই যে আমরা গাওদিয়া গ্রাম অতিক্রম ক'রে নিকষ সাম্প্রতিকতায় অতি

অবলীলার সঙ্গে চ'লে আসতে পারি? টাইপ নিয়ে গল্প, টাইপ কী ক'রে তৈরি হয় তা নিয়ে উপন্যাস, এই প্রজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করার সঙ্গে-সঙ্গে এটাও অনুধাবন করতে পারি, নিশ্চল পঙ্ক-কুণ্ডের মধ্যেও এক প্রবহমানতা আছে, স্থাবির্যের প্রবহমানতা, বাঙালিসমাজের প্রকৃতিগত কাঠামো অনড় থেকেছে এই পঞ্চাশ বছর ধ'রে, এটাই তা হ'লে বাঙালি নিয়তি, পুতুলনাচের নিথড় ক্রীড়নক আমরা, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়ছি, পরনিন্দা-পরচর্চা করছি, কিন্তু নিষ্ক্রমণ অসম্ভব, পালাতে পারছি না, সুতোর জাল ছিঁড়ে বেরোতে পারছি না, শশী ডাক্তারের মতো প্রস্থানের সমস্ত আয়োজন আমরা বাতিল ক'রে দিই, তারপর একদিন পুরোপুরি নির্বাপিত হয়ে যাই? 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র সর্বশেষ বাক্যযোজনা : 'মাটির টিলাটির উপর উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না,' তা হ'লে কি ধ'রে নিতে হবে এই নিবে যাওয়া, মিলিয়ে যাওয়া, নিস্তেজ হয়ে যাওয়ার মধ্যেই বাঙালি সমাজের নির্বাণ? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য়, তা-ই বলতে চেয়েছিলেন? বর্তমানের অক্ষম কুম্ভিপাকই ভবিষ্যৎ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পৃথগীকরণের বাইরে, আমরা যে-যেখানে আছি, সেখানেই থাকবো? তাই কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায়-অমোঘ আত্মহনন মাদকবিষের অবরাহিকা ব্যবহার ক'রে?

কিন্তু, ধ্রুপদের এটাও তো চরিত্রলক্ষণ, সমন্বয়হীনতাকে পরম্পরায় বিধৃত করা। 'পুতুলনাচের ইতিকথা' নিয়ে তর্ক জুড়তে ব'সে, শশী-কুসুমের আপাত-নিষ্ফল উপাখ্যানকে কেন বাড়তি প্রাধান্য দেবো, কেন মতি-কুমুদের বেপরোয়া দুঃসাহসকে কম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করবো? কখনো-কখনো সন্দেহ হয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের কাছেই হেরে গিয়েছিলেন, যে-দ্বন্দ্বই জীবন, যে-দ্বন্দ্ব যে-কোনো ধ্রুপদী সৃষ্টির প্রধান বৈশিষ্ট্য, সেই দ্বন্দ্বের পরাক্রমে তিনি বিধ্বস্ত হয়েছিলেন, হয়েছিলেন ব'লেই তাঁকে স্বীকার করতে হলো 'জীবন-যাপনের প্রচলিত নিয়ম-কানুন', পুতুলনাচের ব্যাকরণ, কুমুদ-মতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কুমুদ মতির কাহিনী, অকপটে তাঁকে স্বীকার করতে হলো, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় 'প্রক্ষিপ্ত'।

তা ছাড়া, শশীর বাবা গোপাল দাস? সুদখোর গোপাল দাস, অত্যাচারী গোপাল দাস, হয়তো বা ব্যভিচারী গোপাল দাস, সংসার সম্পর্কে যার এত মমতা, সম্পত্তির প্রতি এত লোভ, যে-লোভ আসক্তির অধিক, সেই মানুষও হঠাৎ, শশীকে অবাক ক'রে দিয়ে, সেনদিদির ছেলে, যা সম্ভবত তার জারজ সন্তান, অথবা

তা-ও না, তাকে সঙ্গে ক'রে উধাও হয়ে গেল। 'সেই যে গেল গোপাল আর সে ফিরিল না। সংসারী গৃহস্থ মানুষ সে, সমস্ত জীবন ধরিয়া ফলপুষ্পশস্যদাত্রী ভূমিখণ্ড, সিন্দুকভরা সোনা রূপা, কতকগুলির মানুষের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক দায়িত্ব বাধ্যবাধকতা প্রভৃতি যত কিছু অর্জন করিয়াছিল সব সে দিয়া গেল শশীকে, মরিয়া গেলে যেমন সে দিত।' এটাও কি পুতুলনাচ? ঢোঁক গিলতে হবে এ ধরনের কোনো ব্যাখ্যা মেনে নিতে হলে যে নিয়তি আমাদের বাধ্য করে, নিয়ন্ত্রণ করে, গোপাল দাসের অকস্মাৎ-নিষ্ক্রমণ নিয়তিবিধান, অতএব পুতুল-নাচেরই অন্যতর দৃষ্টান্ত। বরঞ্চ, এই উক্তি কি ঘোর দুস্পর্ধা হবে, গোপাল দাস-শশীর পিতাপুত্রসম্পর্ক এ পদী দ্বান্দ্বিকতারই প্রকাশ, এই দ্বন্দ্বে শশীর পরাজয় তার পিতার কাছে, এবং, হয়তো, সেই সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুলনাচের যে-সম্পাদ্য, তারও পরাজয়? জীবনের জটিলতা ক্রীড়নকবৃত্তি পেরিয়ে, মানুষ নিঃসাড় নয়। মানুষের প্রক্রিয়ায় বুদ্ধির পাশাপাশি আবেগ আলোড়ন তোলে, বিবেক এবং ষড়রিপুর মধ্যে সতত সংঘাত, এই সংঘাতের উপসংহারে কে কোথায় পৌঁছবে তা বহিঃপ্রকৃতি কর্তৃক নির্ধারিত, এই অনুশাসন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রগুলি কিন্তু মানেনি। যদি কাউকে, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র প্রেক্ষিতে, পরাজিত নায়ক ব'লে অভিহিত করতে হয়, তা হ'লে তা সুতরাং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই করতে হয়। অথচ এই উপন্যাসে যা ঘটলো তা লেখকের পরাভব ব'লে অভিহিত করাও মনে হয় ঠিক হবে না, তাঁর পূর্বসিদ্ধান্তের বন্ধন থেকে তাঁর চরিত্রগুলি মুক্তি পেল, কিন্তু তাদের মুক্তি দেওয়া হ'লো ব'লেই তো তারা নিজেদের নির্ধারিত ভূমিকা ছাড়িয়ে যেতে পারলো, এটাই তো উপন্যাস, যেখানে টাইপ কী ক'রে টাইপ হয় তা-ই শুধু ব্যক্ত হয় না, টাইপ কী ক'রে পাল্টে যায়, পাল্টে গিয়ে অন্য টাইপে পরিণত হয়, তাও সমান সুষ্ঠুতার সঙ্গে উচ্চারিত হ'তে পারে।

'পুতুলনাচের ইতিকথা'র মহত্ত্ব, আমার বিবেচনায়, এখানেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাসক্তি শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছে এই গ্রন্থে। চরিত্রগুলি পুত্তলীবৎ আচরণ করতে রাজি নয়, এটা আঁচ করতে পেরেছিলেন তিনি, তাঁর অহমিকা তাদের সোহহম্‌সত্তার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, দাঁড়াতে দেননি তিনি নন্দ এবং কুন্দ, সেনদিদি ও যামিনী কবিরাজ, যাদব পণ্ডিত ও পাগলদিদি, প্রত্যেকটি চরিত্র তাদের নিহিত তথ্য পারস্পরিক দ্বান্দ্বিকতার সূত্র মেনে নিয়ে এগিয়েছে। 'ভিন্‌দেশী পুরুষ দেখি চাঁদের মতন লাজরক্ত হইলা কন্যা পরথম্‌

যৌবন', তা সত্ত্বেও যদি কুসুম ও শশীর সম্পর্কের পরিণতি সামাজিক প্রথাসংস্কার-অনুশাসন অতিক্রম ক'রে শেষ পর্যন্ত কোনো উদ্ধত ইতিবৃত্ত রচনা করতে অপারগ হলো, সেই অসাফল্যের ব্যাখ্যা কিন্তু অন্যত্র নয়। প্রকৃতির অঙ্গুলিহেলনে অথবা সামাজিক অনুশাসনে নয়, কুসুম-কর্তৃক শশীর প্রত্যাখ্যান কাহিনীর প্রবহমানতারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ : কেউই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, না শশী, না কুসুম, মানুষ, যে-কোনো মানুষ, পুরুষ, নারী, পরিবেশ তার মানসিকতায় ছায়া ফেলে, ঘটনাক্রম ফেলে, সে-মানুষ বহু-বিবিধ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পরিক্রমণ ক'রে, পরিভ্রমণ ক'রে টিঁকে থাকে, টিঁকে থাকে অথচ বদলেও যায়। এই টিঁকে থাকা তাই পরিবর্তনেরও ইতিকথা, প্রতি মুহূর্তে মানুষ, নারী, পুরুষ, পাল্টে যাচ্ছে, না পাল্টে উপায় নেই তার। এটা তো নিয়তি নয়, বিবর্তন, দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতজনিত বিবর্তন। যে-কুসুম একরাশ মিছে কথা ব'লে কাজের মানুষ শশীকে আটকে রাখতো, অকারণে তালবনে নিয়ে গিয়ে প্রলাপ বকতো, যে-কুসুম একদিন শশীর এমনকি পরোক্ষ, চকিত কোনো ইঙ্গিতে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পর্যন্ত তার সঙ্গে চলে যেতে সদাপ্রস্তুত ছিল, সেই কুসুমের ইতিকথা : 'স্পষ্ট করে ডাকা দূরে থাক, ইশারা করে ডাকলে ছুটে যেতাম। চিরদিন কি একরকম যায়? মানুষ কি লোহায় গড়া যে চিরকাল সে একরকম থাকবে বদলাবে না? বলতে বসেছি যখন কড়া করেই বলি, আজ হাত ধরে টানলেও আমি যাব না।'…'লাল টকটকে করে তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, যায় না?…সব ভোঁতা হয়ে গেছে ছোটবাবু। লোকের মুখে মন ভেঙে যাবার কথা শুনতাম, অ্যাদ্দিনে বুঝতে পেরেছি সেটা কি। কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।'

আমরা কাতর বোধ করতে পারি, পৃথিবীর-সমাজের না-মেলা অঙ্কের জন্য, অবরুদ্ধগতি কবিতার জন্য, মন খারাপ হ'তে পারে আমাদের, তবু এই চরিত্রগুলিকে নিঃসাড়, অনড়, পরাগত ক্রীড়নক ব'লে অভিহিত করবো কোন যুক্তিতে? এরা সচল, এরা চিন্তা করে, চিন্তা ক'রে প্রেম নিবেদন করে, প্রেম প্রত্যাখ্যান করে, চিন্তা ক'রে হিংসায় লীন হয়, ফন্দি ফাঁদে, মমতায় কাঁদে, ভীরুতায় কুঁকড়ে আসে। কোন্ সংজ্ঞার সংস্থানে দাঁড়িয়ে তা হ'লে জীবনের এই জমকালো জটিলতার ইতিবৃত্তকে উপন্যাসকার পুত্তলীনৃত্য হিশেবে বিবেচনা করেছিলেন? সব মানুষ তাদের সম্ভাবনায় উত্তীর্ণ হ'তে পারে না, তা মিলনের

সম্ভাবনাই হোক, বা বিরহেরই হোক, কিংবা বিপ্লবোত্তর সমাজব্যবস্থারই হোক। আমাদের স্বপ্ন এবং আমাদের বিচরণের মধ্যবর্তী অলিন্দে ছায়া নামে, লম্বা ছায়া, সরু ছায়া, বাঁকা ছায়া, এমন ছায়া যা চকিতে এসে চকিতেই মিলিয়ে যায়। কিছু-কিছু ছায়া, তাদের সমস্যা ও অভিশাপ, সম্ভবত কাকতালীয়, অথবা নেহাৎই অভাবনীয় দুর্বিপাকের ফলশ্রুতি, কিন্তু অন্য-অনেক ছায়াই আমাদের স্বকীয় সৃষ্টি, মৌলিক রচনা, নয়তো পারস্পরিক সংঘাতের মধ্যে তাদের উদ্গমবীজ নিহিত। যদি স্তম্ভিত প্রত্যয় নিয়ে বলাবলি করি, আমাদের প্রেম-অভিমান-ভুল-বোঝা-বিদ্বেষ-হিংসা-অনুরাগ-অভিমান কোনো-কিছুরই নিয়ামক আমরা নিজেরা নই, কোনো বর্হিবিধাতা নির্দেশ দিচ্ছেন, আমরা আমাদের ভূমিকা পুতুলের মতো শুধু পালন ক'রে যাচ্ছি, তা হ'লে অবশ্য সমস্ত বিতর্কই শিকেয় তুলে রাখতে হয়, মানুষের প্রপঞ্চপ্রদাহযন্ত্রণা নিয়ে যে-কোনো অভিজ্ঞানচর্চা অহেতুক সময়ক্ষেপণ ব'লে ঘোষণা করতে হয় তা হ'লে, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র শুরু যেখানে—'খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া হারু ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। আকাশের দেবতা সেইখানে তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন'—এই উপাখ্যানের সমগ্র বৃত্তান্ত, তা হ'লে ধ'রে নিতে হয়, ঐ ধরনের কটাক্ষপাতসঞ্জাত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়, জোর দিয়েই বলা চলে, আদপেই তা ছিল না।

ব্যক্তিবিশেষের, কিংবা ব্যক্তিসমষ্টির, আচরণকলার নিয়ামক কে তা হ'লে? যে-মুহূর্তে সমষ্টির প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি, সমাজের সংস্থানে চ'লে আসছি আমরা। মানুষ, নারী, পুরুষ, তারা সবাই সমাজের অংশ; তাদের বাদ দিয়ে সমাজ নয়, কিন্তু, প্রতীপ উক্তিও সমান—কিংবা হয়তো আরো-একটু বেশি—সত্য: সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিমানুষের কোনো ভূমিকা নেই। আমাদের প্রেম-নিবেদনে, প্রেম-প্রত্যাখ্যানে, প্রেম-বিস্মৃতিতে আমাদের মানসিকতার-স্নায়ুতন্ত্রী-আবেগপ্রবাহের প্রতিভাস, কিন্তু আমাদের মানসিক গঠন, আমাদের বোধ, আমাদের আবেগপ্রক্রিয়া, সমস্ত-কিছুর উপর তো সেই সঙ্গে সামাজিক বিন্যাসের প্রভাবও সমান ওজনে পড়তে বাধ্য। সমাজকে এড়ানো অসম্ভব। তর্কের মুহূর্তে মুখ দিয়ে ইচ্ছামৃত্যুর তিথি-তারিখ হঠাৎ বেফাঁস ঘোষণার বার্তা গ্রামময় র'টে যাওয়ার ফলে যাদব পণ্ডিতকে শেষ পর্যন্ত সায়ানাইড খেয়ে নির্ধারিত দিনে মৃত্যু বরণ করতে হয়; অন্যথা সামাজিক পরিবাদের ভয়। সমাজ একটি বিশেষ সংস্থানে দাঁড়িয়ে আছে ব'লেই অভিসারে-আসা কুসুমকে শশীর সতর্ক ক'রে দিতে হয়, ঘুম থেকে

উঠে দাওয়ায় গোপাল দাস বিশ্রামরত, সুতরাং কুসুমকে আর-একটু দাঁড়িয়ে যেতে হবে। হয়তো, সমাজ আছে ব'লেই, তার যে-জারজ শিশুকে জন্ম দিয়ে সেনদিদি মারা গেলেন, কিংবা যে-শিশু আসলে জারজ না-ও হ'তে পারে, কিন্তু যেহেতু সমাজের ধারণা অন্য, নিজের পুঞ্জিত অপরাধবোধের তাড়নায় গোপাল দাস সেই শিশুকে নিয়ে কাশী চলে যায়। সমাজ আছে ব'লেই কুন্দ তার নেশাচ্ছন্ন চেতনার নিরিখে যাচাই ক'রে এটা বুঝতে পারে স্বাভাবিক সুস্থ জীবনে তার ফেরার কোনো উপায় নেই, তাকে নন্দর রক্ষিতা হিশেবেই আমৃত্যু থাকতে হবে। রবীন্দ্রনাথ যাঁকে প্রসিদ্ধি দিয়েছেন, সেই জীবনদেবতা আসলে সমাজরূপী দেবতা। বহুবিধ উপচারে তাঁকে প্রত্যক্ষ তুষ্ট করবার প্রসঙ্গ পাশে সরিয়ে রেখেও বলা চলে, এই দেবতাকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। আমাদের জীবনযাপনের নিয়ামক মানুষ-ঠাসা, মানুষের-অনুশাসনে-ঠাসা এই সামাজিক পরিবেশ। মানুষের সঙ্গে সমাজের এক জটিল-অদ্ভুত উভমুখী সম্পর্ক। মানুষ, নারী, পুরুষ, তাদের নিয়ে সমাজ, তারাই সমাজের নিয়ামক, মানুষের হিংসা, মানুষের সংস্কার-কুসংস্কার, মানুষের পরশ্রীকাতরতা, মানুষের অলৌকিকে আস্থা, মানুষের লোক-লজ্জা: এই অণু-পরমাণুগুলির সংমিশ্রণই সামাজিক পরিবেশ; যে-সমাজকে আমরা সৃষ্টি করি সেই সমাজই কিন্তু অতঃপর আমাদের জীবনধারার নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। দু'টি আপাতবিচ্ছিন্ন ওজস্, কখনো পাশাপাশি, কখনো মুখোমুখি, কখনো এগোচ্ছে, অথবা দাঁড়িয়ে থাকছে, পরস্পরের সঙ্গে কখনো মিশে যাচ্ছে, অথবা পরস্পরকে ধাক্কা দিচ্ছে, আবার নিজেদের আলাদা ক'রে নিচ্ছে, ব্যক্তি-মানুষের মানসিকতা, সামাজিক মানসিকতা, একে অপরকে গড়ছে, একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করছে, এক আশ্চর্য উভপাক্ষিক সম্পর্ক। শশী-কুসুম-মতি-কুমুদ-সেন-দিদি-পাগলদিদি-যামিনী কবিরাজ-যাদব-পণ্ডিত-কুন্দ-নন্দ-সিন্ধু-গোপাল দাস-কৃপানাথ, এক অর্থে সবাইই, পুতুলীয়ৎ, সমাজের নির্দেশে নিজেদের পরিচালনা করছে, যে-অর্থে সমাজ নিয়ামক, ব্যক্তিবিশেষ, পুতুলনাচের প্রতিমা, নড়ছে-দুলছে-চলছে-নিশ্চল দাঁড়িয়ে পড়ছে। যিনি উপন্যাসকার, তিনি তাঁর আসক্তি-হীনতা নিয়ে ব্যক্তিমানুষের আকুতি-উদ্বেগ-আস্ফালন-স্বপ্নকামনা-স্বপ্নভঙ্গ সব-কিছু নিরীক্ষণ করছেন, ব্যক্ত করছেন, বিশ্লেষণ করছেন, বিবৃত করছেন; যেহেতু তিনি নিজে ঈষৎ উৎক্ষিপ্ত, তাঁর কাছে সামগ্রিক সামাজিক আকারটি খুব স্পষ্ট ধরা পড়েছে, চট্ ক'রে তিনি বুঝে নিচ্ছেন, বোঝাতে চাইছেন যদিও কোনো-কিছুই— কুসুম-শশীর পারস্পরিক অনুরাগ, যামিনী কবিরাজের হৃদয়যন্ত্রণা, সেনদিদি-

গোপাল দাসের রহস্য, তালপুকুরে গা-উদলা-ক'রে মন্তির ভরদুপুরে স্বপ্ন দেখার মুহূর্তে কুমুদের আবির্ভাব, একটার-পর-আরো-একটা ঘটনার সমারোহ—অসার নয়, তাৎপর্যহীন নয়, জীবনের ধন, যথার্থই, কিছুই যাবে না ফেলা, তা হ'লেও সব-কিছুর মধ্যেই, সব-কিছুকেই জড়ো ক'রে নিয়ে একটি যন্ত্র কাজ করছে, সেই যন্ত্রের নিয়মকলা সামাজিক নিয়মকলা, সেই যন্ত্র সমাজ, যাকে আলাদা ক'রে চোখে দেখা যায় না, হাতে ছোঁয়া যায় না, যে বৈদেহী, অথচ যার সর্বব্যাপী ঘোর সবাইকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে, সকলের বোধকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে, প্রত্যেকের প্রতিটি আচরণ নিয়ন্ত্রণ করছে। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র এটাই অন্তঃস্থিত নির্যাস।

'পুতুলনাচের ইতিকথা', অনেকে তবুও বলবেন, শেষ পর্যন্ত বিষাদকাহিনী। মতি-কুমুদের অকুতোভয় অধ্যায়টি পাশে সরিয়ে রাখলে, শেষ পর্যন্ত প্রায় সবাই-ই যেন যে-সামাজিক অনুশাসন দুশ্ছেদ্য, তার কাছে বন্দিত্বপ্রাপ্ত, সমস্ত আবেগ-ক্রোধ-অভিমান-আস্ফালন সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকের অনুশাসনের বৃত্তে ফেরা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসে, অনেকে অতএব উপসংহার টানবেন, শুধু নিরাসক্ত নন, নিরাসক্তিবিলাসী, যেন নিরাসক্তিতেই লেখক হিশেবে তাঁর নির্বাণ। আমরা তাই, অনেকে যোগ করবেন, অভিভূত হই, জীবনের আপাতপ্রাগ্‌নিরূপিত প্রাব্রজ্যে বিষণ্ণবোধ করি, কিন্তু তৃপ্তি পাই না যেন, ব্যক্তিমানুষ এত অসহায়, এই স্বীকারোক্তির সঙ্গে নিজেদের মেলাতে পারি না, পরিপ্রশ্নের প্রহারে জর্জরিত হয়ে ফিরি।

পূর্বোচ্চারিত ধুয়ো আর-একবার উচ্চারণ করতে হয়, শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে। সমাজ তো দ্বন্দ্বমূলক দ্বন্দ্ব-অধ্যুষিত প্রস্থানভূমি; একটু আগে যা বলা হয়েছে, সমাজবিন্যাসের ছাপ মানুষের চেতনাকে গড়ে, কিন্তু মানুষকে আমরা অন্য প্রাণীর থেকে আলাদা করি নিছক এই কারণে যে সে নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, তার যে-সংজ্ঞাআচরণবিধি সমাজের কাছ থেকে পাওয়া, তার শৃঙ্খল ভেঙে অন্য-এক স্তরে নিজেকে টেনে তুলতে পারে। পারে ব'লেই সমাজ বিবর্তিত হয়, সে-বিবর্তন স্বয়ংক্রিয় নয়, মনুষ্যসাধিত; যে-মানুষ ক্রীড়নক, :অতি সহজেই সে বিধাতা হয়ে উঠতে পারে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাসক্তি অবশ্যই এই আস্তিকতাবোধবর্জিত নয়, শশীর চরিত্রের দ্বিমুখী প্রবণতার বিশ্লেষণে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় কোথাও কার্পণ্য নেই: 'বস্তু আর বস্তুর অস্তিত্ব এক হইয়া আছে আমাদের মনে। কখনো কি ভাবিয়া দেখি মানুষের সঙ্গে

মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার কোনো সম্পর্ক নাই? মানুষটা যখন হাসে অথবা কাঁদে তখন হাসি কান্নার সঙ্গে জড়াইয়া ফেলি মানুষটাকে: মনে মনে মানুষটার গায়ে একটা লেবেল আঁটিয়া দিই—সুখী অথবা দুঃখী। লেবেল আঁটা দোষের নয়। সব জিনিসেরই একটা সংজ্ঞা থাকা দরকার। কে হাসে আর কে কাঁদে এটা বোঝানোর জন্য দু-দশটা শব্দ ব্যবহার করা সুবিধাজনক বটে। তার বেশি আগাই কেন? কেন পরিবর্তন চাই? নিঃশব্দে অশ্রু মুছিয়া আনিতে চাই কেন সশব্দ উল্লাস? রোগ শোক দুঃখ বেদনা বিষাদের বদলে শুধু স্বাস্থ্য বিস্মৃতি সুখ আনন্দ উৎসব থাকিলে লাভ কিসের?' এই দ্বান্দ্বিক প্রশ্নমালায় কিন্তু শশীর উৎকণ্ঠা মিলিয়ে যায় না: 'ভাবিতে-ভাবিতে রীতিমত বিহ্বল হইয়া যায় বই-কি শশী! সে রোগ সারায়, অসুস্থকে সুস্থ করে। অথচ একেবারে চরম হিসাব ধরিলে শুধু এই সত্যটা পাওয়া যায়: রোগে ভোগা, সুস্থ হওয়া, রোগ সারানো, রোগ না-সারানো সমান—রোগীর পক্ষেও শশীর পক্ষেও। এসব ভাবিতে ভাবিতে কত অতীন্দ্রিয় অনুভূতি যে শশীর জাগে। রহস্যানুভূতির এ-প্রক্রিয়া শশীর মৌলিক নয়: সব মানুষের মধ্যে একটি খোকা থাকে যে মনের কবিত্ব, মনের কল্পনা, মনের সৃষ্টিছাড়া অবাস্তবতা, মনের পাগলামিকে লইয়া সময়ে অসময়ে এমনিভাবে খেলা করিতে ভালোবাসে।'

এখানেই কিন্তু মানুষের পুত্তলীবৎ আচরণ-বিচরণের উপসংহার; মানুষের 'কবিত্ব', মানুষের 'কল্পনা', মানুষের স্পর্ধা ও সাহস, আপাতত যা অবাস্তব তাকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করে, মানুষ নিজেকে ছাড়িয়ে চ'লে যায়, মতি-কুমুদের ক্ষেত্রে যা দৃষ্টান্তিত, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় সে কাহিনী উহ্য, প্রক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তালবনের প্রান্তে যে-মাটির টিলা, বর্ষাতে জঙ্গলে ঢেকে যায় তা, জঙ্গল ভেদ ক'রে শশীর সে-টিলার উপর উঠে সূর্যাস্ত দেখার শখ: 'দিগন্তের কোলে তরুশ্রেণী যে বাঁকা রেখাটি রচনা করিয়াছে তাহারই আড়াল হইতে দেখিবে সূর্যকে'। অথচ এই ঈপ্সা-মোচনের মধ্যেও ছায়া পড়ে, কোনো আনন্দই অবিমিশ্র নয়, কোনো অভিজ্ঞতাই দ্বন্দ্বরহিত নয়: 'টিলার উপর উঠিয়া পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া সে যখন দাঁড়াইল তখন তাহার মন শান্তিতে ভরিয়া আছে। আগামী জীবনের যত ভাল কাজ তাহাকে করিতে হইবে তাহা সম্পন্ন করিবার শক্তিতে সহজ বিশ্বাস আছে, সাহস আছে। কিন্তু সূর্য ডুবিবার আগে শশী ভীত হইয়া পড়িল। ছেলেবেলা মাঝ-রাতে ঘুম ভাঙিয়া এক একদিন তাহার কেমন ভয় করিত, তেমনি ভয়। শরীর সর্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, কয়েক মিনিটের ভবিষ্যৎ

তাহার আর অবশিষ্ট নাই, সে এমনি অসহায়, এমনি ভঙ্গুর। পৃথিবীর বহু ঊর্ধ্বে, স্তরে স্তরে সাজানো ভয়ের তলে প্রোথিত পৃথিবীর ঊর্ধ্বে, একটা জঙ্গলাকীর্ণ মাটির টিলার শীর্ষে শশী হঠাৎ হারাইয়া গিয়াছে। সামনে রূপ-ধরা অনন্ত। সীমাহীন ধারণাতীত কী যে তাহার চারিদিকে ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে, শশী জানে না; কিন্তু আর কখনো নিঃশ্বাস সে লইতে পারিবে না।' এই বর্ণিত অনুভূতি সৃষ্টির-কর্মের-অনুভবের-অনুরাগের দ্বন্দ্বজাত, যে-মানুষ 'রূপ-ধরা অনন্ত'কে মাটির পৃথিবীতে নামিয়ে আনা সম্ভব তা প্রমাণ করতে চায় তাকে এই দ্বন্দ্বের উপত্যকা পেরোতেই হবে। এটাই মানুষের উপাখ্যান, যে-উপাখ্যানের কোনো শেষ নেই। যদিও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র ইতি টেনেছেন এই বৃত্তান্তে যে গ্রাম্য শশী ডাক্তার, যে-কুসুমকে নিয়ে যেখানেই হোক উদ্ধত পাড়ি দিতে একদা প্রলুব্ধ হয়েছিল, প্রতিজ্ঞ ছিল 'রূপ-ধরা অনন্ত'কে স্পর্শ করবে, পরাজিত-পরাভূত-নিয়মলাঞ্ছিত সে, মাটির টিলার উপর উঠে সূর্যাস্ত দেখার শখ তার আর এ-জীবনে আসবে না, কিন্তু শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র শেষ পংক্তিতেও তিনি শেষ কথা বলেননি, বলা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। সমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত আমরা, কিন্তু আমাদের এই সততনিয়ন্ত্রিত সত্তাও তো অহরহ নিয়ন্ত্রণ পেরিয়ে চ'লে আসে। কোনো অধ্যায়ই, এমনকি ব্যাকরণ ঘোষিত শেষ অধ্যায়ও, শেষ অধ্যায় নয়। বিশেষ-একটি ক্রান্তিমুহূর্তে শশীর মানসিকতার যে-প্রকাশে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র ইতি, সেই মুহূর্ত তো আপেক্ষিকতার আকস্মিকতা, ইতিহাস তারও পর আরও রচিত হবে, শশী ডাক্তারের ইতিহাসও ওখানে থেমে থাকবে না। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় কুমুদ-মতির পরবর্তী কাহিনী প্রক্ষিপ্ত, শশীর কাহিনীও কিন্তু সমপ্রক্ষিপ্ত।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, নিরাসক্ত-নিরাভরণ গদ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গাওদিয়ার গণ্ডি-ঘেরা সমাজের কৌটায় নারী, পুরুষ, মানুষের আবর্তিত ইতিহাসকে বিধৃত করেছিলেন, যে-ইতিহাসের শেষ নেই। সেই ইতিহাসের বিন্যাস, একজন উপন্যাসকারের পক্ষে, একমাত্র রূপক হিশেবেই পরিবেশন করা সম্ভব। রূপক তার কাজ সারা ক'রে ক্ষান্ত হয়, যে-প্রতীক তার দায়ভার, তাকে উজ্জীবিত করে। রূপকের কর্তব্য বিশেষের মধ্যে অবিশেষকে জড়ো ক'রে আনা, ব্রহ্মাণ্ডের মর্মকথাকে পদ্মবিন্দুতে থরোথরো, অথচ নিটোল, উপস্থাপন। এখন আমাদের ধাঁধা লাগে, গাওদিয়ার ঐ মানুষগুলির ইতিকথা সময়ের বাধা দীর্ণ ক'রে, ভূগোলের পরিখা ভেঙে, অন্য কালের অন্য স্থানের, না কি সব কালের, সব

অঞ্চলের মানুষগুলির ইতিকথা নয় কি? 'পৃথিবীতে ওরা অস্বাস্থ্যকর জলাভূমির কবিতা'। কারা তারা, গাওদিয়ার ঐ মানুষগুলি, না কি আমরা, এই পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে আসা, বাঙালির সমাজের মানুষগুলি? 'সতেজ উত্তপ্ত জীবন' কাদের সইবে না, কাদের নিয়ে এই নির্মম মন্তব্য? শশীর মনোভঙ্গ, মাটির টিলার উপর উঠে সূর্যের বিচ্ছুরিত লীলা দেখার শখ এ-জীবনে আর না-উদিত হবার মতো ভয়ংকর ঘটনাসম্পাত, কোন্ সমাজের নির্জীব স্থবিরতার অভিজ্ঞানে? যে-সৃষ্টিকর্ম ধ্রুপদের লক্ষণযুক্ত, তা ত্রিকালদর্শনের কষ্টিপাথরের বিচারেই শেষ পর্যন্ত আমাদের ভুল ভাঙে, পৃথিবীর ইতিকথার শেষ নেই, মানুষের ইতিকথার শেষ নেই, শশী-কুসুমের ইতিকথারও শেষ নেই। এবং নেই বলেই, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র সমাপ্তির পর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আস্তিকতায় শপথ নিতে হয় ফের, অথবা লোকপ্রবাদঘটিত সংশয় ঘোচাবার জন্যই নিতে হয়, কমিউনিস্ট পার্টিতে নাম লেখান তিনি। ইতিকথা শেষ হয়ে যায়নি, জলাভূমির কবিতাকে বেগবতী মহাকাব্যে পরিণত করা চলে, তার প্রাগ্‌প্রমাণ হিশেবেই যেন পৃথিবীকে জানিয়ে দিলেন তিনি: আমি কমিউনিস্ট, সমাজকে নতুন ক'রে গড়া যায় এই প্রতীতিতে আমি অঙ্গীকৃত, যে-পুতুলরা নাচে, তাদের নৃত্যে যে-অমিত ঐশ্বর্যের অঙ্কুর, তার দিকে তাকিয়ে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র সৃষ্টিকারের যেন বিস্ময়ের সীমা নেই।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, ছাব্বিশ বছর বয়সের এক যুবক নির্লিপ্ত গদ্যে, আপাতনিরুত্তাপ আবেগে, অবৈকল্যসিদ্ধ বুদ্ধিতে যে রচনায়, কীসের তাগিদে কে জানে, হাত দিয়েছিলেন, বাংলা ভাষার সাতশো বছরের শিলাঙ্কিত ইতিহাসে তার তুলনা নেই। আমাদের সাহিত্য আপাতত সাংবাদিকতায় নিক্ষিপ্ত-নিপতিত, সামনের দিকে তাকিয়ে নির্ণয় করা মুস্কিল কোথায় গিয়ে পৌছবো আমরা। তবে নরককুণ্ডেও যদি আমাদের উপনীত করা হয়, আমাদের ভাষাকে, আমাদের সাহিত্যকে, 'পুতুলনাচের ইতিকথা' সান্ত্বনা হয়ে থাকবে; অমরত্বের অধিকার, হয়তো ন্যায়সঙ্গত কারণেই, আমাদের নেই, কিন্তু অমরত্বের প্রকোষ্ঠে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, আমাদের পৌছে দিয়েছিলেন।

গল্প

মানত

মহাশ্বেতা দেবী

সদামণি বলেছিল, মানত কর্ অন্থর মা! সকল চেষ্টা তো করে দেখলি। এখন মানত মানসা কর্। দশটা নয়, পাঁচটা নয়, অন্থ তোর একটা। কেমন অসুখ ডাক্তার তো ধরতে পারছে না।

—মানত করলে সেরে যাবে?

—করেই দেখ।

—মানত তো ওর বাপের বেলাও করেছিলাম।

—মনে বিশ্বাস নিয়ে করোনি বাছা

—কে বললে? মনে যদি বিশ্বাস নাই থাকবে, তাহলে অমন হতভাগার জন্যে কেউ মানত করে?

—এই দেখ! ছেলে শুষছে, তুমি স্বামীকে হতভাগা বলছ। মরা মানুষকে গাল দেয় কেউ?

—ভালো কথা তো ভাবতে চাই। মনে আসে না। চিরকাল নেশা ভাং করে বেরাল। লাইট মিস্তিরির কাজ জানত, কখনো একটা পয়সা দেখাল না! ঝি খেটে খেটে ছেলে নিয়ে···শেষে মরণকালে ঘাড়ে এসে চাপল!

সে কথা সবাই জানে। গোলক দাসের মৃত্যুর কথা বস্তির মানুষ না জানলে কে জানবে। তাদের হাত পা ধরেই দোইথোই করেছিল অন্থর মা। তারাই তো বলতে গেলে গাঁট খরচায় গোলককে দাহ করে আসে। শ্রাদ্ধশান্তিও করিয়ে দেয় কার্তিক ঘাটে।

হ্যাঁ, মানুষটা ভাল ছিল না। কামাত, উড়িয়ে দিত, বউ ছেলেকে দেখত না। তা বলে…

সদামণি বলে, তাকে মন্দ বলে এখন কি হবে বলো বাছা? করেছ, স্বীকার করি। তা নিজের স্বামীর জন্যে করেছ। সে আর এমন কি কথা? এ তো কর্তব্য।

অনুর মা ক্লান্ত গলায় বলে। হ্যাঁ মাসি! তবে কথা কি, আমার কর্তব্য আমি করলাম। তার কর্তব্য কি সে করেছিল? বাবা তো আমাকে যা হোক এক ভরি সোনা, পাঁচ ভরি রুপো দিয়ে বিয়ে দিয়েছিল। সবই তো…

—আমরা কিছু দেখিনি বাছা।

—তার আগেই তো সব নিয়ে ওর বাপ…

—এখন বলছি, সামনে জাগ্রত ঠাকুর। যে যা মানসা করছে সব হচ্ছে। সেখানে যাও।

—ডাক্তার তো এলে দেয়নি এখনো।

—ভাল করতে তো পারছে না।

—তাহলে যাব?

—কতবার বলব? যাও, জোড়া পাঁঠা মনসা কর, মনোতুষ্টি পুজো দেবে বলো…

—কোত্থেকে, মাসি?

—ধার করেও মানসা দিতে হয়।

—ধার আর কত দেবে মনিব বাড়ি! ছেলেটাকে কমলালেবু, ডাব, তাই দিতে পারিনি।

—ওগো! বিশ্বাস রাখো। বলো, মনোতুষ্টি করে পুজো দেব তোমার, অনুকে ফিরিয়ে দাও।

—দেখি! ছোনেকে বলি।

বর্তমান সময়ে মধ্যবর্তী বা দালাল না ধরলে থানা, দেবালয় বা শ্মশানে পৌঁছনো যায় না। পথের মোড়ে শীতলা আছেন। সিমেন্টের শীতলা, সিমেন্টের গাধা। দেবী ও বাহনের পিতলের চোখ, দেবীর হাতের ঝাঁটাটি পিতলের। দেবী রোলেক্স, নাইলন, নানা রেলা পরেন। কোনো ভক্ত বাহনের চারপায়ে রুপোর তোড়া পরিয়ে দিয়েছে। পুজো পেয়ে তুষ্ট হলে বা দীর্ঘকাল পুজো না পেয়ে অসন্তুষ্ট হলে দেবী বাহনের পিঠে ঝাঁটা মারেন ও গাধা তোড়া বাজিয়ে নাচে।

ছোনে ও সেবায়েত ছাড়া কেউ শোনে না।

ছোনে একদা মনা রায়ের পেয়ারের আদমি ছিল। সে সময়ে তার বড়ই রেলা ও রং ছিল। চেম্বার ফোটাতে ও সিদ্ধহস্ত ছিল এবং মনা রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বহুজনের খোমা বদলে যাবার মূলে ছোনের বাঁ হাতের ঘুষি।

মনা রায় নির্বোধের মতো উঠ্‌তি ছুটকুদের হাতে ফুটে যাবার পর ছোনে ভালো হয়ে গেছে। এই ভালো হবার মূলে অবশ্য উঠ্‌তি ছুটুক বা চারাপোনারা।

তারা গভীর সততায় বলেছিল, ছোনেদা, আমাদের একটু গাইডেন্স দেবে?

ছোনে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলেছিল। তারপর বলেছিল, না রে! আমি আর লাইনে থাকব না।

—লাইন ছেড়ে দেবে? এখন তো…

—রম্‌রমা। এমন সুদিন আর পাব না তা জানি। কিন্তু মনটা বোরেগী হতে চাইছে।

—বোরেগী হবে?

—মায়ের চরণ ধরে পড়ে থাকব।

—তুমি কাছা নিইছিলে!

—ওরে! মনাদা ছিল হতভাগা। যার জন্যে কেউ চোখের জল ফেলে না, সে কেমন হতভাগা তাই বল্। তাতেই কাছা নিইছি। এখন তোরা যদি চাস্, আমাকেও…

—ছি ছি, এ কি বললে?

—অশুচ অবস্থায় মনাদার দেয়া চেম্বার ছুঁয়ে বলেছি, লাইনে থাকব না একেবারে।

—বেশ ছোনেদা।

—তোরাও যেন মাকে পুজো দিতে ভুলিস না। মনাদা তো সেদিনে পেন্নামটা ঠুকতেও ভুলে গিছল।

—আমরা এবারে ঠাকুরকে, দেখ না…যাত্রা ফিট করব। তোমার আশীর্বাদ থাকলে পেতলের ঠাকুর দেখে যাবে, পেতলের বাহন।

—এই মনটা বজায় রাখিস।

ছোনে কার্তিকঘাটে মনা রায়ের শ্রাদ্ধ তো করলই। তারপর সকলকে চমকিত করে মন্দিরের চাতালে ফলক বাঁধাল।

"মোনোতোস রায় তোমারে ভুলীব না।" শ্বেতপাথরের ফলক, তাতে

পেতলের চাকতি বসানো।

বসাবার দিনে ছোনে ধুমধামে পুজো দিল। লাইনের লোকজন, পাকা রুই থেকে চারাপোনা, সকলে তাকে সাধুবাদ দিল। ছোনে কেঁদে বলল, মনাদা স্বর্গে যাবে। টাইম লাগবে বটে। ফলকে লাথো মানুষের পা না পড়লে তো স্বর্গ হয় না।

সেই থেকে ছোনে, ভক্ত ও মানসার্থীর এবং শীতলার মধ্যবর্তী এজেন্ট। সেবায়েত এ ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে। এর ফলে লাইনের ছেলেদের উৎপাত থাকবে না। তারা ছোনে সম্পর্কে এখন উচ্ছ্বসিত। কলজেটা দেখ। সাহসটা দেখ। গ্যাঙের লড়ায়ে মনা রায় মরল। সে সময়ে তার জন্যে অশৌচ পালন। না, মনা থাকতে ছোনেকে চেনা যায়নি। ওর মধ্যে একটা সন্নেসী ছিল।

এ কথাটি এমন ছড়ায়, যে থানাবাবুও বিশেষ প্রভাবিত হন। ছোনে একটি বিশেষ পুজোয় তাঁকে ডাকতে গেলে, সে দরজায় দাঁড়াতেই তিনি বলে ফেলেন। এ যে মেরে তুয়ার খাড়া এক যোগী!

ছোনে মধুর হাসে। এখন তার চুল লম্বা। বিন্যস্ত গোঁফদাড়ি, পরনে গেরুয়া টেরি লুঙ্গি, গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবি, গলায় রুদ্রাক্ষ।

এই ছোনের কাছেই যায় অনুর মা। ছোনে সকাল থেকেই চাতালের পাশে বট গাছের নিচে চেয়ারে বসে! গোলকের সঙ্গে একই ঠেকে সে অনেক নেশা করেছে এক সময়ে। সকল নেশার আড্ডা, জুয়ার চক, সবই মনা রায়ের ছিল। তবে হ্যাঁ, ছোনে এখন সব ছেড়েছে। শুধু ট্যাবলেটটি। ট্যাবলেট মনকে বড় তুরীয় মার্গে রাখে।

—তোমার কাছেই এলাম গো।

—কে, গোলকের বিধবা নয়? এসো মা!

—বড় বিপদ বাবা!

আগের মতো "ছোনে" বলা চলে না। ছোনে যদি সবল স্ত্রীলোককে "মা" বলতে পারে, স্ত্রীলোকেরাও তাকে "বাবা" বলবে। ইস্পাতের হাড়িকাঠ বসানো চাতালে এখন বড়ই মানবিক প্রেমপ্রীতির সুবাতাস। পরিবেশদূষণ সপ্তাহের পোস্টারগুলি ছোনে এলাকায় লাগাতে দেয়নি। পরিবেশই বা কি, দূষণই বা কি! প্রতি এলাকায় কর্পোরেশন উদ্যোগ নিয়ে মায়ের মন্দির করে দিক। বাতাস শুদ্ধ ও নির্মল হতে বাধ্য।

—কি বিপদ গো, বলো!

—ছেলে তো খুব ভুগছে…

—অ। মানসা করবে?

—হ্যাঁ বাবা।

—করা হয় কি?

—বাবুদের বাড়ি বাড়ি…

—ছেলে কি করে?

—বারো বছর বয়স মোটে…

—পড়ে?

—যায়, যায়ও না। ওই একটাই!

—তা দেখ, মিছে বলব না।

—বলো বাবা।

—যেমন উদ্দেশ্য, মানসাও তেমন করতে হবে। মায়ের সংসারে নিয়ম বাঁধা। নিয়ম টপকাতে যেয়েছ কি মরেছ।

—তা এমন ক্ষেত্রে কি মানসা করব?

—দেখ! বিষম সংকটে পড়লে যখন মানসা করবে, সে তুমি মামলার জন্যে করো, বা ভাড়াটে তুলতে করো, বা রোগ সংকটে করো, নিয়ম একই।

—কি নিয়ম বাবা?

ছোনে দীর্ঘকাল সকালে চারঘণ্টা ও সন্ধ্যায় চারঘণ্টা অনেক ওপরে মহাব্যোমে নক্ষত্রদের কাছে বিরাজ করে। সে সময়ে তার কাছে ঠিকাদার লালবিহারী সিং চন্দেলা, বা বিলিতি মদের ভারতীয় রূপান্তর বিক্রেতা জন্মেজয়বাবু, বা মাল রিসিভার পেটো দত্ত, বা অনুর মা, সবাই সমান।

—জোড়া পাঁঠা, আটটা কাপড়, মনোতুষ্টি পুজো, বুক চিরে রক্ত, এই তো!

—সে যে অসাধ্য বাবা!

—কিসে? পাঁঠা আমার ঠেঙে কিনবে, মায়ের নামে দোকান, সেথা কাপড় কিনবে, শীতলা সমবায় ভাণ্ডারে সব পাবে। মাতে, আমাতে, সেবায়েতে সমবায়। জানলে?

—কত খরচ হবে?

—চলে যাও ভাণ্ডারে, ছাপা ফর্দ পাবে।

—অত পারব না বাবা। একে হাসপাতালে নিতে…কত কষ্টে ভর্তি করিছি…

—হাসপাতালে ভর্তি করেছ ?

—ডাক্তার যে বললে।

—দেখ মা! মানসা মানে মনে মনে মানত। তা আমি তো জানি যে সংসারী জীব কাদায় থাকে…

—হ্যাঁ বাবা। ঘরে যে কাদা থইথই। তাতেই ডাক্তার বললে স্যাঁতা লেগে যাবে। তাতেই হাসপাতালে…

—সে কাদা নয়!

ছোনে গর্জে ওঠে, এ কাদা বিষয় বিষের কাদা। সংসারী মানুষ, তার মনও কাদামাখা। তাই তার হয়ে আমার মন দিয়ে জেনে নিই, মা কি চাইবে। ছেলের রোগ মুক্তির জন্যে মানসা করবে। তাতে দর কষছ ?

—না বাবা! ঠিকে খেটে খাই…

—হায় রে মূর্খ! তোমার জন্যে সর্বরোগহরণ পুজো দিতে হবে। তা বাদে তোমাকে "ওঁ ক্রীঁ ক্ষং সং সং সঃ হং সঃ" মন্ত্রটি একমাস স্বামীকে জপাতে হবে…

—সোয়ামি নয় বাবা! ছেলে!

—ওই হল। ছেলে ওটি একশো আটবার জপবে আর মন্তরপড়া ঘি একমাস খাবে। শতমঅষ্টোত্তরং জপ্ত্বা ঘৃতং পিবেৎ। মাসৈকং পলমাত্রং সর্বরোগহরণং—এই মন্তর পড়ে দিলে ঘি হবে যাকে বলে অভিমন্ত্রিত। ওই তো! মনাদাকে যারা কেলাল। সেই খোনা হাবুর জ্বর হতে তার বউ একটি মাস শুদ্ধাচারে থেকে ঘি খাওয়াল। এখন তাকে দেখলে চিনতে পারবে না।

—দেখি বাবা! চেষ্টায় যাই।

—ফর্দ নাও।

শীতলা সমবায় ভাণ্ডার সম্ভবত একমাত্র দোকান, যেখানে অলৌকিক দেবী দুটি লৌকিক মানবের সঙ্গে সমবায় করেছেন। এই কো-অপারেটিভ যেহেতু অলৌকিক পদ্ধতিতে চলে, সেহেতু এ সমবায় রেজিস্ট্রি করা হয়নি, এবং সরকারী নিয়মাবলী মানতেও এ বাধ্য নয়। ব্যাপারটি পাড়ার রাজনীতিক ছেলেপিলে পছন্দ করে না। কিন্তু বর্ষীয়ান নেতা বলেন, ছোনেকেই ডিসিপ্লিন করা যায়নি এতকাল, তার শীতলা! কোনো ভাবে চামড়া ছুলকে দাদ কোর না। বেটা রাজনীতিক দল ছেড়েছে সেই যথেষ্ট।

—এটাও তো অপসংস্কৃতি, না কি, বলুন!

—পাড়ায় যে ভি. ডি. ও. সেন্টার চালাচ্ছে, সেটা বন্ধ করতে পেরেছ ?

অপসংস্কৃতি।

—আমরা আলোচনায় বসছি।

আলোচনায় বসে ওরা বেশি দূর এগোতে পারে না। কেন না ভি. ডি. ও. প্রসঙ্গে মতামত কয়েক ভাগ হয়ে যায়। অবশেষে ওরা তোতলা অমরের পানের দোকানকে বলে,

—দোকানে ভালো ছবি রাখতে পার না ?

শীতলা সমবায় ভাণ্ডার বিষয়ে কিছু করা যায় না। কেন না সিমেন্টের শীতলার এখন জনানুগত্য প্রচুর। নেতা বর্ষীয়ান ও প্রাজ্ঞ। তিনি বলেন, একে স্টেশনের গায়ে, তাতে ঘত উড়কো মানুষের এলাকা। এখানে মানুষের বিশ্বাস নিয়ে কথা কইতে যাওয়া ঠিক নয়। সবে অঞ্চল থানিক ঠাণ্ডা হয়েছে। এখন তা' ধরালে ছোনে আবার মস্তানি শুরু করবে। ও যদি শীতলার সঙ্গে সমবায় করে তো করুক, মরুক।

শীতলা সমবায় ভাণ্ডারে যায় অনুর মা। গোলাপী পাতলা কাগজে ছাপা ফর্দটি নেয়। পড়তে তো জানে না। আঁচলে বেঁধে নেয়। মানত মানসা যায় যেমন সাধ্য তেমন বুঝে করে। কিন্তু মায়ের মতিগতি বড় দুর্বোধ্য।

কে পড়ে দেবে ?

বিকেলের আগে তো হাসপাতালে যেতে পারবে না। শশীবাবুর দয়ার প্রাণ। তাতেই বাঙুরে ফ্রি বেড হয়েছে। একবারটি মনিব বাড়ি যাবে। পুরনো মনিব তবু দয়াধর্ম রাখে। মাইনে চল্লিশ, অথচ তিনবার ঘুরে আসে কাজ করতে, এমনটি আজকাল পাওয়া বিরল। বউদি যদি পড়ে দেয়!

সদামণি বলে, ফর্দ যখন পেয়েছিস, তখন ওখেনেই তোর চিন্তা দূর কর্। মায়ের ওপর ছেড়ে দে।

—আমার তো হাত পা উঠছে না।

—মাথায় তেল জল দে। রাঁধবি না ?

—অনু ঘরে এলে রাঁধব।

—দাঁড়া, স্নান কর্।

স্নান করে অনুর মা। বাটিতে মুড়ি নিয়ে জল ঢেলে খায়। সর্বরোগহরণ পুজো ? আগে পুজো, পুজোর কালে মানসা মানত ? একটু ঘি একমাস খেলে তবে রোগ সারবে ?

কে জপ করবে ? কে ঘি খাবে ? অনু তো জ্বরের ওষুধ খাচ্ছিল। জ্বর

ছাড়ে না। ডাক্তার বলল, ম্যালেরিয়ার সকল লক্ষণ, কিন্তু ওষুধ তো ধরছে না।

তখন নতুন পশার জমানো নতুন ডাক্তার। নতুন ডাক্তার বলল, কত্‌দিন এ ওষুধ খাচ্ছে?

—সাতদিন হল।

—এ ওষুধ যে পড়ছে, রক্ত পরীক্ষা হয়েছিল? ও, তাও হয়নি? এখন কি আর এ ওষুধের পর অন্য ওষুধ কাজ করবে? দেখি……

ওষুধ লিখে দিয়েছিল ডাক্তার। তারপর বলেছিল, এই ঘরে এমন রোগী…

—নিচে খড়পালা দিয়ে তারপর বিছানা…

—কাদা তো উঠছে ঘরে।

—ভালো হবে তো বাবু?

—দেখছি, দেখছি।

নতুন ওষুধ। দামী দামী ক্যাপসুল সব। দু'দিন পড়ল। তাতেও কোনো লক্ষণ দেখাল না। তারপর কাল ভোর-রাতে অনু বলল, পায়খানায় যাব। কোলে করে তুলবে অনুর মা, অমনি অনু "মা! মাথা তো গেল, বড্ড যন্ত্রণা" বলে সেই যে ঢলে পড়ল আর তো চোখ মেলে না।

নতুন ডাক্তার দেখে বলল, এখনি হাসপাতালে নাও বাছা। পায়খানা হয়ে গেল?

—কালো কালো হচ্ছে।

—হুঁ…মেলেনা স্টার্ট করে গেছে…হাসপাতালে নাও।

তারপর সব যেন দুঃস্বপ্ন। সদামণির ভাড়াটে মণি, মদ গাঁজা খাক, মানুষ ভালো। সেই দৌড়য় শশীবাবুর কাছে। শশীবাবুর ভাগ্নে ওই হাসপাতালেই। মণিই ট্যাক্সি ডেকেছিল। হাসপাতালে গাড়ি ঢুকতে অনুর কষ বেয়ে রক্ত। অনুর মা আর্ত অথচ অস্ফুট গলায় বলে উঠেছিল, এ যে রক্ত গো!

মণি অনুর দিকে তাকায়নি। বলেছিল, অমন কোর না। ও শুনলে ভয় পাবে।

হাসপাতাল। এমার্জেন্সি। লাল রেডক্রশ, কাচের বাক্স। বাতি তখনো জ্বলছে। শশীবাবুর ভাগ্নে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী এবং অসীম ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ধরে। অনুকে দেখে ডাক্তার মুখ থেকে সকল অভিব্যক্তি সরিয়ে ফেলে। কেমন করে যেন বেড়েও নেয়। শশীবাবুর ভাগ্নেকে বলে। একেবারে শেষ করে তবে হাসপাতালে আনবে আর রোগী টাল খেলে আমাদের পেটাবে। কয়েকদিন

আগে আনতে কি হয়?

—কি হয়েছে?

—বললে কি বুঝবে? দাঁড়াও, রক্তটা দেখি। রক্ত দিতে হবে।

—বাঁচবে তো বাবু?

—আমরা চেষ্টা করছি। তবে…

—বাবু! এই টাকা ক'টা।

—টাকা দিয়ে কি হবে? যাও, বাইরে যেয়ে বোস। ক'দ্দিন হয়েছে?

—তা নয় দিন হল…

—যাও।

শশীবাবুর ভাগ্নে বলে, নিচে যেয়ে বোস মাসি। আমি আছি, দেখছি।

অনুর মা ও মণি নিচে বসে থাকে। অনুর মা দেয়ালে হেলান দেয়। মণি গিয়ে দু ভাঁড় চা নিয়ে আসে। বেলা গড়ালে শশীবাবুর ভাগ্নে নেমে আসে। বলে, রক্ত দেয়া হচ্ছে, রক্ত টানছে ভালো। গ্যাসও দিচ্ছে। তোমরা বাড়ি যাও এখন। বিকেলে চারটের পর, জানো তো!

—কেমন দেখলে?

—রোগ জটিল বটে, তবে চেষ্টা চলছে খুব। এখন তো ভালো আছে। যাও, থেকে বা কি করবে?

—যাব?

—যাও।

শশীবাবুর ভাগ্নের চোখে মণি কোনো খবর পড়ে ফেলে। সে অনভ্যস্ত নরম গলায় বলে, বিকেলে তো আসবে। এখন দেরি কোর না।

একজন ডাক্তারকে নেমে আসতে দেখে অনুর মা। এই কি অনুকে দেখছে? ডাক্তারটিকে জিগ্যেস করা হয় না। মনের মাঝে কি যেন বাজে। শশীবাবুর ভাগ্নে এখানে পুরনো কর্মী! সে মণিকে বলতে বলতে এগোয়। খুব অসাধ্য হে! প্রথম দিকে না হোক, এখন ভাইরাস ডেঙ্গু ধরে গেছে। ভেতরে খুব…

গলাটি নিচু রাখতে হয়! টপ করে ওরা ট্রাম রাস্তায় এসে পড়ে। চব্বিশ-উনত্রিশ নম্বর ট্রাম আসবে। ওপাশে খাটিয়া, ফুল, দড়িদড়া বিক্রির ব্যবস্থা। অনুর মা তাকায় না।

ঘরে ফিরে অনুর মা বলে, তোমার ধার জীবনে শোধ হবে না মণি।

মণি এ কথার উত্তরে বলে, বিকেলে একলা যেতে পারবে? না, সঙ্গে যেতে

হবে।

—পারব।

—সদা মাসিকে নিয়ে যেও। আমি একবার কাজের ঠেঙে ঘুরে আসি। নয় খবর নিয়ে আসব।

সদামণি এ সব কাজে সদাই রাজী। সে পরের কাজে পাকা মাথাটি সর্বদা গলায় এবং শর্ত একই, তার কথা অন্যকে দিয়ে মানিয়ে ছাড়ে।

পরদিন সেই অঙ্কুর মাকে হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে বলল, মানত মানসা করো।

ফর্দটি আঁচলে বেঁধে অঙ্কুর মা পুরনো মনিব বাড়ি দৌড়য়। গিন্নিমা কন্যালয়ে। বউদিই গিন্নি। অঙ্কুর মার দেয়া ফর্দ পড়ে সে বলে, এ তো হাজার টাকার ফর্দ গো!

—হাজার টাকা!

—তার বেশিই হবে।

—অঙ্কুকে তো হাসপাতালে দিয়েছ।

—দিয়েছি।

—কথা বলছে?

—না বউদিদি।

—ফর্দ দিয়ে বা কি হবে? মানসিক যে জন্যে করা তা পূর্ণ হলে তবে তো?

—আগে যে একটা কি পুজো দিতে হবে··তা বাদে জপ করবে, মন্তরপড়া ঘি খাবে···রোগ সারলে তবে পুজো। তখন ঐ ফর্দ।

—ও, সর্বরোগহরণ পুজো···এও তো তোমার একশো টাকার পুজো। তায় ঘি···

—পায়ে ধরি বউদিদি, ও টাকা তোমার হাতের ময়লা···আমি খেটে শোধ দেব।

—আজ ন' দশ দিন তুমি ঠিকমত আসতেও পারনি। বুঝলাম, ছেলের অসুখ! তা টাকা তো তোমায় ক্ষেপে ক্ষেপে অনেক দিলাম!

—দাও বউদিদি। কেন বা ডাক্তার ডাকতে গেলাম···কেন বা এতগুলো দিন নষ্ট করলাম···তখন যদি ছেলেকে নিয়ে হত্যে দিই, তাহলে তো···

—ছেলের অসুখ·· হাসপাতালে দিয়েছ···তারা ও সব ঘি খাওয়াতে দেবে কেন? শোনো অঙ্কুর মা! হাতে টাকাও নেই, লোকের কথায় নেচে উঠো না।

—হাসপাতাল থেকে নয় নিয়ে আসব।

—তাই কখনো হয় না কি?

—টাকা দাও বউদি!

বউটির পা ধরে কাঁদে অঙ্কুর মা। তার মতো হতভাগী কে আছে? অঙ্কুর বাপ তো জীবনে দেখেনি। কচি ছেলে নিয়ে কাজ করে খাওয়া! জীবনে ঠাকুর দেবতার কথা ভাবতে সময় পায়নি। সবাই বলছে, তাতে পাপ হয়েছে বিস্তর। তা এখন মন বলছে শীতলাই তোর শেষ ভরসা। সেটুকু করতে না পারলে মন মানে না।

—তুমি ছেলের মা! বুঝে দেখ বউদি। সন্তানের বিপদে তুমি কি আছাড়ি-পিছাড়ি কর না?

"বউদি" বললে কি হবে, তার বয়স সবে তিরিশ। সংকটে, সন্তানের সংকটে সে এতাবধি দু'বার পড়েছে। ছেলেকে ইংরিজি মিডিয়ম স্কুলে ভর্তি করার সংকট এবং মেয়ের স্কুলে বাস না পাবার সংকট। দুটি গাঁটই উতরে গেছে। দুটি সংকট কাটাবার জন্যেই ধরাধরি করতে হয়েছে বিস্তর।

কোনো সময়েই বউটি ওই শীতলা নামক অশিক্ষিতদের দেবতার ওপর ভরসা করেনি। বউটির মা এবং শাশুড়ি দুজনেই একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মহাপুরুষের ভক্ত। ভি. ডি. ও. ক্যাসেটে আমেরিকায় তাঁর দিনচর্যা দেখা যায়।

তাঁর সব কিছু এত সুন্দর, অভিজাত, আধুনিক।

আর শীতলা! পাঁঠাবলি, কাঁসর ঘণ্টা, অসভ্য বর্বরদের দেবী যাকে বলে। ধর্মের প্রথম শর্তই তো হচ্ছে নির্মল পরিচ্ছন্নতা।

বউটি অত্যন্ত বিরক্ত, অত্যন্ত বিব্রত, একই সঙ্গে অঙ্কুর মায়ের জন্যে ভীষণ কাতর হয় ও ভুরু কুঁচকে কুড়ি টাকার একটি নোট ধরিয়ে দেয়।

—আর আর বাড়িতে দেখ।

অঙ্কুর মা ঘাড় হেলায়।

—ছেলের কেমন খবর হয়···

অঙ্কুর মা ঘাড় হেলায়।

বিকেল তো হতে হবে। হাসপাতালে যাবে, না মন্দিরে? মাথার মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে বাদুলে পোকা ওড়ে। সব যেন ঘোর ঘোর, আচ্ছন্ন। সবই এলোমেলো। তাতেই অঙ্কুর মা ছোনেকে বলে। অঙ্কুর নামে সংকল্প করে পুজোটা করিয়ে দাও বাছা। তোমার ফর্দমতো মানসা পুজো দেব।

—ঠাকুর তো এখন শয়নে গো!

—তাকে জাগাও!

অনুর মায়ের লালচে চোখ, অস্থির চাহনি, ঝোঁক দিয়ে দিয়ে জোরে জোরে কথা বলা, এ সবে ছোনে অত্যন্ত বিস্মিত হয়। খানিকটা অভিভূতও। সময়টি বিকেলও নয়, দুপুরও নয়। দ্বিতীয় ট্যাবলেট এখনও খায়নি। প্রভাতী ট্যাবলেটের ঘোর খানিক কেটেছে।

—ফর্দ দেখেছ?

—টাকা মেলেনি।

—সে কি?

—কুড়ি টাকা এনেছি তা কি মা মানবে না? সরে যাও ছোনে, আমি হত্যে দেব, মাথা খুঁড়ব।

ছোনে এর মধ্যে মায়ের মহিমা দেখে সহসা। যে অনুর মা, অর্থাৎ গোলকের বউ, কোনোদিন উঁচু গলায় কথা বলে না। স্বল্পকেশ মাথার ঘোমটা ফেলে না, সে কিসের জোরে সাক্ষাৎ ছোনেকে হেঁকে ডেকে "ছোনে" বলে কথা বলছে? পুত্রের আরোগ্যলাভের জন্যে কাতর এক জননীকে পুজোর টাকা পুজছে না বলে তাড়িয়ে দিলে তার নিজের ভাবমূর্তিও চোট খেয়ে যায়।

ছোনে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর বলে, আলবৎ মানবে মা। ডাকার মতো করে ডাকো, ঘাট থেকে ছেলে ঘুরে আসবে।

সে সেবায়েতকে ডাকে। হইচই তুলে দেয়। কুড়ি টাকার অষ্টভাঁজ নোটটি থালায় ফেলে দেয় অনুর মা। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। অনুকে ভালো করে দাও, ভালো করে দাও, তাকে এনে তোমার কাছে ফেলে দিচ্ছি।

এ কথা বলেই চলে সে বিড়বিড় করে। এ ক'দিন বলতে গেলে পেটে ভাত নেই। রাতে ঘুম নেই। ডাক্তারের বাড়ি। ওষুধের দোকান। ফাঁকে ফাঁকে মনির বাড়ি। আবার নতুন ডাক্তার। আবার ওষুধের দোকান, হাসপাতাল, বউদির বাড়ি! হেঁটে হেঁটে অবসন্ন, ক্লান্ত, বিধ্বস্ত শরীর। অনুর মার ঘোর লেগে যায়। তলিয়ে যেতে থাকে সে। আচ্ছন্ন চেতনায় মনে হয়। দেবীকে সে জাগাতে পেরেছে। এখন দেবী পায়ের মল বাজিয়ে তার চারপাশে ঘুরেছে আর ঘুরছে। শরীর কেঁপেঝেঁপে স্থির হয় তার, এলিয়ে যায়। জ্ঞান হারাতে হারাতে অনুর মা যেন "জয় মা! জয় মা!" ধ্বনি শোনে। কাঁসর ঘণ্টা। বহু দূর থেকে ছোনের মতো গলায় কে যেন বলে।

মায়ের নাকি মহিমে নেই? ভক্তিতে মুক্তি আসে কি না, অবিশ্বাসীরা দেখে যাক!

এমন অবেলা, যখন ট্রেন থেকে ভেণ্ডার নামছে। দোকানী ঝাঁপ ওঠাচ্ছে। বাজারিয়ারা সব্জির ঝাঁকার চট সরিয়ে জল ছেটাচ্ছে। ঠিকে ঝি-রা কাজে বেরোচ্ছে। প্যাডলাররা চোখ রগড়ে সোয়ারি নেবার জন্যে তৈরি হচ্ছে, – এমন অবেলায়ও ভিড় জমে মন্দিরে। পেতলের থালা উঁচু করে দশ পয়সা, সিকি, টাকা পড়তে থাকে। ছোনে নেচে নেচে কাঁসর বাজায়। আর অনুর মা কোনো গভীর শান্তির স্রোতে ভেসে যেতে থাকে। মায়ের পায়ে সব চিন্তার বোঝা ফেলে দিলে এমন শান্তি মেলে তা কেন সে আগে জানেনি?

এ ভাবেই বিকেল হয়। সন্ধ্যা আসে।

অনুর মায়ের ঘোর ভাঙে। চেতনা ফেরে। ধীরে ধীরে চোখ মেলে চায় সে।

তার তকাতে দাঁড়িয়ে এত লোক কেন? সবাই কেন চুপ করে আছে। চেয়ে আছে তার দিকে? সে তাকাতেই সবাই কেন চোখ সরিয়ে নিচ্ছে?

বাইরে প্রগাঢ় অন্ধকার। মন্দিরে হ্যাজাক জলছে। তাহলে কারেন্ট নেই। সময় বা কত?

ছোনেকে দেখা যায় না। সেবায়েতকে নয়। অনুর মা আস্তে আস্তে উঠে বসে। সবাই দেবীপ্রতিমার দিকে তাকাচ্ছে। তার দিকেও।

অন্ধকার থেকে আলোকিত চাতালে উঠে আসে সদামণি। স্বভাবছাড়া নরম গলায় বলে। হাত ধরো। ওঠো।

—এই উঠি।

—চলো।

—কোথা?

—ঘরে চলো।

পিছনে দাঁড়িয়ে মণি। আরো কে কে।

—অনু?

সদামণি ওকে জাপটে ধরে। বলে, মণি তো কখন এসেছে···তুমি বেহোঁশ। নাও, চিনিজলটা খাও। সরো গো বাছারা। আমাদের যেতে দাও।

—কোথায় যাবে?

মণি বলে, হাসপাতালে।

তারপর প্রবল ক্ষোভে বলে। জ্বর দিয়ে শুরু। তা বাদে কি বলে, কি

বলল গো ভায়ে ?

শশীবাবুর ভায়ে নিরুৎসাহ গলায় বলে, হেমারেজিক ডেঙ্গু না কি··· ভেতরে সব রক্তপাত, জানলে ? আমি তো বার বার ওর কাছেই ! তা মাথার মধ্যে, বুকের মধ্যে, পেটে, সর্বত্র সব যাকে বলে হেমারেজ···ডাক্তাররা তো অবাক মেনে গেল যে এতটা জুঅল কেমন করে !

মণি বলে। থাক্‌গে সে কথা।

অসুর মা প্রায় ফিশফিশ করে বলে। অসু তাহ'লে···কখন ?

সদামণি বলে, সে অনেকক্ষণ···

সবগুলি মুখ, চাতাল, হ্যাজাক, হাড়িকাঠ, প্রতিমার স্থির স্থির চোখ, সব ঘুরতে থাকে অসুর মার সামনে। সব ভাঙছে, দুলছে, ঘুরছে, আবার স্থির হচ্ছে, আবার ভাঙছে।

ক্রমে সব আবার স্পষ্ট হয়, স্থির হয়। অসুর মা বোঝে। এতক্ষণে তার মাথা কাজ করে।

কোথায় ভীষণ শক্তি পায় ও। নিজেকে শক্ত করে, বের করে নেয় সদামণির আলিঙ্গন থেকে। তীক্ষ্ণ, তীব্র চীৎকারে সব ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দেয়।

একটি শব্দও মৃত পুত্রের জন্য শোক নয়। প্রতিটি শব্দে দেবী প্রতিমার বিরুদ্ধে আক্রোশ।

—রাক্ষুসী ! পিশাচী ! এই তোমার ক্ষমতা ? ভিক্ষেসিক্ষে করে টাকা আনলাম, হত্যে দিলাম, তুমি এই করলে ? তোমার কাছে পড়ে থাকলাম, হাসপাতালে গেলাম না। বিশ্বাস করে এই করলে ? মরো তুমি মরো, তোমার মন্দির নিপাত যাক !

সবাই হতচকিত, বিমূঢ়। এ সব কথা মানুষ মানুষকে বলে। অসুর মায়েরা কখনো শীতলাদের বলে ? সকলে কোনো সংশয়ে ওর দিকে চায়। প্রতিমার দিকে চায়। ছোনেকে দেখা যায় না। সে ঘণ্টা খানেক আগে। "ছেলে তোর বেঁচে গেল" বলে বড়ই নেচেছিল এবং ঢাকী ঢাকের বোল যেমন তোলে তেমন মুখে বোল দিয়েছিল।

অসুর মায়ের চীৎকারে দৈবী মায়ার পরিবেশটি হারিয়ে যায়। শীর্ণ শরীর। প্রৌঢ়া এক ঝি দাপাদাপি করাতে নগ্ন বাস্তব ফিরে আসে। "সবই কপাল" বলে কেউ কেউ। সকলে সরে যেতে থাকে।

সদামণি বলে, চুপ চুপ !—কিন্তু অসুর মা থামবে না। শীতলা তার সময়

নিয়েছে। মনোযোগ নিয়েছে। টাকা নিয়েছে। সবই সে ছেলের জন্যে রেখেছিল।

ওরা ওকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। মণি অভিজ্ঞ। মণি অসুর মাকে থামতে বলে না। সে জানে। এর পর কান্না আসছে।

—এখন লাশ আনা···খাটে নেয়া···

মণি হিসেব করে।

—পাঁচ দোরে চাইতে হবে, সে অস্ফুটে বলে। ভিক্ষেসিক্ষে করে কত টাকা প্রণামীর থালায় রেখে অসুর মা হত্যে দিয়েছিল ? থালাটির দিকে ও ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। কুড়ি টাকার ভাঁজ করা নোটটি দেখা যায় না। থালায় খুচরো পয়সা-সিকি-আধুলির পাহাড়। অসুর মার শাপাশাপিতে শীতলা এখন গমিত মহিমা। সেবায়েত মন্দিরের দরজা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেয়। মন্দিরের ভেতরে কোণে বসে ছোনে কপাল মোছে। উঃ ! ঠাকুর দেবতা যে এমন ভাবে ফাঁসাবে তা কি সে জানত ?

বিশেষ রচনা

রামকিংকর : কিছু স্মৃতি

সম্বরণ মল্লিক

[শিল্পী রামকিংকরকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে অনেক। কিন্তু অন্তরঙ্গ মানুষটিকে একান্ত করে পাওয়া যায়, সনাক্ত করা যায় তার ভাস্কর-জীবনের সূচনাপর্ব, বিকাশ ও সূত্রনির্দেশ তেমন পরিবেশ ও সুযোগ খুব বেশি পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি তেমনি একটি মূল্যবান ঘরোয়া আলাপচারিতার টেপ-রেকর্ড আমাদের হাতে এসেছে সম্বরণ মল্লিকের সহৃদয়তায়। তথ্যের কারণে মূল্যবান রামকিংকরের এই স্মৃতিকথন তিনি রেকর্ড করে রেখেছিলেন টেপে। এবং সেই টেপ-রেকর্ডধৃত সাক্ষাৎকারটির হুবহু প্রতিলিপি করে দিয়েছেন তিনি বিভাবের জন্য। শ্রী মল্লিকের সঙ্গে ছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীশর্বরী রায়চৌধুরী, কর্মসূত্রে যিনি এখন শান্তিনিকেতনে—তিনিই এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন, তাকেও কৃতজ্ঞতা জানাই। কলকাতা হাইকোর্টের ব্যবহারজীবী শ্রীঅরুণ হালদারও এই কথোপকথন রেকর্ড করার সময় উপস্থিত ছিলেন। সম্ভবত এটিই প্রয়াত রামকিংকরের শেষ সাক্ষাৎকার। এক বিরল মুক্তমন হাস্যমুখর রামকিংকরের পরিচয় এতে পাবেন পাঠক। রাম-কিংকরের বাচনভঙ্গী, বিশেষ উচ্চারণপ্রবণতা, যথা সম্ভব বজায় রাখার চেষ্টা হয়েছে। কথোপকথনের মাঝে মাঝে 'ড্যাশচিহ্ন' বা 'ডটচিহ্ন' দুই বাক্যের মধ্যবর্তী বিরতি নির্দেশক—সম্পাদক]

চাকরীসূত্রে আমি তখন বোলপুরে। শান্তিনিকেতনের এলাকার ভিতরেই অফিস। প্রয়াত মহা শিল্পী রামকিংকরের দুর্লভ সান্নিধ্যলাভ করার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই সময়। সেই সুবাদেই সম্ভব হয়েছিল মানুষটিকে খুব কাছ থেকে দেখার। বর্তমান সাক্ষাৎকারটি এমনি একটি দিনে নেওয়া। কোন রকম প্রস্তুতি বা শিল্পীকে পূর্বে জানানোও ছিল না। যেমন প্রায়ই যেতাম, তেমনি সেদিনও গিয়েছিলাম। সঙ্গে শুধু রেকর্ডারটি ছিল। সেদিনের সেই আনন্দস্মৃতি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্যই এই লেখার অবতারণা।

১৯৭৬ সালের ১৫ই এপ্রিল। শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ভাস্কর্য শিক্ষক শ্রীশর্বরী রায়চৌধুরী ও কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট শ্রীঅরুণ হালদারের সঙ্গে সকাল দশটা নাগাদ কিংকরদার বাড়িতে হাজির হলাম। শিল্পী বাড়ি ছিলেন না, পোস্টঅফিসে গিয়েছিলেন। আমরা একটু অপেক্ষা করার পরই এসে গেলেন। পরনে সেই পরিচিত পোশাক—লুঙ্গি ও গেরুয়া খদ্দরের পাঞ্জাবী। উজ্জ্বল হাসিতে মুখ ভরিয়ে, কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। মোড়া নিয়ে আমরা সকলে বারান্দায় বসলাম।

সেদিন রামকিংকর অন্তরঙ্গভাবে অনেক কথাই বলেছিলেন যা সচরাচর এত খোলাখুলি কখনই বলেননি। এই আলাপচারিতা টেপ করার দায়িত্ব নিলেন শর্বরীদা (টেপ রেকর্ডিং-এর ব্যাপারে শর্বরীদা খুবই অভিজ্ঞ)। কথার মাঝে মাঝেই প্রাণখোলা উচ্চরব হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিলেন রামকিংকর। সে যে কি অভিজ্ঞতা স্বকর্ণে না শুনলে পুরোপুরি উপলব্ধি করা অসম্ভব; পবিত্র সেই হাসির মাধুর্য। সংলাপগুলো পড়লে সচেতন পাঠক কোন কোন জায়গায় হয়তো তথ্যের ঘাটতি বা প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধ মতামত পাবেন। হয়তো বয়সের ভারে দু একটি ক্ষেত্রে স্মৃতি তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছিল। আমরা আগে থেকে খবর দিয়ে যাইনি। কেননা কোন formal interview record করা আমাদের লক্ষ্য ছিল না। তাই দু' একটি স্মৃতিপ্রমাদ যা রয়েছে তা গণ্য না করাই ভাল।

নিচে সেদিনের আলাপচারিতা বাচনভঙ্গী শব্দবিরতির প্রবণতাসহ হুবহু তুলে দেওয়া হলো।

সংকেত : শর্বরী রায়চৌধুরী=শ রাচৌ, রামকিংকর বেজ=রা বে।

শ রাচৌ : আচ্ছা রামানন্দবাবুর মাধ্যমে কি আপনাকে এখানে আসতে হয়েছিল ?

রা বে : হ্যাঁ, সেটা ঠিকই—রামানন্দবাবুর বাড়ি বাঁকুড়াতে, আমাদের বাড়ির কাছেই—ওঁরই বাড়ির একটি ছেলে আমার বাল্যবন্ধু, তিনিই নিয়ে যান··· ওঁর সঙ্গে introduce করে দ্যান। ছেলেটি বলেন রামানন্দবাবু এসেছেন এখানে···অবশ্য জানা ছিল প্রবাসীর থ্রু দিয়ে editor হিসাবে। কিন্তু বললেন যে উনি এসেছেন ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা দিতে—তা চলো একবার দেখা করে আসি···তারপর উনি [রামানন্দবাবু] আমার বাড়িতেও এসেছিলেন—ছবিটবি দেখালুম উনি বললেন আচ্ছা চিঠি লিখবো [রবীন্দ্রনাথকে !]—তারপর শান্তিনিকেতনে এলাম।

শ রাচৌ : তখন থেকেই কি আপনার শিল্পধারা আধুনিকতার দিকে···

রা বে : না, তখন যা ছবিটবি আঁকি, নন্দবাবুকে দেখালুম সেগুলো—তা উনি বললেন 'এসব তো হয়েই গ্যাচে···কিজন্যে এলে ?' [শর্বরী রায়চৌধুরীকে] —রয়েছে সেগুলো, পুরোনো আমলের ছবিগুলো, দেখাবো তোমাকে

শ রাচৌ : কে, নন্দবাবু বললেন ?

রা বে : হ্যাঁ—তা, রামানন্দবাবু বললেন 'থাক্ কিছুদিন'—নন্দবাবু বললেন 'আচ্ছা···দু' তিন বছর থাকো'—তা আমার সেই তিনটা বছর এখনো শেষ হয় নাই—হাঃ হাঃ হাঃ—এই আর কি—এখনো চলছে।

শ রাচৌ : একটু আপনি পুরনো দিনের যে গানগুলো শিখেছিলেন, একটু যদি গান করেন।

রা বে : পুরনো দিনের গান ?—ওতো সব নূতন, পুরোনো আর কোনটা !

শ রাচৌ : আপনার মুখে শুনলে সব সময়ই নূতন লাগে—ওই গানটা, 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে'—সুরটা এত চমৎকার আর আপনি জমিয়ে দেন···

রা বে : আচ্ছা ওইটা দিয়েই শুরু করবো—কথাগুলো ভাল মনে নেই—ওটা চাঁদের আলোর গান, জানো—আর সেই দিনটাতেই আমি প্রেমে পড়েছিলাম···আর গানটা চলেছিলো তার সঙ্গে সঙ্গে···সেই দিনটাতেই প্রেম শুরু হয়ে গ্যালো—

[রামকিংকরের গান—রামকিংকর চমৎকার গাইতে পারতেন]

সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে
ফুলডোরে বাঁধা দুলনা··· [থেমে থেমে গেয়ে বললেন]

এর সঙ্গে শুধু সেইটুকুই হয়েছিল···হোঃ হোঃ হোঃ—তারপর আর কিছু নেই—আর বেশি অগসর হওয়া যায়নি—হোঃ হোঃ হোঃ—এই পর্যন্তই—সেই এক রতি হাঃ হাঃ হাঃ···এমনিই Picnic গিয়েছিলম [শব্দটিকে এ রকমই উচ্চারণ করতেন শিল্পী]—সেকালে যেমন বৈতালিক হতো না, বুঝলে !—একটা Moonlight Picnic ছিল—সেই সময়েই—

···তারপরে—তা আমি বদমাইশি করিচি একটু—বদমাইশি করলম—হোঃ হোঃ হোঃ—কেটে পড়লম আর কি—হোঃ হোঃ হোঃ

শ রাচৌ : তা আপনিই কেটে পড়লেন ! আচ্ছা আর একটা যদি গান হয়

রা বে : গান ?

[রামকিংকরের গান]

ধরা দিয়েছিগো আমি আকাশের পাখি

সম্বরণ মল্লিক : বাঃ চমৎকার !

আচ্ছা, আপনি সেই অনেকদিন আগে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে—তখনকার আশ্রমের জীবন সম্পর্কে যদি দু' এক কথা বলেন শুনি একটু।

রা বে : তখন আশ্রমজীবন অন্য ছিল—তারপর বহুদিন কেটে গেছে—সেটা বহুদিন আগের কথা—আমি এসেছি এখানে গান্ধীজীর Non-co-operation movement-এর শুরুতেই, জানেন কংগ্রেসে কাজ করতাম—সেখান থেকে এখানে এসেছি—1925-এ···অনেকদিন।

তখন থেকে অনেক change হয়ে গিয়েছে—তখনকার মুষ্টিমেয় ছাত্র—তবে Non-co-operation-এর সময়ের জন্যে আরো অনেকে—গুজরাটি ছেলে ও অন্যান্য দেশ থেকে অনেক ছেলে এসেছিল—তার আগে খুব কম—···কলাভবনে আমাদের তিন চারটি ছেলে—অমলদা, আমি একজন, তারপরে—তারপরে···তখন এরকমই—

এখন যেটা দেখছেন সেটা পরে—অনেক পরে—তখন এরকমই—Noble Prize-এর পর একটু বেড়েছিল, এই পর্যন্ত

শ রাচৌ : আচ্ছা তখনকার সময় থেকে তো সময় আরো এগিয়ে এসেছে, তাতে কি উন্নতি হয়েছে—না···

রা বে : বেড়েছে, বেড়েছে। তখনকার ধরুন—বিদ্যাভবনের ছাত্র খুব কম—একটি দুটি—

শ রাচৌ : হ্যাঁ শান্তিনিকেতন আকারে বেড়েছে, আর···এই···শিক্ষা

রা বে : প্রোফেসর, ফরেন প্রোফেসর দুই একজন থাকতেন—ফ্রেঞ্চ, জার্মানী—এই সমস্তগুলো হতো—তারপরে স্কুলের ইয়েটা—ওইরকমই· ওরকমই··· ছেলেদের, ছোট ছেলেদের···শিক্ষা···শিক্ষা

শ রাচৌ : আগের থেকে কি ভাল হয়েছে ?

রা বে : ভালোমন্দ ঠিক বলা যায় না···এখন···

academic এত বেড়েছে, স্কুলের মতো কলেজের মতো হয়ে গেছে। তখন এতটা নয়তো। মুষ্টিমেয় ছাত্র···কোনো ক্লাসে হয়তো দশ-বারোটি···কোনো ক্লাসে হয়তো পাঁচটি, কোনটাতেও হয়তো দুটি মাত্র—এরকম।

শ রাচৌ : সংখ্যায় কম হলেও তাদের quality অনেক বেশি ছিল কিনা ?

রা বে : Quality··তারা · পরীক্ষা দিতে হতো বাইরে গিয়ে—বাইরে বর্ধমানে ··ওই মানে···। এই foreign ছাত্রদের মধ্যে [বোধহয় বাইরে থেকে যারা এসেছিল তাদের বুঝিয়েছেন !] যেমন সৈয়দ মুজতবা, আমি একজন···সবতো স্কুলপালানো ছেলে—স্কুল ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছিল সব এখানে—এখানেই আমারও সুরু হলো। সৈয়দ মুজতবাও তাই—ম্যাট্রিক-নন্‌ম্যাট্রিক···এখানে জার্মানী—জার্মানীটা···জার্মান ফ্রেঞ্চ শিখলো Professor-এর কাছে, তাই নিয়ে বিলেতে গেলেন উনি।···বিলেত [জার্মানি !] গেলেন···Doctorate হয়ে এলেন···ওইরকম। তারপর অনেক ছাত্র নামকরা লোক রয়েছে সব···যেমন রেড্ডি···গোপাল রেড্ডি···Minister··· উনিও—ওইরকমই সব·· তারপর অনেক ছাত্র···।

তারপর আজকের নামকরা মেয়েদের মধ্যে মালতী সেন···মালতী সেন···। আজকাল 'সেন' নয়তো। এখন···মালতী ওই উড়িষ্যার·· উড়িষ্যার মালতী···

শ রাচৌ : কি, গান করেন ?

রা বে : না-না-না···নবকুমার [নবকুমার দাস : উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন] ওর স্বামী। মালতী উড়িষ্যার···মালতী সেন···পুরীর গো···পুরীর···ওর স্বামীর নাম নবকুমার···ওরাও সেই সময়ের···গোপাল রেড্ডির—ওরা একই ক্লাসের। তারপরে···আমাদের···এখন academic side-টা তো বেড়েছে অনেক—নূতন building দেখছেন—এইসব সেকালে ছিল কি···সব খড়ের

ঘর···এখন অনেক টাকাও পাওয়া যাচ্ছে, এখন centre থেকে···এইসব।

শ রাচৌ : তাতে আশ্রমের ভাবটা কমে গেছে ?

রা বে : আশ্রমের ভাব বলতে সেরকম নেই। এখন কি আর আশ্রমের মতো থাকবে···আমাদের এখানে যে open air স্কুল, কলেজ, সবই open air-এ হয়েছে, অন্যান্য স্কুলে সেগুলো ছিল না—আমাদের এখানেই প্রথম সুরু হলো। এতো হলো—কিন্তু···এখন academic···যেমন হয় সাধারণত ···তেমনিই হবে আর কি। গানটানগুলো যা শুনছেন, হয়তো এগুলোও থাকবে না···তাও হতে পারে···

শ রাচৌ : আচ্ছা বিনোদদা কি আপনার সঙ্গেই এসেছিলেন ? না আরো···

রা বে : ও আগে স্কুলের ছেলে ছিল···এখানেই পড়াশুনো করেছে। ওর চোখ তো খুবই খারাপ ছিল—একটি চোখ একেবারেই খারাপ—তা সবাই হাসতো, আর্ট শিখবে···চোখ নেই আর্ট শিখবে···। তা বলে, আমি আর্টই শিখবো···। তো নন্দবাবু বললেন···রবীন্দ্রনাথ বললেন যে, হ্যাঁ শেখো। বাপ, ভাই, সব বললেন যে আচ্ছা শেখ তা' হলে, art-ই কর। তা art তিনি কম করেননি। সেই চোখ নিয়েই—genius লোক তার প্রমাণ এই—হিন্দি ভবনের ফ্রেস্কোতে—genius.

শ রাচৌ : সত্যিই, ওটা একেবারে একটা সাংঘাতিক কাজ।

রা বে : সত্যজিৎ রায়ের এই ছবিটা···Inner eye.

শ রাচৌ : হ্যাঁ, Inner eye.

রা বে : ছবি দেখে আমরা দেখতাম কেমন দেখায়। মিনিয়েচারের দিকটা—সেই মিনিয়েচারের মধ্যেই রঙটঙ ইয়ে করা।

শ রাচৌ : এমনি চোখে না দেখলে space-এর যে···

রা বে : সেগুলো আন্দাজ হয়ে গিয়েছিল, calculation অদ্ভুত ছিল। আরো আশ্চর্য কথা হচ্ছে আজকের দিনে কোথায় কি ধরণের art হচ্ছে সব সম্বন্ধে উনি জানতেন।···সেকালে আর একটি মহিলা ছিল স্টেলা ক্রামরিশ—এখন তিনি আমেরিকা না কোথায় যেন থাকেন···তখন শান্তিনিকেতনেই থাকতেন ···তখনকার তারপর হ্যাভেল···আর কুমারস্বামী···তিনিই তো [হ্যাভেল !] আমাদের গুরু···তারপর অবনীন্দ্রনাথ···উনি কোলকাতার Art school-এ হ্যাভেলের school-এ···সে বেশ মজার···উনি [হ্যাভেল] Western Art-এর ওপর এত চটা ছিলেন—সমস্ত মূর্তি ছবি—পুকুর ছিল, তার মধ্যে ফেলে

দিলেন সব…এগুলো আজও পাবেন রাজেন মল্লিকের বাড়িতে…তিনি ওই… ওগুলো মার্বেল, টেরেকোটা…অনেক কিছু ছিল। রাজেন মল্লিকের ওখেনে গিয়েছিলাম আমি, দেখলম সব…সব collection করে রেখেছেন তিনি। তুমি যাবে, একদিন বাড়িতে ঘুরতে ঘুরতে বুঝেচো…।

আমি একদিন গিয়েছিলাম ওই কথা শুনেই…তখন অবনীন্দ্রনাথ Vice Principal ছিলেন…আর নন্দবাবু ছিলেন তার ছাত্র…উনিও Art School-এ ভর্তি হয়েছিলেন, পরে উনিও এখানে এলেন, অবনীন্দ্রনাথ এলেন…

আমার—আমার প্রথম ওই সোমা দেবের উচ্চারণ অস্পষ্ট! Portrait oil-এ এখানে আসবার পর…দু'তিন বছর পর…oil-টা ছেলেবেলায় করতাম, এগুলো আবার সুরু করলাম। সোমা দেবের [!] portrait প্রথম…অবশ্য oil-টা নন্দবাবু পছন্দ করতেন না। অবনীন্দ্রনাথের মাত্র একটিই…সাজাহানের যেটা…ওই একটি oil-এ করা। তারপরে oil তিনি আর করেননি।… তারপর আমিও oil-টা ধরলাম। নন্দবাবু…একটা…একটা…comment আছে এর মধ্যে…একবার অবনীন্দ্রনাথেরই ওই Bengal School, যেটা, কি যেন নাম ছিল…Oriental Art School, তার মধ্যে তিনখানা ছবি আমার ছিল আর বিনোদবাবুর দুটি…আমার ওই সোমা দেবের portrait-টা ছিল, আরও একটা বড়…আর একটা ওই কোনার্কের পথে। বিনোদবাবুর দুটো ছিল সেটাও oil-এ…অবনীন্দ্রনাথের comment-টা ছিল…একজন চলেছেন বিলাত আর একজন চলেছেন চায়না…হাঃ হাঃ হাঃ। এইগুলো হয়েছিল…কিন্তু ছেলেগুলো এত গুণ্ডা ছিল…বিনোদবাবুর ছবিটি exhibit-ই হলো না। কোথায় লুকিয়ে দিল। আমার তিনটে হল। হাঃ হাঃ হাঃ…ওই ছেলেগুলো বদমাইস ছিল…তখন হোমিওপ্যাথিক style…এখন সাংঘাতিক সব ব্যাপার।

সন্তরণ মল্লিক : গুরুদেবের সম্বন্ধে আপনার ব্যক্তিগত স্মৃতির দুয়েককথা বলুন না।

রা বে : গুরুদেবের স্মৃতি সম্বন্ধে…ওঁকে প্রায়ই বলতাম আমি আপনার একটা portrait করতে চাই মাটি দিয়ে। উনি বলতেন, 'না, না ওসব করো না, দরকার নাই!' যাই হোক তখন আমি portrait, এত without measurement portrait করি জানো তো…। আলাউদ্দিনের portrait-টা দেখবে তুমি…ওটা without measurement…15—20

minutes। উনি গেয়ে সেই ট্রেনেই ফিরবেন কলকাতায়…তো আচ্ছা… আপনি একটু দাঁড়ান…করে দিলাম। তা তখনকার দিনে আমি canvas-টা পরে লাগাতাম। ভাবলাম canvas না নিয়েই করব…আপনি [রবীন্দ্রনাথকে] কাজ করবেন। তাই হোল। তখন উনি C. F. Andrews-এর শ্রাদ্ধবাসরে কি বলবেন টলবেন…সেই দিন সেটা… তারই লেখা লিখছিলেন উনি, serious সব মুহূর্তটা ছিল। সেখানে আমি নিয়ে গেলাম…। উনি তো [রবীন্দ্রনাথ] প্রথমেই…'এসেছে এসেছে, আমার মুণ্ডপাত করতে এসেছে…মুণ্ডপাত করতে এসেছে'…হাঃ হাঃ…তখন একটা কথা, খুব important কথা…নন্দবাবু বলেছেন ওটা লিখে রাখ। আগে দেখে নিলেন কেউ আছে কি না…সুধাকান্ত রায়, অনিলবাবু…এরা সব থাকেন তো। উনি দেখলেন ঘুরে দূরে তাকিয়ে কেউ আছে নাকি! বললেন 'শোনো যখন দেখবে ঘাড় মটকে ধরবে, হাতগুলো এমনি করে… ঘাড় মটকে… দেখবে ঘাড় মটকে ধরবে, শেষ করে আর পেছনে তাকিয়ো না। আবার সামনে…!' তা আমি নন্দবাবুকে বললাম। উনি বললেন এটা লিখে রাখার মতো কথা…এটা ঋত্বিকের ওটাতেও দিয়ে দিইচি হেঃ হেঃ হেঃ। সেই বছরেই কিন্তু তার [রবীন্দ্রনাথের] মৃত্যু—জানেন। সেই বছরেই। করলাম তো মূর্তিটা…মূর্তি। তারপরই উনি গেলেন কোলকাতা —kidney operation-এর [Prostrate operation হবে, kidney operation নয়!] জন্য। ওইখানেই তো…সেই বছরেই…।

শ রাচৌ : আচ্ছা আপনি যে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের abstract যেটা করেছিলেন…

রা বে : ওটা আগে…উনি মন্দিরে যেতেন তো…মন্দিরে…lecture যখন দিতেন, তখন আমি পেছনে বসে থাকতাম—আর দেখতাম…তার impression নিয়ে ওটা করা। একটা মজা তো…চোখের expression-টা ওই…একদিন…একটা কথা বলছি…সেদিন ওই portrait-টা করছিলাম… সুধীর কর উনি ছিলেন—ওই লেখা টেখা নিয়ে যেতেন Press-এ। তা ওই আনছিলেন তো…ছোট্ট এই রকম Pack তো—কবিতা এইরকম রোল করা —কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?—'দেখাতে নিয়ে যাবো Press-এ'। ও আচ্ছা দেখি। দেখলাম দু একটা তারপর চলে গেলাম কাজে অন্যত্র…বললাম [রবীন্দ্রনাথকে] নূতন কবিতাগুলো দেখলাম ওই সুধীরবাবুর হাতে—।

'না ওসব খুব বাজে হয়েছে—ওসব বাজে'। সত্যিই কিছুদিনের মধ্যে ওঁর রোগশয্যায় যে বইটি বেরোলো—সেই কবিতার একটা লাইন এখানে ওখানে আছে [ ]—তাছাড়া একেবারে খোল নলচে দুটোই বদলে গেছে। কেবল একটি লাইন···'বিকারের রোগী সম ছুটে যেতে চায়'—একটি লাইন কেবল দেখলাম—আর সব বদলে গেছে। এইরকম···আমরা বদলাইনি যে তা নয়···খোল নলচেই বদলে যায়—হোঃ হোঃ হোঃ সবই হয়—উনিও ছিঁড়ে ফেলতেন·· তা, কি আছে।

শ রাচৌ : উনি আপনার ওই Portrait-টা দেখেছিলেন·· ওই abstract যেটা করেছিলেন ?

রা বে : না, ওটা আর দেখেননি, কিন্তু শান্তিদেব ঘোষ বলেছিল—হ্যাঁ : রামকিংকর একটা ছবি এঁকেছে—একটা ছবি এঁকেছে ছবিটা এইরকম চোখটা একটা বল দেওয়া··। উনি বললেন হাঃ হাঃ ওই কবি হোঃ হোঃ—ওইরকমই কবি।

গল্প

সোনামণির অশ্রু

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

লোকটিকে ভালো করে লক্ষ্য করুন !

রোগা-পাতলা, লম্বাটে চেহারা, বছর চল্লিশেক বয়েস। মাথার চুল বেশ ঘন, তার মধ্যে দু'চারটে সাদা। তুলনা দিয়ে বোঝাতে গেলে বলতে হয়, লোকটির মুখখানা অনেকটা ঘোড়ার মতন। তা বলে খারাপ দেখতে বা হাস্যকর কিছু নয়, অনেক মানুষের মুখই এরকম হয়। ধুতির ওপর সাদা হাফ শার্ট পরা, তার পোশাক মোটামুটি পরিচ্ছন্ন, বাঁ হাতে একটা সোনার আংটি।

লোকটি জগুবাবুর বাজারের বাইরের ফুটপাথ থেকে দুপুর দেড়টার সময় তালশাঁস কিনছে। দুপুর দেড়টা।

রাস্তার অনেক মানুষের মধ্যে সাধারণ একটি মানুষ। ওকে দেখে বোঝবার কোনো উপায় নেই যে ঐ লোকটি একটি খুনী।

খুনীরা কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে তালশাঁস কেনে ? টাকায় সাতটা দেবে না আটটা, তাই নিয়ে দরাদরি করে ?

দু'টাকায় পনেরোটিতে রফা হলো। লোকটি কাগজের ঠোঙাটি হাতে নিয়ে হাঁটতে লাগলো হাজরার মোড়ের দিকে।

কালিকা সিনেমার এক পাশের একটা তিনতলা বাড়ির দরজায় তিনটে চিঠির বাক্স। লোকটি দেখলো মাঝখানের বাক্সটি ফাঁকা।

দোতলায় আলো হাওয়া যুক্ত স্বতন্ত্র তিন কামরার ফ্ল্যাট। পনেরো বছর আগেকার ভাড়া। বেশ শস্তা। সল্ট লেকে জমি হয়েছে তার, কিন্তু বাড়ি করার

উৎসাহ নেই, দোকান থেকে অনেক দূর পড়ে যায়।

লোকটির স্ত্রী বাংলা মাসিক পত্রিকা পড়ছিল বিছানায় শুয়ে। মোটার দিকে গড়ন, দুপুরে ভাত পরে না। এই তো একটু আগে স্নান সেরে এসেছে, দুপুরবেলা এই সময় প্রত্যেকদিন তার স্বামী দোকানে অন্য কর্মচারী বসিয়ে রেখে বাড়িতে ভাত খেতে আসে।

ওদের ছেলেটিই বড়, এই সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে। আর মেয়ে ছোট, ন' বছর মাত্র বয়েস, স্কুল বাসে সেও ফিরেছে একটু আগে।

দরজার বেল শুনে মাসিক পত্রিকা মুড়ে রেখে স্ত্রী বললো, পুষি দোর খুলে দে, বাবা এসেছে!

এক বুড়ি এ বাড়িতে রান্নার কাজ করে, তিনদিন ধরে সে দেশে গেছে। গৃহকর্ত্রীকেই আজ খাবার গরম করতে হবে, আর গোটা কয়েক বেগুন ভাজা। একটা কিছু ভাজাভুজি না করে ওর স্বামীর মুখে ভাত রোচে না।

খাট থেকে নেমে তখুনি সে রান্না ঘরের দিকে না গিয়ে ড্রেসিং টেব্‌লের সামনে দাঁড়ালো। গুমোট গরম, দু'চারটি ঘামাচি হয়েছে তার বুকে, বাঁ হাত দিয়ে নিজের বাম স্তনটি চেপে ধরে সে ডান হাত দিয়ে ঘামাচি মারতে লাগলো।

মেয়ে দরজা খুলে বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, বাবা, কী এনেছো? কী এনেছো?

ঠোঙাটি মেয়ের হাতে দিয়ে লোকটি তার গাল টিপে একটু আদর করলো। তারপর ঢুকলো শয়ন ঘরে।

রক্ত মাংসের স্ত্রীর শরীরের চেয়েও আয়নায় আধো উন্মুক্ত বেশ বড় একটি বর্তুল স্তন তাকে মুগ্ধ করলো বেশি। সে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো।

দেয়ালে কালী ঠাকুরের ছবি, তাতে কাগজের লাল ফুলের মালা। ড্রেসিং টেব্‌লের দু'পাশে দুটি বাঁকুড়ার ঘোড়া। জানলায় একটি পুরোনো বিলিতি মদের বোতলে মানি প্ল্যান্ট।

খুনীর বাড়ি!

* * *

সেলিমপুরের এ পাশটা থেকে বড় রাস্তা পেরুলেই যোধপুর পার্ক। খানিকটা ভেতরে ঢুকলেই সোনামণির মাসীর বাড়ি।

সোনামণির মা আর বাবা দু'জনেই অফিসে যান, ফিরতে সন্ধে হয়ে যায় বলে সোনামণি ইস্কুল থেকে ফিরেই মাসীর বাড়িতে চলে যায়! বাড়ির ঝি তাকে দিয়ে আসে, নিয়ে আসে।

সোনামণির বয়েস এগারো। গল্পের বই-এর জগত ছেড়ে সে এখনো বাস্তব পৃথিবীতে পা দেয়নি। এইবার দেবে দেবে করছে। তার গায়ের রং বেশ ফর্সা, সারশের সৌন্দর্যে তার মুখখানা অপরূপ, খুব বাচ্চা বয়েস থেকেই লোকে তাকে দেখলে বলতো, ইস, একেবারে পুতুলের মতন দেখতে হয়েছে মেয়েটা। এক এক সময় এই কথা শুনলে সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলতো। সবাই এক কথা বলে, তার মোটেই পুতুল হতে ইচ্ছে করে না।

এখন সোনামণিকে কেউ কেউ আদর করে বলে আকাশের পরী। সে সবে মাত্র লম্বা হতে শুরু করেছে, মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল, চোখ দুটো দেখলেই মনে হয় কাজল টানা। পড়াশুনোতে সোনামণির তীক্ষ্ণ মেধা।

সন্ধে সাড়ে ছ'টা বাজে, সোনামণি মাসীর বাড়ির থেকে নিজের বাড়িতে ফিরছে। খানিক আগেই লোডশেডিং হয়েছে, রাস্তাঘাট একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বিকেলে প্রবল তোড়ে বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় রাস্তায় এখানে সেখানে জমে আছে কালো জল।

বাড়ির দাসী বিমলা সোনামণির হাত ধরে ধরে হাঁটছিল, কিন্তু সোনামণি নিজেই মাঝে মাঝে হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছে। সে আর অত ছোট নেই। আর দু'দিন বাদেই তার জন্মদিন। তখন সে বারোতে পা দিয়ে বড়দের জগতেও পা দেবে।

এত অন্ধকারেও রাস্তায় মানুষজন কম নেই। হেড লাইট জালিয়ে যাচ্ছে গাড়ি, তারই মধ্যে সাইকেল রিক্সা, একটা গরু···।

ফুটপাথ থেকে বড় রাস্তায় নামতেই খানিকটা জল। সোনামণি সেখানে পা দেওয়া মাত্র কেউ যেন তাকে নিচে টানলো হুস করে। সোনামণি হাত বাড়িয়ে বিমলাকে ধরতে গেল, পারলো না। চিৎকার করতে গেল, পারলো না।

রাস্তায় হাঁটু ডোবার চেয়েও কম জলে সোনামণি ডুবে গেল।

বিমলা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলো না। কোনো গাড়ির হেড লাইটে সে এক পলকের জন্য সোনামণির গায়ের সাদা ফ্রকটাকে দুমড়ে নিচে পড়ে যেতে দেখলো।

ও খুকু কোথায় গেলে? ও খুকু! কী হলো গো? ও খুকু!

বিমলা হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে নিজেও পড়ে গেল জলে, কিন্তু সে ডুবলো না। এবং সে জানতেও পারলো না তারই গোড়ালির ধাক্কায় সোনামণি আবার ডুবে গেল খোলা হাইড্র্যান্টের মধ্যে। একবার সে কোনো ক্রমে ভেসে ওঠার চেষ্টা করেছিল।

বিমলার চ্যাচামেচির কারণটা রাস্তার লোকদের বুঝতেই অনেকটা সময় লাগলো। সবাই তিতি বিরক্ত, কে আর অন্যের ব্যাপারে মাথা গলাতে চায়?

আড়াই ঘণ্টা বাদে নরকের পাঁক মাখা সোনামণির মৃতদেহ উদ্ধার করা হলো। যাক, তখনও মিশমিশে অন্ধকার রাস্তায়, কেউ তার বিকৃত বীভৎস মুখখানা দেখতে পায়নি।

* * *

রাত পৌনে একটা। এ সময় শহর প্রায় ঘুমন্ত হলেও কেউ কেউ জেগে থাকে।

পঞ্চাননতলা বস্তীর পাশে রেল লাইনের ওপরেই জনা পাঁচেক যুবক আড্ডা জমিয়েছে। এদের মধ্যে দু'জনের এখনো গোঁফ গজায়নি, তবু তারা টেনেটুনে যুবকদের দলে ঢুকতে চাইছে।

সামনে বাংলা মদের বোতল, আর ঝাল ঝাল কিমার চাঁট। চারজনের মুখে সিগারেট, একজন গাঁজা পাকাচ্ছে।

রাতের দিকে দু'একটা মাল গাড়ি চলে মাঝে মাঝে। তাও ইদানীং বেশ কমে গেছে। মাল গাড়ি এলে ওদের কাজ কারবার ভালো হয়। কিছুদিন ধরে বাজার মন্দা যাচ্ছে তাই ছ্যাঁচড়া কাজ করতে হচ্ছে।

হঠাৎ একজন ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, ভূ-ভূ-ভূ-ভূত!

আর একজন তার উরুতে একটা থাবড়া মেরে বললো, চুপ বে! চেল্লাসনি! রঙ চড়ে গেছে?

প্রথম ছেলেটি তবু আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে বললো, ঐ-ঐ-ঐ, ঐ যে ছাখ! ভূ-ভূ-ভূত!

এবারে পাঁচজনেই দেখতে পেল। ধপধপে সাদা ফ্রক পরা, ফুটফুটে ফর্সা, এগারো-বারো বছরের একটি পরী তাদের সামনে শূন্যে ভাসছে।

পাঁচজনে একেবারে থ। চোখের ভুল নয়, সত্যি দেখছে।

পরীটি খুব মিনতিপূর্ণ গলায় জিজ্ঞেস করলো, ওগো, তোমরা আমায় মারলে কেন? আমি কি দোষ করেছি তোমাদের কাছে?

পাঁচ যুবকের শরীরে কাঁপুনি ধরলো এবার। যেন পুলিশ তাদের অ্যারেস্ট করে ফল্স্ কেস চাপিয়ে দিয়েছে। এবারে ফাঁসী দেবে। এরা তো ছুরি-ছোরা বা পেটো-পিস্তলের কারবার করে না। সে জন্য অন্য দল আছে। ওরা তো সবে

মাত্র ছোটখাটো মাল সরাবার কাজে হাত পাকাচ্ছে।

বিনা নির্বাচনেই ওদের যে দলপতি, সেই গণা বললো, তোমায় কে মেরেছে? আমরা তো কোনো মেয়েছেলের গায়ে হাত দিই না? তুমি ভুল জায়গায় এসেছো!

কিশোরী পরী বললো, হ্যাঁ, তোমরাই মেরেছো। কেন মারলে, বলো, কেন মারলে? আমি কী দোষ করেছি? আমার বাবা-মা কি তোমাদের কাছে কোনো দোষ করেছে?

গণা বললো, আবে কী মুস্কিল, সত্যি বলছি, আমরা ওসব কাজ করি না। তোমাকে আমরা মারিনি!

কিশোরী পরী বললো, আর দু'দিন বাদে আমার জন্মদিন। আর হলো না। আমার আর ইস্কুলে যাওয়া হবে না! মা-বাবা আমায় আর দেখতে পাবে না। ওগো, তোমরা কেন আমায় এই শাস্তি দিলে। তোমরা যোধপুর পার্কের সামনে রাস্তার তিনটে হাইড্র্যান্টের লোহার ঢাকা খুলে নিয়েছো···

গণা এবারে চোখ বুজলো। পুলিশ যেন চোরাই মাল তুলে ধরে তার চোখের সামনে দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, ও কাজটা তাদেরই বটে।

এবারে দ্বিতীয় নেতা নেবু খানিকটা সাহস সঞ্চয় করেছে। সে বললো, হ্যাঁ, নিয়েছি। পেটের দায়ে। তুমি যোধপুরে থাকতে, তোমরা বড়লোক, গাড়ি করে যাও, তোমাদের নর্দমায় পা দেবার কথা নয়!

সোনামণি বললো, আমাদের গাড়ি নেই। আমি বিমলার সঙ্গে যাচ্ছিলুম, নর্দমায় পড়ে গিয়ে ডুবে গেছি, বিমলার পা ভেঙে গেল···ওগো, তোমাদের কি একটুও দয়া নেই?

গণা বললো, আজ শালা সন্ধেবেলা হেভি বৃষ্টি হয়েছে!

নেবু বললো, বৃষ্টি হয়ে রাস্তায় জল জমেছে সে তো শালা ভগবানের দোষ!

গণা সোনামণির উদ্দেশ্যে বললো, তুমি দয়ার কথা বলছো; আমরা যখন খেতে পাই না, তখন কেউ দয়া করে? তোমার বাপ-মা কি আমাদের খেতে দেবে? কোনো শালা খেতে দেয় না। কিছু চাইতে গেলে দূর দূর করে খেদিয়ে দেয়!

—তোমরা অন্য কাজ করতে পারো না? বড়রা যেমন অফিসে কাজ করে—

—হাঃ! তুমি কোথাকার পরী গো? কিছু জানো না। শুধুমুধু আমাদের

দোষ দিতে এসেছো? অন্য কাজ, হেঃ! নন্টেদা বেহালায় কারখানায় কাজ করতো, তার চাকরি গেছে। এখন সেও আমাদের লাইনে ঢুকেছে।

—ছিঃ, তা বলে তোমরা খারাপ কাজ করবে? যাতে মানুষ মরে?

—আবার ঐ কথা বলছো? তুমি যে মরেছো, সে জন্য যদি কেউ দায়ী হয়, তা হলে সে হলো জগুবাবুর বাজারের শিববাবু!

—সে কে?

—তার লোহার দোকান। সে আমাদের কাছ থেকে মাল কেনে। পার্কের রেলিং ভেঙে নিয়ে গেলে কম দর দেয়। নর্দমার ঢাকনা নিয়ে গেলে ভালো পয়সা। একখানা নিয়ে গেলে বলে আর মাল নেই?

—হ্যাঁ গো পরী, তোমার মৃত্যুর জন্য শিববাবু দায়ী! ও মাল যদি সে না কিনতো, তাহলে কি আমরা এমনি এমনি খুলতুম? সেই শিববাবু শালা আবার খুব কালী ভক্ত। দোকানে অ্যাও বড় ফটো!

সোনামণির আত্মা সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

* * *

কালিকা সিনেমার পাশে দোতলার ফ্ল্যাটে শিববাবুর ঘুম ভেঙে গেল।

স্বামী স্ত্রীর ডবল খাট, ছেলে মেয়েদের আলাদা আলাদা ঘরে বিছানা। কিন্তু মেয়েটা বড় বাবার ভক্ত, প্রায়ই নিজের বিছানা ছেড়ে বাবা-মায়ের মাঝখানে শুয়ে পড়ে।

শিববাবু চোখ মেলে আঁতকে উঠলো প্রথমটা।

জানলা দিয়ে ধোঁয়ার মতন কী যেন ঢুকছে। তারপর সেই ধোঁয়া একটি মূর্তি নিল। একটি অপূর্ব সুন্দরী কিশোরী মেয়ে, গায়ে সাদা ফ্রক, সে হাওয়ায় ভাসছে!

শিববাবু ভাবলেন, কোনো দেবতা বুঝি এসেছে তার ঘরে। লক্ষ্মী ঠাকরুণ? একটা লটারির টিকিট কিনেছে সে, যদি দু'কোটি দু'লাখ টাকার ফার্স্ট প্রাইজটা লেগে যায়…

ভাসমান পরী দুঃখের সুরে বললো, ওগো, তুমি আমায় মারলে কেন? আমি কী দোষ করেছি তোমার কাছে?

—অ্যাঁ?

শিববাবু আঁতকে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে কুল কুল করে ঘাম বইতে লাগলো তার শরীরে। এই মেয়েটা খুন হয়েছে? বাপরে বাপ, কী সাংঘাতিক কথা!

এমন একটা ফুটফুটে মেয়েকে যারা মারে, তারা কি মানুষ না শয়তান?

কিন্তু মেয়েটি তার কাছে এসেছে কেন? তার নামে অভিযোগ করছে? এ কি আশ্চর্য কথা।

—ওগো, তুমি কেন আমায় মারলে? আর দু'দিন পরে আমার জন্মদিন—

—এ কী কথা বলছো, মা? আমি কেন তোমায় মারবো? আমি বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার করি, আমি তো খুন-জখমের ব্যাপারে থাকি না। তোমারই বয়েসী মেয়ে আছে আমার—

—কেন, রেললাইনের কাছে লোকগুলো যে বললো, তুমি আমাকে মেরেছো?

—রেল লাইনের পাশের লোক? তারা কারা? আমি তো চিনি না। তোমার কী হয়েছিল, খুলে বলো তো?

—আমি যোধপুর পার্ক থেকে আসছিলুম, সন্ধেবেলা লোডশেডিং ছিল, রাস্তায় জল ছিল।

—ও হ্যাঁ, রেডিও'র রাত্তিরের খবরে শুনলুম বটে, ওদিকে একটি মেয়ে রাস্তায় দুর্ঘটনায় মারা গেছে। আহা গো! এমন কাঁচা বয়েসের মেয়ে, ছি-ছি-ছি, গাড়ি চাপা দিয়েছিল?

—রাস্তার নিচে পাতাল থাকে, আমি সেখানে ডুবে গেছি। পাতালের ঢাকনা ছিল না।

—কী বললে, পাতাল?

—রেল লাইনের লোকেরা বললে, তুমি সেই পাতালের ঢাকনা কেনো, তাই ওরা সেগুলো তুলে আনে। তুমি না কিনলে ওরা আনতো না।

—ও, এবার বুঝেছি! ওরা বাজে কথা বলেছে। আমি না কিনলে ওরা অন্য কারুর কাছে বেচতো। আমি দোকান খুলেছি, কেউ পুরোনো লোহা আনলেই কিনি। সে কোথা থেকে এনেছে তা আমার দেখার দরকার কী?

—তুমি জানো না, ওগুলো খুলে নিলে মানুষ মরে যেতে পারে? যেমন আমি মরে গেলাম? আমি কী দোষ করেছি যে এমনি করে আমাকে মরতে হবে?

—তুমি শুধু শুধু আমায় দোষ দিচ্ছো মা। জানো, ঐ লোহার ঢাকনাগুলো আমার কাছ থেকে কে কেনে? কর্পোরেশনেরই অফিসার। আমার কাছ থেকে কিনে নিয়ে গিয়ে রাস্তায় বসায়, গণা-নেবুরা সেগুলো আবার তুলে আনে, কর্পোরেশনের অফিসার আবার কিনতে আসে আমার কাছে। এর মধ্যে আমি

যে, আমি তো নিমিত্ত মাত্র। কর্পোরেশানের মিঃ দাস, তার কাছে যাও। সে তো জেনে শুনেই এসব করাচ্ছে!

—তুমিও তো জানতে?

—আমি অত শত চিন্তা করি না। আমি মাল কিনি, মাল বেচি; রাস্তা রক্ষা করার দায়িত্ব তো আমার নয়। পুলিশ এই চুরি বন্ধ করতে পারে না? পুলিশ ইচ্ছে করে ওদের ধরে না, বুঝলে? ওখানকার থানার ও সি-কে গিয়ে বলো, সে তোমাকে মেরেছে। আর যারা রোজ সন্ধেবেলা লোড:শেডিং করে? তারা জানে না যে রাস্তায় এত গর্ত, কত নর্দমার ঢাকনা নেই, সারা সন্ধে অন্ধকার থাকলে কত লোকের অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। হচ্ছেও তো রোজই। তারা দোষ স্বীকার করেছে কখনো, তুমি তাদের কাছে যাও! ছাখো গিয়ে, তারা সবাই এখন আরাম করে ঘুমোচ্ছে! তুমি একলা আমাকে দুষতে এসেছো কেন, মা? আহা, তোমার মতন একটা মেয়ে···

সোনামণি আবার ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে গেল জানলা দিয়ে।

শিববাবুর বুক কাঁপছে। হাত জোড় করে সে প্রণাম জানালো ঠাকুরের উদ্দেশ্যে।

তারপর পাশের ঘুমন্ত মেয়ের গায়ে স্নেহের হাত রাখলো।

তখুনি সে ঠিক করলো, পুষিকে সে কোনোদিন সন্ধের পর রাস্তায় বেরুতে দেবে না।

* * *

রাত্রির তৃতীয় প্রহরের আকাশে দুলতে লাগলো সোনামণির আত্মা।

শিববাবু নামের লোকটি কতগুলো লোকের নাম বললো। সে এখন কোথায় যাবে, কার কাছে তার দুঃখের কথা জানাবে। তার জন্মদিন আর হবে না। সে আর এই পৃথিবীতে বড়দের জগতে পা দিতে পারবে না।

এত বড় শহরের তো কিছুই চেনে না সোনামণি। শিববাবু যাদের নাম বললো, তাদেরকে এখন কোথায় খুঁজে পাবে?

ঢেউ-এর মতন অভিমান ঝাপটা দিতে লাগলো তার বুকে। রাত্রির শিশিরের মতন টুপ টুপ করে ঝরে পড়তে লাগলো তার চোখের জল।

সাময়িক প্রসঙ্গ

[অন্নদাশঙ্করের আশী বছর পূর্তি উপলক্ষে]

অন্নদাশঙ্কর
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

আমাদের যৌবনকালে তিনটি গ্রন্থ বাঙালি পাঠক সমাজে প্রচুর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। গ্রন্থ তিনটি হল—রাজশেখর বসুর 'গড্ডলিকা', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালি', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে'। বলা নেই কওয়া নেই অকস্মাৎ সাহিত্যের অঙ্গনে কুঠার হস্তে পরশুরামের প্রবেশ। সমাজের সর্বপ্রকার ন্যাকামি ক্ষ্যাপামি ভণ্ডামিকে বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করেছিলেন। রসিক সমাজ অট্টহাস্যে ফেটে পড়েছিল। নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু নাটকীয় ভঙ্গিতে বলেছিলেন—এঁ্যা, আপনি এত ভালো লেখেন, অবাক করলেন! বিভূতি-বাবুর দুটি চারটি ছোট গল্পের সঙ্গে পরিচয় ছিল। কিন্তু পথের পাঁচালি মুহূর্তে বাংলাদেশের হৃদয় জয় করে নিল। মনে পড়ছে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলাম—বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া অপুর ধরেছে কায়া।

অন্নদাশঙ্কর ছাত্রাবস্থাতেই চমক লাগিয়েছিলেন আই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে। কিন্তু তার অব্যবহিত পরেই 'বিচিত্রা' পত্রিকায় তাঁর পথে প্রবাসে যখন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে লাগল তখন যে চমক লাগিয়েছিলেন তার তুলনা হয় না। ভ্রমণ বৃত্তান্ত এর আগেও পড়েছি কিন্তু স্বাদে গন্ধে এ সম্পূর্ণ আলাদা। ভাষায় এমন মুন্সিয়ানা এক প্রমথ চৌধুরী ছাড়া আর কারো লেখায় ইতিপূর্বে দেখিনি (অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে কথা বলাই উচিত)। তাহলেও দুজনের বাচনভঙ্গিতে তফাৎ আছে। প্রমথবাবুর ভাষা ধারালো, তাকে তিনি রসালো করবার চেষ্টা

করেননি। গদ্যের গায়ে পদ্যের লেশমাত্র ছোঁয়াচটুকুও তিনি বরদাস্ত করেননি। এজন্যে তাঁর গদ্য ইংরেজিতে যাকে বলে একটু rugged ধরণের। অন্নদাবাবুর গদ্যেও ধার যথেষ্ট কিন্তু রসকে তিনি বর্জন করেননি। তবে গদগদ রস নয়; রসের একটু শুধু ময়ান দিয়ে নিয়েছেন। তাতে ভাষার ধার কমেনি, লাবণ্য বেড়েছে। ভারি সপ্রতিভ ভাষা—যে কথাটি যেমন ভাবে বলা প্রয়োজন ঠিক সে ভাবে বলেন। যুক্তি তর্কের ব্যাপারে তাঁর ভাষা রীতিমতো তুখোর কিন্তু মুখর নয়। অল্প কথায় অনেক কথা বলতে পারেন। ভাষা সম্বন্ধে এত কথা বলছি এই জন্যে যে অন্নদাবাবু বর্তমান বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী।

ভাষাটি যেমন চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে, রচনার প্রসাদগুণে বক্তব্যও তেমনি জল্‌জলে ঝল্‌মলে। এর মূলে আছে মনের সজীবতা। বয়সে আজ প্রবীন হলেও মনটি এখনও নবীন। তারুণ্য তাঁর স্বভাবধর্ম, আজীবন তারুণ্যের চর্চা করেছেন। তরুণ বয়সে লিখেছিলেন তারুণ্য নামে গ্রন্থ, তাতে তরুণ প্রাণের বা যৌবনধর্মের বিশ্লেষণ করেছিলেন। আর্ট ফর আর্টস্ সেক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে অন্নদাবাবু বলেছিলেন তিনি আর্ট ফর লাইফ্‌স সেক-এ বিশ্বাসী। খুব খাঁটি কথা। যিনি যৌবনের মর্ম বুঝেছেন তাঁর কাছে যৌবনও ফর লাইফ্‌স সেক। কারণ যৌবনই জীবন, যৌবনান্তে জীবনান্ত। অন্নদাবাবুর মুখে আমরা সেদিন দুঃসাহসিক যৌবনের বার্তা শুনেছি। গোড়ার দিকের রচনায় যৌবনই প্রধান থীম্। 'পুতুল নিয়ে খেলা' আর 'আগুন নিয়ে খেলা' একই থীম্-এর দুই ভিন্ন রূপ। সুবৃহৎ উপন্যাস সত্যাসত্যও যৌবন লীলারই কাহিনী। পাত্র পাত্রীরা প্রত্যেকেই যৌবন রসজ্ঞ, জীবন যৌবনের নানা পরীক্ষায় নিরত, নানা দ্বন্দ্বে দেহ মন আন্দোলিত। মনে পড়ছে উপন্যাসটির প্রকাশ কালে সত্যাসত্য নামটি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছিল। গুণমুগ্ধ পাঠক হিসেবেই বলেছিলাম, সত্য আর অসত্যের মধ্যে কি কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা আছে? বাস্তব জীবনে কিন্তু সত্য অসত্য, ভাল মন্দ দিব্যি মিলে মিশে সহাবস্থান করছে। একই মানুষের মধ্যে সত্য এবং অসত্য দু-ই মিশে আছে। সত্যাসত্য নামটাতে রাম রাবণ, কুরু পাণ্ডবের ন্যায় একটু moralizing-এর ভাব এসে যেতে পারে। পরে দেখে খুশি হয়েছিলাম যে উপন্যাসটির নতুন নামকরণ হয়েছে—'সুদী বাদল উজ্জয়িনী'। আমার কথাতেই হয়েছে এমন কথা বলছি না, হয়তো অন্নদাবাবু নিজেই কোন কারণে নামটি পরিবর্তন করেছেন।

গল্প-উপন্যাস-কবিতা-প্রবন্ধ সব কিছুতেই একসঙ্গে হাত দিয়েছিলেন। পরে

কেন যে কবিতা লেখা ছেড়ে দিলেন জানি না। বোধকরি গদ্য কবিতার রেওয়াজ হওয়ার পর থেকেই কবিতা লেখায় তাঁর উৎসাহ কমে গিয়েছিল। অন্নদাবাবু বলতেন, কবিতা হবে অলংকৃতা বনিতা। মনে হয় ছন্দ ছাড়া কবিতাকে তিনি লক্ষ্মীছাড়া কবিতা বলে মনে করতেন। ছড়া লেখায় চমৎকার হাত ছিল। সুখের বিষয় সেটি তিনি ছাড়েননি, এখনও লিখছেন। সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে তাঁর লেখা ছড়াগুলোর বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ছেলেভুলানো ঘুমপাড়ানি ছড়া ছিল আমাদের দেশে কিন্তু বড়দের ঘুম-ভাঙানি ছড়া ছিল না। অন্নদাবাবু সে জাতীয় ছড়া বেশ কিছু লিখেছেন। বুদ্ধদেব বসুর 'এক পয়সায় একটি', সিরিজে যখন তাঁর 'উড়কি ধানের মুড়কি' বেরিয়েছিল তখন অনেকেই চমৎকৃত হয়েছিলেন। এ সব ছড়া খেলা ছড়ার জিনিস নয়, হেলা ফেলা করে লেখা নয়। এক দিকে যেমন এর সামাজিক মূল্য, অপর দিকে তেমনি সাহিত্যিক।

যাক্, অন্নদাশঙ্করের সাহিত্যকৃতির গুণকীর্তন নিষ্প্রয়োজন। তিনি নিজ গুণেই গুণীজনের সম্বর্ধনা লাভ করেছেন। তার চাইতে বরং ব্যক্তিগত দুটি একটি কথা বলা ভালো। আমরা দুজন সমবয়সী। তিনি আমার চাইতে কয়েক মাসের ছোট। তবে বয়সে অনুজ হলেও, সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি আমার অগ্রজ। আমি যখন সবে দু-এক কলম লিখতে শুরু করেছি—অন্নদাশঙ্কর তখন খ্যাতির শিখরে। বলা বাহুল্য তাঁর একজন গুণমুগ্ধ পাঠক হিসেবেই প্রথম পরিচয়। পরে লেখক হিসেবে বন্ধুজনোচিত সৌহার্দ্য লাভ করেছি। আমার লেখা কোন ভাল বই তাঁকে পাঠিয়েছি, তিনি কখনো কখনো পাঠিয়েছেন তাঁর বই। আমার লেখায় wit-এর প্রশংসা করতেন। ইন্দ্রজিতের খাতা পড়ে আমাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন—প্রমীলাপতি, তোমার প্রতি / আমার নমস্কার / লেখনী তব সরস অতি / দৃষ্টি চমৎকার। একজন খ্যাতিমান পুরুষের কাছ থেকে সাধুবাদ লাভ করে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলাম সে কথা বলাই বাহুল্য।

গোড়ার দিকে আলাপ পরিচয় ডাকঘরের মারফৎ ডাকের বচনেই সীমাবদ্ধ ছিল। দেখা সাক্ষাৎ কদাচিৎ, মৌখিক বাক্যবিনিময় যৎসামান্য। পরে এক সময়ে অন্নদাবাবু চাকুরির মেয়াদ না ফুরোতেই আই. সি. এস.-এ ইস্তফা দিয়ে শান্তিনিকেতনে এসে বসবাস শুরু করলেন। শান্তিনিকেতনের স্বল্প পরিসরে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতিবেশী। সেই থেকে প্রতিবেশী হিসেবে বাস করেছি, পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছে। কত দিনের কত সুদীর্ঘ আলোচনার সুখস্মৃতি আজও মনে আছে। কাব্যসাহিত্য সম্পর্কে তো বটেই, তা ছাড়া অনেক সময় আলোচনা হয়েছে দেশের

নানা সমস্যা নিয়ে। সব বিষয়ে মতের মিল হয়েছে এখন বলব না কিন্তু দেশ সম্বন্ধে আমাদের দুজনেরই উদ্বেগ ছিল সমান। দেশের কথা দুজনেই লিখেছি, এখনও লিখছি। এটি আমাদের দুজনের মধ্যে একটি আত্মীয়তার বন্ধন বলা যেতে পারে।

অন্নদাবাবু দশ বৎসর কাল শান্তিনিকেতনে ছিলেন। এখানে অবস্থানকালে একটা মস্ত বড় কাজ করেছিলেন। সেটা শান্তিনিকেতনের সাহিত্য মেলা। দুই বাংলার সাহিত্যিকদের সম্মিলিত সমাবেশ সেই একবারই হয়েছিল। উদ্যোগ আয়োজন বারো আনা অন্নদাবাবু একলাই করেছিলেন। আমরা সঙ্গে থেকে যৎসামান্য সহায়তা করেছিলাম। মেলা খুব জমেছিল। কথা ছিল পাঁচ বছর অন্তর অন্তর মেলা বসবে। কিন্তু অন্নদাবাবু শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে গেলেন কলকাতায়। প্রধান উদ্যোক্তার অভাবে সাহিত্য মেলার আয়োজন আর হল না। ত্রিশ বছর পরে সাহিত্য মেলার দ্বিতীয় অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছিল গত বছর। এবারেও অন্নদাবাবুর আগ্রহাতিশয্যেই আয়োজন সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু সেবারের মতো এবারে আর বাংলাদেশের সাহিত্যিকরা এসে মিলিত হননি। কথা ছিল অন্নদাবাবু মেলার উদ্বোধন করবেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরও আসা হল না। তাঁর অনুপস্থিতিতে সে কাজটি করতে হয়েছিল আমাকে।

ইদানীং অন্নদাবাবুর সঙ্গে দেখা হয় কালে ভদ্রে। দেখা হলে এখনও আলাপ জমে, যেমন জমত সেই প্রথম পরিচয়ের যুগে। আজ দুজনেরই জীবন শেষ হয়ে এসেছে কিন্তু যৌবন শেষ হয়নি। অন্নদাশঙ্করবাবুর লেখার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা লক্ষ্য করবেন, সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি যেমন লেগে থাকে আকাশের গায়ে, পর্বত চূড়ায়, বৃক্ষ শাখায়, অন্নদাশঙ্করের যৌবন দীপ্তি এখনও বিচ্ছুরিত লেখার প্রতিটি ছত্রে।

মল্লিকা সেনগুপ্ত'র কবিতা

উৎপলকুমার বসু

কবে শুরু ?

বৌদ্ধ গল্পে, মল্লিকা পড়েছেন, ব্যক্তিমালিকানাহীন আদিম প্রাক্-কৃষিসমাজে
একটি অলস লোক প্রথম সঞ্চয় শুরু করে। মানুষের এই প্রথম
অপরাধ থেকেই জন্ম নেয় লোভ, ঈর্ষা ও অধিকারবোধ

এবং এই কবিতার।

বহুদিন পর বাংলা কবিতায় এক বিস্তৃত ক্যানভাস উন্মোচিত হ'ল—
পাঁচটি সর্গে লেখা দীর্ঘ কবিতা এ'টি—অনেক চরিত্র, অনেক চলচ্ছবি,
কেউ দীর্ঘস্থায়ী নয়, কাছ থেকে দেখলে মানুষের ফোকাস-বিকৃত রূপ
চোখে পড়ে, অনেক যুদ্ধকে যেমন অপ্রয়োজনীয় ব'লে মনে হয়, অনেক নগরী কেন
পুড়ে গিয়েছিল ভেবে আজ যেমন বিস্ময় লাগে

কিন্তু সব মিলিয়ে এক মীথ-তাড়িত শোভাযাত্রা, হিন্দু মন্দিরের অক্ষয় প্যানেলের
মতো, ক্যালেণ্ডারের উড়ন্ত পাতার মতো

আদি ন্যারেশন-য়ের মতো

এই কবিতা নাকি শেষ হয়েছে সভ্যতার ধ্বংসে। কবির তাই ধারণা।
আমি ধ্বংস শুধু স্বপ্নে দেখে থাকি। ঘুম থেকে জেগে উঠে এটুকু
ভেবে আশ্বস্ত হই যে ধ্বংস যতই ভয়াবহ হোক না কেন
সে-পারমাণবিক ধুলো থেকে বেরিয়ে আসবে অন্তত ক'টি আরশোলা

প্রাণের বিন্যাস

কীট-পতঙ্গের কাছে, জান্তব অস্তিত্বের কাছে, বহির্জগতের কাছে আশাবাদ শিখি

মল্লিকাও শিখুন।

মল্লিকা সেনগুপ্ত'র দীর্ঘ কবিতা

তুমি দস্যু তুমি ত্রাতা

প্রথম সর্গ : সে

শতাব্দীর চিহ্ন গায়ে, স্বরতশ্রমের জন্মটিকে
পাকে পাকে লতাতন্তু এই পথে, শঙ্কা পাকে পাকে।
এই শস্যক্ষেতে ছিলো যৌথ শ্রম, যৌথ অধিকার
একদা অলস এক ভাবলো ডুবেলা মুষ্টিধান

সংগ্রহ করার চেয়ে ভালো এক ছোট্ট সমাধান
হাতের সামনে আছে—শুরু হলো সঞ্চয়, একার
জন্য একা, একা একা, একার দ্যুলোক, বিশ্বব্যাঙ্ক—
তাকে সভ্যতার জন্য দায়ী করেছি একশোবার,

ভুলতে পারি না তবু, সে প্রথম প্রেম জেনেছিলো।
ভুলতে পারি না তবু, সে প্রথম মেঘ জেনেছিলো।
সে ছিলো প্রথম ভাগচাষী, সে ছিলো প্রথমভাগ
বিদ্যাসাগরের অ আ ক খ, বর্ষায় পেখম ধরা

সেই ছিলো একা দাঁড়কাক। তার দুই কানে ধরা
পড়েছিলো কিন্নর ও বাদুড়ের পাখার বেহাগ।
ঘন মেঘ ফুঁড়ে যে মরণ আলো আছড়ে পড়েছে
খরাক্লান্ত রাঢ়বঙ্গে, তাকে শস্য ভেবেছে সে ছেলে।

নৈমিষারণ্যের শম তোলপাড় করে কাঠ খুঁজি
অন্যদিকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ফেরেন শম্ভুজি
ভাত নেই টাকা নেই আমানি বেচবে বলো কাকে?
চাণক্য বিধান দেন জনস্বার্থে গরীবী হঠাতে

রাজার মঙ্গলে হয় প্রজার মঙ্গল—হঠাৎ এ
বিধি পাল্টানোর কথা যারা ভাবে, উঁচু বৃক্ষশাখে
তাদের কবন্ধ বেয়ে মনসার কোপ উঠে আসে
কলার ফলন বেশি ছিলো সে বছর, জ্যৈষ্ঠমাসে

থোড়ও রপ্তানী হলো খুব, গাছ বেঁধে ফেলা হলো,
স্বামীর করোটি নিয়ে ভাসলো বেহুলা। তাকে নিলো
সন্ধ্যার তিমির। স্নানঘাট থেকে বৈতরণী বেয়ে
যাত্রা। এ সময় বিদ্যাসাগর মশাই থমথমে

মুখে এসে দাঁড়ালেন ঘাটের ওপারে—'ওরে যমে
নেবে যে তোকে, ওই মড়া ফেলে উঠে আয়'—লজ্জা পেয়ে
নেতা ধোপানীও মুখ ঢাকে। এ জগৎ এক শান্ত
রঙ্গকালয়, মানুষে পরের ময়লা কেচে আনতো।

তান্ত্রিক কোটরগত চোখে কুশ্রী দেবীমুখ খোঁজে
আর সে নারীর কথা মনে রেখো, কলঙ্ক-ভয়ে যে
বাইরে আসে না, তার জিভ কাটা, তবুও পরমা
গোপন অলিন্দে তাকে পুরুষেরা তছনছ করে

স্পেসশিপ নাকি অশ্ব? গোরু না গোলাপ? অন্ধকারে
সব এক ভেবে সামন্তেরা শীর্ণা দাসীকে ক্ষমার

হাতে বিছানায় তোলে। রাত্রি আসে, রাত্রি যায় চলে
ভুলিনি বিদ্রোহ কেন জেনেছিলো সে-দাসীর ছেলে।

দ্বিতীয় সর্গ : স্বর্ণখননকারী পিপীলিকা

নগর নারী ও মেধা, প্রশান্ত বিকেল
পার হয়ে একদিন গ্রীকপথিকের
সঙ্গে দেখা হলো তার—মেগাস্থেনীস
বললেন বাঙালীর বিরুদ্ধ আহার
প্রথা, দুধ-মাছ-দই সব একাকার ;
মাটিতে হিরণ্য আছে, এখানে মুনিষ
স্বর্ণখননকারী পিপীলিকা, মুখে সোনা
তুলে শোনে ধর্মবাক্য—'আর এগিয়ো না'।

ঘোর রাত্রি ; লম্ফ হাতে আসন্ন শিশুর
পিতা ধাইমাকে ডাকে, হয়তো নিষ্ঠুর
নিশিডাক, ঘাড় মটকে পুকুরে ডোবাবে
তিন ডাক শোনা অব্দি চুপ থাকে ধাই,
চতুর্থ আহ্বানে তার দরজা খুলে যায়।
তেলকাজলের দেহ, জাতক স্বভাবে
খল হবে—লেখো এই ভাগ্যলেখা। বংশে
কলি এলো হিংসাগর্ভে, ক্রোধের ঔরসে।

গায়ে পূতিগন্ধ, ইনি পাশা, নারী, মদ
ও সুবর্ণভোগী। এই কলিকালে হ্রদ
জলশূন্য হবে, চোনা ও ভস্ম মিশিয়ে
কাপড় কাচবে গৃহবধূ, স্ত্রীলোকের
অতিথিগৃহের থেকে শুরু ত্রিলোকের
বর্ণসংকর, মন্ত্রী ঘেরাও, মঁসিয়ে

ভের্তুর বউখুন। বারণ না মেনে
প্রতিলোম বিবাহই চায় বরকনে

কবে শুরু হয়েছিলো পূত বর্ণভেদ ?
এ নির্দেশ কে দিয়েছে, বেদ না নির্বেদ ?
'অয়মহং' ; আমারই মস্তিষ্ক নিঙড়ে
সৃষ্ট এ-ব্রাহ্মণজাতি, আমার ভুবাহু
ধরে রাখে ক্ষত্রিয়কে—পাছে কোন রাহু
গ্রাস করে ; উরু থেকে বৈশ্যকুল। নিন্দে
পাপ, ঈশ্বর নির্মেদ, শূদ্র জাতি দাস—
শ্রীচরণ থেকে জন্ম তবু ভয় পাস !

সে প্রথম জেনেছিলো কৌলীণ্যপ্রথার
গুণগান। সবচেয়ে যে রূপসী, তার
অধিকার ছিলো স্বামীগৃহে, অন্য স্ত্রীরা
নমাসে ছমাসে আলো দিতো রতিকক্ষে।
অন্ত্যজ প্রজাতি যতো, বাগদী, সরখেল
গোপ—তারা অবাঞ্ছিত রাজার ক্রীড়ায়।
সে ছিলো সচিব রাজা বল্লালের, ছিলো
সে কুলীন শ্রেষ্ঠ, ছিলো অচ্ছুৎ বালক।

তৃতীয় সর্গ : যুদ্ধ, জনপদ

দেবীর মন্দিরে তুমি বলি দিলে আমার মেয়েকে
কখনো করবো ক্ষমা ? 'আর শুঙ্গার না, সরে যাও'

আমার মেয়ের জন্য যুদ্ধ শুরু হলো জনপদে
আমি তার জন্মিত্রী, আমি তবে যুদ্ধের কারণ ?

যে প্রৌঢ় কর্ণেল এসে আছড়ে পড়ে তোমার দুপায়ে
ঘরে তার রুগ্ন স্ত্রী, তারও চোখে ধ্বংসের ইঙ্গিত

লোটা ও কম্বল স্কাইক্রাপারের চূড়ায় চূড়ায়
কপোত অবধ্য, তাকে গুলি করে নামিয়েছে ওরা

আজ সূর্য মেঘে ঢাকা, উষা আজ সপ্তাশ্বের রথে
টানে নি সূর্যকে। 'আর শৃঙ্গার না, সরে যাও দূরে'

রাজকোষাগারে ঢুকে হতবাক গুগাবাবা—এই
স্বপ্ন শুকপাখিদের গণনার মতো রত্নগর্ভ

জগৎ শেঠরা এসে যুদ্ধের সময়ে সহায়ক
হয়ে যোগ দিতে চায় আণবিক এই অশ্বমেধে

আমার রূপের জন্য, আজ যুদ্ধ রূপের কারণে,
রূপের কারণে আমি বন্দী, পাখা সোনায় জড়ানো

আমি আকাশের লার্ক অতসী গাছের দিকে উড়ে
যেতে যেতে তীরবিদ্ধ—নিষাদের প্রাসাদে এসেছি

কিন্নরীর অংশ নিয়ে এসেছে আমার ছোট্ট মেয়ে
এ বিষাদ রাজ্যে তোকে কেউ চাইলো না, মা আমার!

একে একে সরে যায় শিলা, নেই কোনখানে থামা,
নোঙর ফেলবো কোথা, কোনদিকে, পূবে না পশ্চিমে?

পাহাড়ের ওপরে যে অল্প সমতল মিশে ছিলো,
ওখানে মশাল জ্বালে কারা? কারা নাচছে খেউড়ে?

চড় চড় শব্দে পোড়ে শকুনির জ্যান্ত নখ
ওদের প্রার্থনা ছিলো—হেই বাবা, ভঙ্গ দাও রণে।

সবুজ কফির ক্ষেত লাল ক'রে এবারের মে ডে
দেখা দিলো, পার্বতীর পিঠে ঝুড়ি, দুচোখে সায়ক।

জন্মাবধি আমিই ডাগন, তিব্বতের আমি গর্ব,
আজ, পার্বতীর ছেঁড়া শাড়ি দেখে বুঝি গর্ব নেই

কোথায় লুকাবে? নাকি গর্ব মৃত? সহস্র বীরের
ঠোঁটে যা লালার মতো, আমাকেও নাচাতো দ্বৈরথে?

তবে কি আমার পাপে বনভূমি ভস্ম ক'রে চোরা
স্রোত ভাসাবে আমাকে? 'আর না শৃঙ্গার, সরে যাও'

এ কি অস্ত্র! গর্ভে ভ্রূণ কেঁদে ওঠে, বেহুলার গীত
থেমে যায় অকস্মাৎ, স্তব্ধ হয় মুখর পায়েল

আমাকে বাঁচতে দাও, আমি লার্ক, কবির কারণ
আমি বন্দরের হাতছানি, আমি সুখ-সম্পদের—

হোক ইন্দ্র, হোক স্বামী; আর না শৃঙ্গার, সরে যাও
পুড়ছে নগর, নারী লোফালুফি জাহাজের ডেকে।

চতুর্থ সর্গ: ভিনাস বিবর্ণ

সে আমাকে ছেড়ে গেছে। নিচে ক্যাকটাস
ওপরে দ্বিগুণ সূর্য, শুধু বালিভরা
ছিলো তবে এ শরীর? গুঁড়ো গুঁড়ো ভেঙে
যাচ্ছে, ঝরে যাচ্ছে ঠোঁট, কটি ও চিবুক
ফুলে উঠছে মরুভূমি, ফুলকচি বুক
উড়ে গেলো বালি থেকে, ধান ভেনে ভেনে
তালুতে পড়েছে কড়া। ঘোড়সোয়ারেরা
ছেড়ে যায় ডাকবাংলো, বিবর্ণ ভিনাস।

দুহাজার দুশো ফিট ওপরে হঠাৎ
সব অক্সিজেন শেষ, সোনার বিদ্যুৎ
শুষে নিলো বৈমানিক আমার স্বামীকে

কাকেরা তখন গন্ধে বেরিয়েছে, ভোর—
সে ছিলো প্রথম চ্যুত, ধর্মত্যাগী জাঠ
সে ছিলো অচ্যুৎ, নীল অশনির দূত।
ফুসফুসে ভরা রক্তযক্ষা, নিকেলের
আলো, নীহারিকা, তবু দুচোখ বিভোর।

বর্ণভেদ, জাতিভেদ, লিঙ্গভেদ করো
তুমি কোহিনূর, তুমি মসৃণ গোলাপ;
রাজার হাতির সঙ্গে সার্কাসের হাতি
জুড়ে দাও ফেভিকল তুমি; আর ম্যাগি—
দুমিনিটে চাউ চাউ, শ্রীযুক্ত সারোগী
সেই প্লেট হাতে নিয়ে বুড়ো ফ্ল্যাহার্টির
এস্কিমো জীবন ভাবে। থার্টিওয়ান আপ
রাত চিরে পৌঁছে যায় ধর্মাধিকরণ।

বর্ষাকালে, হে ঘরণী, স্বামীকে বর্ষাতি
ছাড়া বেরোতে দিও না, আর শনিবার
রেসের মাঠের দিকে যদি যায়, গুণে
রেখো পার্স, ভোরবেলা ঈষৎ লেবু চা
তাজা চনমনে। ও যে তোর বর: স্বাতি,
পিলোকাভারের সঙ্গে জিয়াজী দুর্বার—
মহেশ্বরের কাছে চেয়ে নিস আগুনের
মতো রূপ, অনির্বাণ প্রেম রোগ চাস।

তুমিই প্রাচীন বট, কিংবদন্তী তুমি,
পাখির আশ্রয়, তুমি স্তব্ধ মহাকাল
ভূমণ্ডলের চাবি তোমার কোটরে
জল থেকে উঠে এসে অলস কুমীর
নিজেকে বিছিয়ে দেয়, তুমি সেই জলে—
সকালে পাখার শব্দে, নখের আঁচড়ে
ডানা মেলে ভোর, তুমি পূর্ণ অচঞ্চল
নামাও বটের ঝুড়ি, নামাও আঁচল।

পঞ্চম সর্গ: জাহাজ হাঙরমুখী আমি

নীল হয়ে গেছে তোর মূল থেকে তর্জনীর ডগা
এই শুরু, তোর মৃত্যু হবে গণিকার হাতে কিংবা
ইকোর দারুণ অভিশাপে। মেয়েদের বাঁ শরীর
চাঁদের উঠোন, তাও পছন্দ হলো না, এতো গর্ব!

নাকি থির বিজুরীকে ছুঁতে ভয় পাস? ওরে রোগা
ছেলে, বোকা ছেলে, ধ্বস নেমে আসা পূর্ব সিকিম বা
বারণাবতের ভস্মরাশি কখন যে মাধুরীর
দ্বীপে টেনে নিলো তোকে বুঝিস নি, যাদু সরবৎ

অবশ করেছে বোধি, পৃথিবীকে মৃগনাভি বলে
মনে হয়। আমি ধূলিস্পর্শ নিতে চাই, দেখি ধুলো
বাণিজ্যের অভিশাপে সোনা হয়ে গেছে, আমি টাকা
ছুঁতে চাই, ধাতুমুদ্রা জলে ওঠে হাতের তালুতে।

গ্রহের জঠর কেঁপে ওঠে স্টারযুদ্ধ শুরু হলে,
কাঁপে নিউ এম্পায়ার, লোক পালানোর শব্দগুলো
ঠ্যাঙারে নৌকোর মতো তাড়া করে, ভয়ার্ত জোকার
ডুবে যেতে থাকে অন্ধকারে, ভাঙা টেলিফোন বুথে।

তরু দত্তদের দেশে আছড়ে পড়ে তৃতীয় যুদ্ধের
তিন তাস—বৃহন্নলা, বিকার, বম্বার। ভেবেছিলে
মাধুরীর দ্বীপ, বোকা ছেলে, এ তো কাকবন্ধ্যা নারী
এতো মৃত্যু-আমলকী, এ-দেশে তক্ষক জেগে থাকে।

আর কি জাগে না কেউ? নিষ্ক্রমণকামী মহাথের
বুদ্ধ পূর্ণিমার কথা ভুলে গেছে? যে যুবারা ঢিলে

পোষাকের আচ্ছাদনে চরস বন্দনা করে, তাড়ি
খায়, তারাও জাগে না ? 'কোজাগর ! কোজাগর !' কাঁখে

ঝাঁপি নিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে অলোক সামান্যা,
তাঁর অভ্রভেদী চোখ দেখে এই ভৌতিক নগরে
ছড়িয়ে পড়ছে তাঁর অসংখ্য পেঁচারা। নগর
না মৃতবৎসা জায়া আমি তোর ? জায়া না জাহাজ ?

ক্রমশই ডুবে যাচ্ছি, অচেতনে 'মার না' 'মার না'
'ছুঁড়ে দে হাঙরমুখে'—শুনি ওরা চিৎকার করে।
সমুদ্র বাতাস এলো পূবদিকে যেন অজগর
নিঃশ্বাস ফেলছে, ভৌতিক নগর যেন ধ্বংস আজ।

আমি যে হাঙরমুখী জলের জাহাজ, ডিঙি নৌকো
ছিলাম আদিতে, উষানগরের কোল ঘেষে, আমি
ছিলাম প্রথম নারী, প্রথম প্রেমিক তুমি ছিলে
নিযুত বছর কেটে গেছে তারপর, এখন হাঙর

গিলে খাচ্ছে আমাকেই, তীক্ষ্ণ দাঁত, চোয়াল চৌকোণ।
ভুলতে পারি না তবু, প্রথম আগুন জেলে তুমি
বলেছিলে 'ঘর বাঁধো', তুমি ছিলে উষার মিছিলে,
মিছিলে তুমিই দস্যু, তুমি ত্রাতা, তুমি যাযাবর।

আলোচনা

সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান
শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ

বাংলাভাষায় একটা শব্দ আছে 'জ্ঞানপাপী'। এই শব্দের প্রকৃষ্ট এক দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে উপস্থিত এই লেখক। বয়স ৮৭। চিন্তা-ভাবনা শিথিল, অবিন্যস্ত। স্মৃতিশক্তি পলায়মান, কথন-বা প্রবঞ্চক। চোখে আলো নেই—বিশেষ প্রয়োজনে অপরের চোখে দেখে, অপরের হাতে লেখে। এ হেন লেখক ভার নিয়েছে গ্রন্থ-সমালোচনার। গল্প, কাব্য, প্রবন্ধের গ্রন্থ নয় যে শুনে শুনেই মন্তব্য করা যাবে। গ্রন্থখানি হচ্ছে অভিধান—যার প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি অক্ষর, হস্-চিহ্ন, বিন্দু-চিহ্ন, উদ্ধৃতি-চিহ্ন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা দরকার, লক্ষ্য করা দরকার সমাসবদ্ধ শব্দ একত্র আছে, না বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

জিজ্ঞাসা করতে পারেন অন্ধ লোকের, অক্ষম লোকের এ বাতুলতা কেন, পরপারে যাবার কালও তো বহুদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, ঘটে এখনও বুদ্ধি এল না।

সদুত্তর নেই। শুধু বলছি—প্রিয়জনের অনুরোধ। রাখতে না পারলে অস্বস্তি। রাখতে গেলেও হাস্যাস্পদ হতে হবে—জেনে-শুনেই এই হঠকারিতা।

সমালোচ্য গ্রন্থ—'সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, চতুর্থ সংস্করণ'। প্রকাশ-কাল ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪। প্রকাশক শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত, শিশু-সাহিত্য-সংসদ্ প্রাইভেট লিঃ।

শ্রীসরস্বতী প্রেসের অন্যতম কর্ণধার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রকাশক-মহলে স্বনামধন্য। কল্পনাকুশল এই প্রকাশকের প্রতিষ্ঠিত 'শিশু-সাহিত্য-সংসদ্' দেশের

কিশোরদের চিত্তহারী চিত্রবিচিত্র শিক্ষাপ্রদ বহু গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন। এই কাজে তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী নরেন্দ্রনাথ দত্ত, তিনি এই সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধানেরও প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়েছেন। নরেন্দ্রনাথ আর এ জগতে নেই। তাঁর অকাল-প্রয়াণে শিশু-সাহিত্য-সংসদের যে-ক্ষতি হয়েছে, আক্ষরিক অর্থেই তাকে বলা চলে 'অপূরণীয়'।

শিশু-সাহিত্য-সংসদ্ আজ শুধু শিশু-সাহিত্যই প্রকাশ করছেন না, বিভিন্ন বিষয়ে মননশীল বহু সদ্গ্রন্থ রচনা করে সংসদ্ দেশের জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন, শিশু-সাহিত্য-সংসদ্ আজ পূর্ণ 'সাহিত্য-সংসদ্'-এ রূপান্তরিত।

সাহিত্য-সংসদের প্রধান কীর্তি উন্নত মানের অভিধান-প্রণয়ন—এই অভিধান-সমূহের মধ্যেও গুণবত্তায় সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে 'সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান'।

সাহিত্য-সংসদের অভিধান-সঙ্কলনে সবিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, এম্-এ। দুঃখের বিষয়, শৈলেন্দ্রবাবুও অকালে লোকান্তরিত। তীক্ষ্ণধী এই কৃতী আভিধানিকের তিরোধানও সাহিত্য-সংসদ্‌কে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। শৈলেন্দ্রবাবুর সঙ্কলিত দুখানি অভিধানই, Samsad English-Bengali Dictionary ও সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান ছাত্র-শিক্ষক-লেখক মহলে বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেছে। সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধানের তৃতীয় সংস্করণ পর্যন্ত শৈলেন্দ্রবাবুর রচনা। তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় শৈলেন্দ্রবাবু লিখেছেন—

"ইহাতে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যবহৃত সমস্ত তৎসম তদ্ভব দেশজ ও বিদেশী শব্দ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে অপ্রচলিত এবং পূর্বেও নিতান্ত বিরল ব্যবহার শব্দাবলী সাধারণতঃ বর্জন করা হইয়াছে। তবে ছাত্রদের সুবিধার জন্য বৈষ্ণব পদাবলী মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দাবলী বর্তমানে অপ্রচলিত হইলেও যথাসম্ভব প্রদত্ত হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যে ও আধুনিক উপন্যাসাদিতে সচরাচর ব্যবহৃত বহু প্রাদেশিক শব্দ এবং সুপ্রচলিত আরবি-ফারসি-মূলক শব্দসমূহও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, নবসঙ্কলিত যে-সমস্ত পারিভাষিক শব্দ সংবাদপত্র ও পাঠ্য-পুস্তকাদিতে আজকাল প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয়, তাহাও ইহাতে নিবদ্ধ হইয়াছে। অধিকন্তু, সাহিত্যে সুপ্রচলিত চলিত ভাষার বিশিষ্টার্থ-প্রকাশক শব্দসমষ্টিগুলিও (Idiomatic expressions) ব্যাখ্যাত হইয়াছে।"

আখ্যাপত্রে অভিধানের পরিচয় দেওয়া হয়েছে—

"আধুনিক ও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকারের প্রায় অর্ধলক্ষ

শব্দের পদ, অর্থ, প্রয়োগের উদাহরণ, ব্যুৎপত্তি, সমাস ও দুই সহস্রের উপর বিশিষ্টার্থ-প্রকাশক শব্দসমষ্টির ব্যাখ্যা এবং তৎসহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত পারিভাষিক শব্দাবলীর বিস্তৃত তালিকা সংবলিত কোষগ্রন্থ।"

চতুর্থ সংস্করণের সম্পাদক কে গ্রন্থে স্পষ্ট করে বলা হয় নি। নূতন সংস্করণের কোন ভূমিকাও নেই। ভূমিকা একটা আছে বটে, সেটা শৈলেন্দ্রবাবুর লেখা তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা, ১৩৭৮ সালের বুদ্ধপূর্ণিমায় রচিত। সংশোধিত নূতন সংস্করণে প্রয়াত সঙ্কলকের পুরাতন ভূমিকা অসতর্ক পাঠকের বিভ্রান্তি জন্মায়। অবশ্য 'প্রকাশকের নিবেদন' আছে। প্রকাশক জানাচ্ছেন—

"সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান-এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর সঙ্কলক শৈলেন্দ্র বিশ্বাস ইহলোক ত্যাগ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের সংশোধক পণ্ডিতপ্রবর ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ইতোপূর্বেই (sic) পরলোকগত হন। তৃতীয় সংস্করণ সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি চতুর্থ সংস্করণও সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। সংশোধন ও পরিবর্ধনের কার্যে অধ্যাপক ভট্টাচার্যের অশেষ পরিশ্রমে আশা করি চতুর্থ সংস্করণ আরও উন্নত ও ব্যবহারকারীদের নিকট আরও উপযোগী বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। অভিধানের পরিশিষ্ট বিভাগের পরিভাষা অংশ আদ্যোপান্ত সংশোধন ও পরিবর্ধন করিয়া দিয়াছেন সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সুধাংশুবিমল বড়ুয়া।"

চতুর্থ সংস্করণের আকার ডিমাই অক্টেভো। মূল অভিধান-অংশের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৮১১। বহিঃসৌষ্ঠবে কোন ত্রুটি নেই—বাঁধাই ভাল। কাগজ ভাল, ছাপা ভাল।

এক শ্রেণীর লেখক আছেন যাঁদের বলা যায় purist (শব্দটির যথোপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ জানি না)। এই লেখকদের মধ্যে যাঁদের লেখনী বিদ্যুদ্‌গতিতে চলে তাঁদের হাতের কাছে সর্বদা একখানি প্রামাণিক ক্ষুদ্রাকার অভিধান চাই যা সহজে নাড়াচাড়া করা চলে। বৃহদায়তন অভিধান খুলতে চিন্তার খেই হারিয়ে যায়। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও পছন্দ করে ছোট মাপের অভিধান। ইংরেজী ভাষায় সচরাচর এই প্রয়োজন মেটায় P. O. D. (Pocket Oxford Dictionary)। আধুনিক বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীর প্রথম অভিধান সঙ্কলিত হয়

৫৬/৫৭ বছর আগে—রাজশেখরবাবুর 'চলন্তিকা'। চলন্তিকার প্রকাশ যেন এক 'আবির্ভাব'—বাংলা অভিধান-জগতে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। উৎসাহী সুধীবর্গ সমস্বরে অভিনন্দন জানালেন—চলন্তিকা হালফিল বাংলা ভাষার P. O. D., আধুনিক বঙ্গভাষার সুপরিসর শ্রেষ্ঠ অভিধান। অষ্টম সংস্করণ পর্যন্ত চলন্তিকার এই গৌরব ছিল অক্ষুণ্ণ। চলন্তিকার নবম সংস্করণ প্রকাশিত হয় অভিধানকার মনস্বী রাজশেখর বসুর দেহাতায়ের পর। স্বাভাবিক কারণেই অভিধানখানির নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পায়। নূতন সংস্করণে কিছু কিছু ভুলভ্রান্তিও দেখা দেয়। সুযোগ্য সম্পাদনায় পরবর্তী সংস্করণগুলি পরিমার্জিত হয়েছে কিনা, চলন্তিকা স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা জানি না।

সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান চলন্তিকারই আদর্শে রচিত। দ্বিতীয় সংস্করণ পর্যন্ত এই অভিধান সর্বথা চলন্তিকাকেই অনুসরণ করে চলেছে, অভিনবত্ব তেমন কিছু ছিল না। তবে তৃতীয় সংস্করণে সংসদ্ অভিধান নবসাজে সজ্জিত হয়ে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠেছে, ঘরে ঘরে স্থান পেয়েছে।

আশা করেছিলাম চতুর্থ সংস্করণে সংসদ্ অভিধান আরও সুসংস্কৃত হয়ে শুধু জনপ্রিয়ই থাকবে না, অধিকতর প্রামাণিক হবে। তবে সে-আশা ফলবতী হয় নি। তৃতীয় সংস্করণের কিছু কিছু ত্রুটি সংশোধিত হয়েছে বটে, আবার নূতন নূতন ভ্রমপ্রমাদও প্রবিষ্ট হয়েছে। সমালোচকের কর্তব্য গ্রন্থের গুণ-দোষ নির্ণয় করা। কিন্তু সে-ক্ষমতা দৃষ্টিহারা এই সমালোচকের নেই। শ্রমলাঘবের জন্য অভিধানের বৈশিষ্ট্য গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা থেকেই উদ্ধার করি।

"সাধারণতঃ বাঙ্গালাভাষায় ব্যবহার-অনুসারেই শব্দসমূহের অর্থ দেওয়া হইয়াছে; যে অর্থের প্রয়োগ বাঙ্গালায় প্রচলিত নাই, বিশেষ কারণ ব্যতীত উহা দেওয়া হয় নাই। বিভিন্ন অর্থ সাধারণতঃ প্রচলন-অনুসারে সাজান হইয়াছে; কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন-বোধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। অর্থগুলির মধ্যে এক পদের তুল্যার্থবাচকগুলি কমার দ্বারা পৃথক্ করা হইয়াছে এবং ভিন্নার্থবাচক অর্থ দিবার পূর্বে সেমিকোলন ব্যবহার করা হইয়াছে। যে-সকল শব্দ একাধিক পদে ব্যবহৃত হয়, সেই-সকল শব্দের বিভিন্ন পদের অর্থ (১) (২) (৩) করিয়া পৃথক্ পৃথক্ প্রদত্ত হইয়াছে।

"শব্দের অর্থ বিশদ করিবার জন্য বহুস্থলেই প্রয়োগের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, এবং অনেক ক্ষেত্রেই উদাহরণসমূহ বিখ্যাত লেখকদের রচনা হইতে আহৃত হইয়াছে।...

"যে-সমস্ত তৎসম শব্দ বাঙ্গালায় কোন নূতন অর্থ লাভ করিয়াছে, তাহাদের ঐ নূতন অ-সংস্কৃত অর্থের পূর্বে (বাং.)-সঙ্কেত যোগ করা হইয়াছে। আবার যে-সমস্ত তৎসম শব্দের বিশেষ প্রচলিত অর্থগুলির মধ্যে কোন অর্থ বাঙ্গালায় চলিত নাই, তাহাদের ঐ অর্থের পূর্বে (সং.)-সঙ্কেত যোগ করা হইয়াছে।

"অনেক স্থলে শব্দের কোন অর্থ সহজবোধ্য করিবার জন্য উহার ইংরেজি প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। পারিভাষিক শব্দগুলি সম্বন্ধে এই পদ্ধতি বিশেষ-ভাবে অবলম্বিত হইয়াছে।

"ছাত্রগণের পক্ষে বিশেষ প্রচলিত শব্দসমূহের একার্থবাচক অন্যান্য শব্দ জানা প্রয়োজন। বাঙ্গালা রচনায়, বিশেষতঃ কবিতা রচনায়, ইহার প্রয়োজনীয়তা সাহিত্যিকগণ প্রায়শঃ অনুভব করিয়া থাকেন। সেজন্য এই অভিধানে কয়েকটি প্রচলিত শব্দের অর্থের মধ্যে তাহাদের পর্যায়শব্দসমূহও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

"কোন্ শব্দ কিভাবে উৎপন্ন হইয়াছে জানিলে, উহার অর্থ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। সেজন্য এই অভিধানে প্রায় সমস্ত প্রধান শব্দের ব্যুৎপত্তি ও সমাস দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু স্থানসংক্ষেপের জন্য সর্বত্র পুরাপুরি ও বিশদভাবে দেওয়া সম্ভব হয় নাই—বাচ্যের উল্লেখ বহুস্থলেই বর্জিত হইয়াছে, সমাসের উল্লেখও স্থানে স্থানে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

"সংস্কৃত প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ উহার অনুবন্ধবিহীন আসল রূপটুকু মাত্র দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে কয়েকটি বিভিন্ন প্রত্যয় সমরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে; যেমন—ঘঞ্, অল্ অচ্, অণ্, খচ্, খশ্, প্রভৃতি সবই অ-রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, ইন্ ণিন্ ঘিণুন্ প্রভৃতি সবই ইন্-রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহারা কোন সংস্কৃত শব্দ ঠিক কোন্ প্রত্যয়ের যোগে গঠিত হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে সংস্কৃত অভিধান দেখিতে হইবে।"

অভিধানের যে-সমস্ত সমাধান এই সমালোচক নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারে নি সে-সবের দু-একটা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। তন্ন তন্ন করে অভিধানের গুণাগুণ-বিচার সম্ভব হবে না।

১। উদ্, উৎ:

শব্দের ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়ে অভিধানে একটা উপসর্গের নাম দেওয়া হয়েছে 'উৎ'। 'উৎ' বলে কোন উপসর্গ পাণিনিতে আছে বলে জানি না। উপসর্গ 'উদ্'। এ বিষয়ে আমাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না দিয়ে পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয়

শব্দকোষ' থেকে কয়েকটা পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি। "'উৎ' 'উদ্‌' এই উপসর্গেরই সন্ধিগত আকৃতি, ভিন্ন উপসর্গ নহে (দ্র 'পা ১.৩.২৪, কাশিকা ; মুগ্ধবোধ ৪০৩, ৯০৬, ৯১২ সূত্র)। পাণিনীয় সূত্রে, অসন্ধিস্থলে, 'উদ্‌' উপসর্গেরই ভূরি প্রয়োগ আছে। ফলতঃ 'উৎ' ভিন্ন অব্যয় নহে, 'উদ্‌' উপসর্গেরই সন্ধিগত আকৃতি।"

এই প্রসঙ্গে জানাই, 'উপসর্গ' শব্দের ব্যাখ্যায় 'প্র পরা অপ সম্‌'-এর পরে 'ইত্যাদি' না বসিয়ে সবগুলি উপসর্গের নাম করলে গ্রন্থের দুটিমাত্র ছত্র বাড়ত, কিন্তু অভিধান সমধিক সমৃদ্ধ হত।

২। অণুচ্ছেদ, অনুচ্ছেদ :

শব্দটি সংস্কৃত অভিধানে নেই, কারণ অল্প দিন হল এই শব্দের জন্ম। ইংরেজী 'Paragraph' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ। অভিধানে মূর্ধন্য-ণ দিয়ে 'অণু' বানান করা হয়েছে। আমরাও এই বানানেরই পক্ষপাতী। তবে অভিধানে বলা হয়েছে দন্ত্য-ন বানান অশুদ্ধ। আমরা এতটা বলতে সাহস করি না। কারণ, দেখতে পাই দু-একজন বাদ দিলে লেখক মাত্রেই দন্ত্য-ন বানানে শব্দটি লিখে আসছেন। এমনকি অভিধানকার নিজেও তাঁর ভূমিকায় একাধিকবার 'অনুচ্ছেদ' লিখেছেন এবং এক সংস্করণে নয়, একাধিক সংস্করণে (চতুর্থ সংস্করণেও) দন্ত্য-ন দিয়েই 'অনুচ্ছেদ' ছাপা হয়েছে।

৩। অভ্যন্তরীণ, আভ্যন্তরীণ :

সংস্কৃত ব্যাকরণ মানলে দুটি শব্দই অচল। সংস্কৃত অভিধানে 'আভ্যন্তর' আছে, 'আভ্যন্তরিক' আছে।

৪। চলচ্ছক্তি :

তৃতীয় সংস্করণে ছিল—'চলচ্ছক্তি' শব্দ 'চলনশক্তি' শব্দের অশুদ্ধ রূপ। ঠিকই বলা হয়েছিল।

চতুর্থ সংস্করণে সংশোধন করা হল—চলচ্ছক্তি (সং চলৎ+শক্তি) চলনশক্তি শব্দের রূপভেদ।

আমাদের মতে এটি এক অবাঞ্ছিত 'সংস্কার'। 'চলচ্ছক্তি' মানে 'চলে যে শক্তি'। 'শক্তির চলা' আর 'চলার শক্তি' এক কথা নয়।

৫। চলমান :

চল্‌ ধাতু পরস্মৈপদী হলেও 'চলমান' শব্দটি অশুদ্ধ নয়। পাণিনি-সূত্রে আছে—শীল, বয়স ও শক্তি বোঝাতে যে-কোন ধাতুর উত্তর চানশ্‌ প্রত্যয় হয়।

'তাচ্ছীল্যবয়োবচনশক্তিষু চানশ্‌' (৩।২।১২৯)। মাঘের 'শিশুপালবধম্‌' কাব্যে প্রয়োগ আছে—

"করকুড্‌মলেন নিজমূরুমুরুতরনগাশ্মককশম্‌।

এস্তচপলচলমানজনশ্রুতভীমনাদময়মাহতোচ্চকৈঃ" ॥ (১৫।১০)।

৬। মোহ্যমান, মুহ্যমান :

'মোহ্যমান'—এই অদ্ভুত শব্দটি বোধ হয় আভিধানিক রাজশেখর বসু কিংবা তাঁর কোন পণ্ডিত বন্ধুর সৃষ্টি। সংস্কৃত অভিধানে 'মোহ্যমান' পাওয়া যায় না। 'চলন্তিকা' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন প্রচ্ছদপটেই বিজ্ঞাপন ছিল 'মুহ্যমান' অশুদ্ধ, শুদ্ধ শব্দ 'মোহ্যমান'।

মুহ্‌ ধাতু পরস্মৈপদী ঠিকই। শানচ্‌ হতে পারে না, শতৃ প্রত্যয়ে শুদ্ধ শব্দ পেতে হলে শব্দ হবে 'মুহ্যন্‌'। কিন্তু সংস্কৃত বা বাংলা সাহিত্যে "মুহ্যন্‌" অদ্যাবধি কেউ লেখেন নি। মুহ্‌ ধাতুকে ণিজন্ত করে 'মোহ্যমান' শব্দ সৃষ্টি করা যায় বটে, কিন্তু সে-শব্দের অর্থ হবে—অপর কর্তৃক মোহাচ্ছন্ন। মানুষ দুঃখে শোকে আপনা থেকেই মোহগ্রস্ত বা মুহ্যমান হয়, তবে hypnotist কর্তৃক মোহ্যমান হতে পারে বটে। এই শব্দ সম্পর্কে পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গীয় শব্দকোষে যা লিখেছেন, তুলে দিচ্ছি :

"মুহ্যমান বিণ ['মুহ্যন্‌' সাধু] (১) মোহপ্রাপ্ত। "মুণ্ডকোপনিষৎ ৩.১ (২) ঋগ্বেদ ১.১৬৪.২০, সায়ণ। মুহ্যমান প্রাণ কু. কে ৪০।২ [বাঙ্‌লায় ; অপ্র] মোহপ্রাপ্ত মূর্চ্ছিত। '(রাম) সীতা বলি হৈল মুহ্যমান ম পা. ১০২।'"

৭। প্রবহমান :

'প্রবহমান' শব্দ ব্যাকরণদুষ্ট। তৃতীয় সংস্করণে বলাও হয়েছিল শব্দটি অশুদ্ধ। চতুর্থ সংস্করণে তাকে জাতে তোলা হয়েছে। হঠাৎ কী ঘটল, জানি না। যাঁরা 'প্রবহমান'কে শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ মনে করছেন, তাঁরা কিন্তু ণত্ব-বিধি না মেনে 'মান'-এ দন্ত্য-ন লাগাচ্ছেন।

প্র-পূর্বক বহ্‌ ধাতু পরস্মৈপদী হয়, অতএব শানচ্‌ প্রত্যয় খাটে না (সূত্র-প্রাদ্বহঃ)। তবে যদি শীলার্থে আত্মনেপদ বিধান দেওয়া হয়, 'মান'-এর 'দন্ত্য-ন'কে 'মূর্ধন্য-ণ' করতে হবে।

৮। লক্ষ, লক্ষ্য :

এই অভিধানে 'লক্ষ' শব্দের একটিই অর্থ দেওয়া হয়েছে—১০০০০০ সংখ্যা।

'নজর, দৃষ্টি' প্রভৃতি নেই। 'লক্ষ করা' প্রয়োগও নেই, 'লক্ষ্য করা' প্রয়োগই দেখানো হয়েছে। তবে আধুনিক লেখকেরা 'লক্ষ করা' প্রয়োগই পছন্দ করেন। এবং সে-প্রয়োগ ব্যাকরণ-বিরোধী নয়।

৯। 'নিরুদ্বিগ্ন, নিরুদ্দিষ্ট, নিরবচ্ছিন্ন, নিরাসক্ত, নিরলস' প্রভৃতি সংস্কৃত-ব্যাকরণদুষ্ট কতকগুলি শব্দকে খাঁটি সংস্কৃত বলে এই অভিধান স্বীকার করেছে। তা যদি হয়, তাহলে অভিধান দেখে শব্দের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

১০। প্রত্যূষ, প্রত্যূষ :

'উষা, উষা' দুই বানানই যথাস্থানে দেওয়া আছে, কিন্তু অভিধানে 'প্রত্যূষ'কে স্বীকার করে 'প্রত্যূষ'কে 'বিরল' বলা হয়েছে।

এক সময়ে বাংলাভাষায় 'প্রত্যূষ' বিরল ছিল বটে, তখন 'উষা'-ও বিরল ছিল, এখন বাংলায় 'উষা, প্রত্যূষ, ঊষা, প্রত্যূষ' কোন শব্দই বিরল নয়। সব বানানই সংস্কৃত অভিধানে আছে। অমরকোষে 'প্রত্যূষ', মেদিনীকোষে 'প্রত্যূষ'।

১১। অভিধানের শব্দনির্বাচন প্রণালী ঠিক অনুধাবন করতে পারি নি। সাহিত্যে সাধু গদ্যেও প্রযুক্ত হয় এমন কিছু কিছু শব্দ, যথা—'অবিস্মরণীয়, অপূরণীয়, শিরোনাম, শীর্ষনাম,' অভিধানে খুঁজে পাওয়া গেল না। অথচ 'অনাছিষ্টি, অনাচ্ছিষ্টি, অনাটন, অবিশ্যি, অপুষ্যি, বিচ্ছিরি'—জাতীয় শত শত মৌখিক বিকৃতি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

মজার কথা কতকগুলি ইংরেজী শব্দ ধ্বনি সাদৃশ্যে সংস্কৃতর ছদ্মবেশে আধুনিক বাংলায় ঘোরাঘুরি করছে। অভিধানে এদের কোন-কোনটা কৌলীন্যের মর্যাদা পেয়েছে। কোন-কোনটা ভাগ্যদোষে অন্ত্যজ-ই থেকে গেল। দুটো উদাহরণ দিচ্ছি—

'আগ্রাসন—বি, বৈদেশিক রাজ্যকে গ্রাস বা আক্রমণ করার প্রবৃত্তি। তু. ইং aggression। [সং আ+√গ্রস্+ণিচ্+অন (ভা)]।'

'বি. অন্তরীণ (অশু.)—ঐরূপ আটক, বন্দী, internee।'

আর নয়। এইখানেই থামি। অভিধানের খুঁটিনাটি অনুসন্ধান শয্যাশায়ী অন্ধের কর্ম নয়। তাছাড়া পচন-ধরা অতিবৃদ্ধের সেকেলে বিদ্যায় আধুনিক অভিধানের সমালোচনা হয়তো অনধিকার-চর্চা।

সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান | চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮৪ সাহিত্য সংসদ্ | ৩২·৫০ টা

ভাষা-বিষয়বস্তু-গল্পরীতি
বাংলায় নতুন স্বরে কথা বলা
গল্পগ্রন্থ
হরিপদ পাত্র-র
মোহনায় সূর্য
॥ দশ টাকা ॥
বিশ্বজ্ঞান □ কলকাতা-নয় □

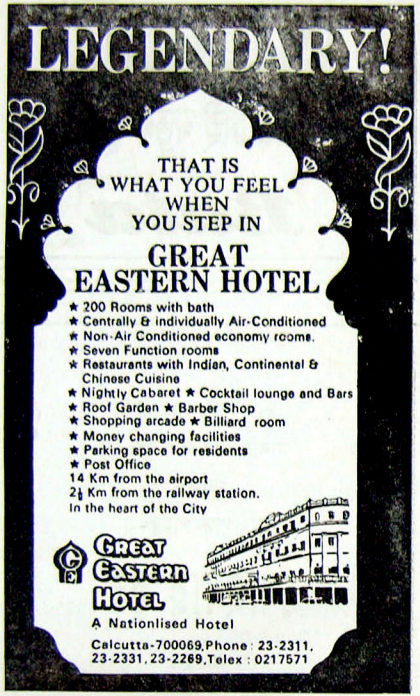

উষার দুয়ারে পাখির মতন

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' ১৫ জুলাই ১৯২৬ তারিখে উদ্ধৃত করেছিল ইটালির একটি পত্রিকার এইরকম একটা মন্তব্য :

When the unemployed hangers-on of certain so-called circles of culture decided to invite the celebrated Indian poet to tour our country we were not enthusiastic for the idea[১]

এই মন্তব্য বের হবার আগে ফর্মিকিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৭ জুলাই ১৯২৬-এর চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। তাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "একটা জাতির শক্তিবৃদ্ধির জন্য কোনো রাজনৈতিক দলের দ্বিধাশূন্য অপরাধের কর্মসূচী অনুমোদন করছি দেখানোটা আমার কাছে চরম বিরক্তিকর।"[২]

এই চিঠি প্রকাশের পর লোকে জানতে পারল, ফর্মিকি রবীন্দ্রনাথের ইটালি ভ্রমণের সময় যে দ্বিভাষীর কাজ করেছিলেন, সেটা উদ্দেশ্যপূর্ণ মিথ্যা-প্রচারে দুষ্ট ছিল। অতএব, এর পর থেকে ইটালির ফ্যাসিস্ট পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে উদ্গীরণ চলবে এবং তাতে সত্য-মিথ্যার কোনো বালাই থাকবে না।

সুতরাং ইটালির ওই পত্রিকায় যে বলা হলো, রবীন্দ্রনাথকে ইটালিতে নিমন্ত্রণ করেছিল কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংস্থা, সে তথ্যে আস্থা রাখা যাচ্ছে না।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বস্ত পত্রিকা 'মডার্ন রিভিউ' ১৯২৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় জানিয়েছিল এই তথ্য :

Benito Mussolini, the Premier-Dictator of Italy sent to India, along with Prof Carlo Formichi of Rome who came to India as a visiting professor of the Visva-Bharati, a valuable collection of Italian books as a present to the Visva-Bharati. He also sent another Italian scholar, Dr. Giuseppe Tucci, to help in the Visva-Bharati's work of building up a universal centre of learning and intellectual following. In May 1926, the authorities of the Visva-Bharati arranged for the Poet's visit to Italy to fulfil his promises to the Italian cities. The secretaries of the Visva-Bharati, Prof Prasanta Chandra Mahalanobis and Rathindranath Tagore found the Italian Government very willing to provide them with the greatest facilities in connection with Tagore's tour in Italy…When the Party reached Naples, His Excellency Benito Mussolini formally invited the poet to stay in Rome as the guest of the Italian Government and this invitation was accepted.

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ইটালি ভ্রমণের সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ইয়োরোপে, আর 'মডার্ন রিভিউ' সম্পাদনা করেন অশোক চট্টোপাধ্যায়, এবং তাঁর সম্পাদনা-কালে মডার্ন রিভিউ ও 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ইটালি-ভ্রমণবৃত্তান্ত রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভের কারণ হয়েছিল। সুতরাং মডার্ন রিভিউ বা প্রবাসীর বিবরণও প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা যায় না। প্রথমে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের ইটালি ভ্রমণের আয়োজন করে, নেপলস পৌঁছনোর পর মুসোলিনি আনুষ্ঠানিক নিমন্ত্রণ করেন, এটা সত্য কিনা বিচার করে দেখতে হবে।

নির্মলকুমারী (রানী) মহলানবিশ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ১৯২৬ ইটালি যাত্রার সঙ্গিনী। তিনিও নিশ্চিত নন, রবীন্দ্রনাথকে আনুষ্ঠানিকভাবে কে নিমন্ত্রণ করেছিলেন সে বিষয়ে। তবে পিছনে যে মুসোলিনি ছিলেন, সে বিষয়ে তাঁর সংশয় ছিল না। 'কবির সঙ্গে য়ুরোপে' গ্রন্থে তিনি প্রকাশ্য অভিযোগ করেছেন,

(১) ফর্মিকি আর তুচ্চি ছিলেন মুসোলিনির গুপ্তচর,

(২) মুসোলিনি ফর্মিকি আর তুচ্চিকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়েছিলেন ভারতবর্ষে ফ্যাসিজম প্রচারের জন্য,

(৩) শান্তিনিকেতনে গ্রন্থ উপহার, ইটালিতে রবীন্দ্রনাথকে এই আমন্ত্রণ সবই প্রচারের জন্য,

(৪) সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রশান্তচন্দ্র মহালনবিশ রবীন্দ্রনাথের ইটালি নিমন্ত্রণ সমর্থন করেননি,

(৫) কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থপ্রাপ্তিতে এবং দুই পণ্ডিতকে শান্তিনিকেতনে পেয়ে এত মুগ্ধ যে বিশ্বভারতীর কর্মসচিবদের সন্দেহ দেখে বিরক্ত,

(৬) রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনির আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু প্রশান্তচন্দ্র এই আতিথ্য নেননি, তিনি নিজের খরচে রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গ দিয়েছিলেন, রবীন্দ্র-নাথের ভ্রমণের সুবিধার্থে।

১৯৬৮ সাল থেকে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে রানী যখন তাঁর 'কবির সঙ্গে য়ুরোপে' লিখতে শুরু করেন, তখন প্রতিমা দেবী সানন্দে সেটা পড়ছেন এবং প্রশংসা করছেন। কিন্তু রানী লিখছেন ১৯৬৮ সালে, প্রায় চল্লিশ বৎসর পর যখন মুসোলিনি সম্পর্কে কারোরই কোনো সন্দেহ নেই। ১৯২৬ সালে তাঁর কি মুসোলিনি সম্পর্কে এমনই নির্মোহ দৃষ্টি ছিল, এই সংশয় থেকেই যায়। সংশয় থেকে যাওয়ার আরো কারণ থেকে গেছে।

রথীন্দ্রনাথ এবং প্রশান্তচন্দ্র ইটালি ভ্রমণের সময় প্রত্যেক সপ্তাহে ভ্রমণ বিবরণ পাঠাতেন বিশ্বভারতী বুলেটিনে ছাপানোর জন্য। বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লির সম্পাদক তখন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দুর্নিরীক্ষ্য কারণে সেইসব বিবরণ ছাপা হয়নি। রথীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র ফিরে এসে সেইসব টাইপ করা বিবরণ খুঁজেই পাননি। ১৯৪১ সালে রথীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর গুদামে সেই কাগজগুলো খুঁজে পান এবং প্রশান্তচন্দ্রকে পাঠিয়ে দেন। প্রশান্তচন্দ্র সেই কাগজের তাড়া আবার হারিয়ে ফেলেন, আবার খুঁজে পেয়ে ১৯৬৯ সালে জীবানন্দ সাহা বলে এক কর্মচারীকে দেন।[৩] সেই বিবরণ আজও অপ্রকাশিত। অতএব রথীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মুসোলিনি-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কী ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন, মুসোলিনি বিষয়ে কতটা নিঃসংশয়, রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনি বিষয়ে ঠিক কী বলেছিলেন, কবেই বা তাঁর মোহমুক্তি ঘটেছিল, আদৌ ঘটেছিল কিনা, তা বলা মুশকিল।

রানীও লিখছেন তাঁর সেই সময়ে ইয়োরোপ থেকে লেখা চিঠিপত্র অবলম্বন করে। কিন্তু চিঠিপত্র সংগ্রহ করেও তিনি বহুদিন বৃত্তান্তটি লিখতে পারেননি, কেননা বারেবারেই কে যেন তাঁর চিঠির তাড়াটি চুরি করেছিল। রবীন্দ্রনাথও জানতেন সে কথা। পরে প্রবাসী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ইটালি এবং ইয়োরোপ ভ্রমণবৃত্তান্ত কেউ না লেখায় ক্ষোভ প্রকাশ করলে (২৩ চৈত্র, ১৩৪৭ তারিখের

চিঠি) রানী আবার ব্রতী হলেন স্মৃতি থেকে বৃত্তান্তটি লিখতে। কিন্তু অসুস্থতা ও কর্মান্তরে ব্যস্ত থাকায় পারেননি। ১৯৪০ সালে তিনি তাড়াটি ফিরে পেলেন রহস্যজনকসূত্রে এবং দেখলেন ইটালি থেকে লেখা চিঠিগুলো উধাও হয়েছে। সেইসব চিঠি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তার কয়েকটিতে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ছিল, তাই সেগুলি চুরি করা হয়েছে বলে রানীর সন্দেহ। অন্য চিঠিগুলো অবলম্বন করে রানী লিখলেন তাঁর ভ্রমণকাহিনী।[৪]

রবীন্দ্রনাথের ইটালি ভ্রমণ সম্পর্কে আর একটি প্রামাণ্য সূত্র রম্যাঁ রলাঁর ভারতবর্ষ বিষয়ক ডায়েরি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডের ভিলন্যভ নামক স্থানে দিন কাটিয়েছিলেন ১৯২৬ সালের ২২ জুন থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত। এই সময়কার কথোপকথন রলাঁ তাঁর ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে সংবাদ নিয়েছেন, ইটালিতে কী হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে, সে বিষয়ে। রলাঁর তথ্য সম্পর্কে কেউ কোনো সন্দেহ প্রকাশ করেননি, কিন্তু তাঁর রবীন্দ্রবিশ্লেষণ অনেকেরই মনঃপূত হয়নি, বিশেষ করে ইটালি ও ইয়োরোপের অন্যান্য স্থান ভ্রমণ বিষয়ে রলাঁর উষ্মা অনেক রবীন্দ্রানুরাগীর ক্ষোভের কারণ হয়েছে। তাছাড়া রলাঁকে যাঁরা সংবাদ দিতেন, তাঁদের সংবাদের যাথার্থ্য সম্পর্কেও সন্দেহের কারণ থেকে গেছে। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক।

১৫ জুন ক্রোচে গোপনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্রোচের আলাপের বিষয় কী ছিল? রলাঁ, ২৪ জুন তারিখের ডায়েরিতে লিখেছেন প্রশান্তচন্দ্রের বর্ণনামতো ইটালি-বৃত্তান্ত। ৩০ জুন তারিখে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের মুখে শোনা বৃত্তান্ত। প্রশান্তচন্দ্র জানিয়েছেন, ক্রোচে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করেছেন শুধু আত্মাসংক্রান্ত বিষয়ে। তাঁর ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতা বিষয়ে ক্রোচে রবীন্দ্রনাথকে কিছুই বলেননি। ক্রোচে রবীন্দ্রনাথকে এতই সন্দেহ করেন যে ফ্যাসিজম আলোচনাতেই যাননি, এটা ভেবে রলাঁ দুঃখিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও রলাঁকে জানিয়ে ছিলেন কী বিচিত্র উপায়ে ক্রোচে গোপনে এসেছিলেন দেখা করতে। রানী মহলানবিশ কিন্তু তাঁর বর্ণনায় লিখছেন, "ক্রোচে ঘরে ঢুকেই জানালা দরজা বন্ধ করে দিলেন, খবরের কাগজে রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিজম প্রশংসা করছেন সেটা পড়ে ক্রোচে অবাক হচ্ছেন" রবীন্দ্রনাথকে জানালেন তিনি—রবীন্দ্রনাথ যা দেখছেন তা মোটেই সত্যি নয়। মনের সব স্বাধীনতাই কেড়ে নেওয়া হয়েছে, ইটালিতে ফ্যাসিজমের চূড়ান্ত

অত্যাচার চলেছে, ইত্যাদি। রানী জানিয়েছেন, পরের দিন ভোরবেলা রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁকে এবং তাঁদের সঙ্গীদের এই সব বলেছেন। রলাঁর ডায়েরি এবং রানীর ভ্রমণবৃত্তান্ত, এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত খবর দিচ্ছে, কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য?

অবশ্য কী বিচিত্র উপায়ে ক্রোচে-রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎ সম্ভব হয়েছিল, সে বিষয়ে রানী-রলাঁর বিবরণে কোনো বৈসাদৃশ্য নেই। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ক্রোচের সঙ্গে আলাপ করেন, কিন্তু ফর্মিকির সাহায্যে সেটা সম্ভবপর নয়, কেননা ক্রোচের রাজনীতি ফর্মিকির কাছে সন্দেহজনক। ক্রোচের এক ছাত্র, যিনি রাজবংশের এবং সৈন্যদলে আছেন, সেটা শুনে রবীন্দ্রনাথকে জানালেন, তিনি গোপনে ক্রোচেকে নিয়ে আসতে পারেন, তবে মুসোলিনিকে আগে জানাতে হবে। সেই পরামর্শ অনুযায়ী, রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনিকে জানালেন তাঁর ইচ্ছা। মুসোলিনি প্রকাশ্যে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন সাক্ষাৎকার সম্ভবপর করার জন্য, কিন্তু ফর্মিকি জানালেন ক্রোচে কোথায় তিনি জানেন না। ভোর রাত্রে সেই ক্যাপ্টেন রাপিকোভোলি ক্রোচেকে নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথের হোটেলে, যখন ফর্মিকি এসে পৌছননি। ফর্মিকি আসার আগে ক্রোচে বিদায় নিলেন।

ফ্যাসিজমের স্বরূপ উন্মোচন করার জন্য, ৩০ জুন রলাঁ রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন, আর কিছু বলার দরকার নেই, রবীন্দ্রনাথ যদি প্রকাশ্যে জানিয়ে দেন পৃথিবীর লোককে, কী উপায়ে তাঁকে ক্রোচের সঙ্গে দেখা করতে হয়েছে, তাহলেই ফ্যাসিজমের চরিত্র উদ্‌ঘাটিত হবে। রবীন্দ্রনাথ রাজি হননি, হয়ত রাপিকোভোলি বিপদগ্রস্ত হবেন এই ভয়ে।[৫]

রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিস্ট মুসোলিনির চরিত্র জানা সত্ত্বেও কেন তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে কেউ কেউ বলেছেন, ১৯২৬ সালে মুসোলিনির চরিত্র অনেকের জানা ছিল না, রবীন্দ্রনাথও না জেনে গ্রহণ করেছিলেন এই নিমন্ত্রণ। ব্যাখ্যাটি কি গ্রহণযোগ্য।

১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ ইটালি গিয়েছিলেন, আর্জেন্টিনা থেকে ফেরার পথে। অসুস্থতার জন্য তুরিন, ভেনিস, ফ্লোরেন্স এবং রোমে যেতে পারেননি বন্ধুদের আমন্ত্রণ সত্ত্বেও, শুধু মিলান হয়েই ফিরে এসেছিলেন। লেক কোমোর ধারে একটি সুন্দর বাড়ি তাঁর জন্য তাঁর বন্ধুরা ঠিক করে রেখেছেন যেখানে প্রত্যেক গ্রীষ্মে রবীন্দ্রনাথ এসে থাকতে পারেন। এই

কথা জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে ইণ্ডিয়ান ডেইলির সংবাদ-দাতাকে।[৩]

আর্জেন্টিনা যাওয়ার সময় রবীন্দ্রনাথ অবাক হয়েছিলেন, যখন জাহাজের যাত্রীদের অনেকে, রবীন্দ্রনাথ জাহাজে আছেন শুনে, স্প্যানিশ ভাষায় রবীন্দ্র-রচনার অনুবাদ নিয়ে এসেছিল স্বাক্ষর নেওয়ার জন্য। ইটালি গিয়েও তাঁর একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ফ্রি প্রেস অব ইণ্ডিয়ার সংবাদদাতাকে এই কথা বলে,[৪] রবীন্দ্রনাথ আরও জানালেন—

Italy holds a great fascination for me. I always remember the feel of a number of poets from other lands having made Italy their second home. I also wanted to join the list, as the poets that preceded me had done, and derive inspiration from Italy. I have how decided, health permitting, to go again to Italy and spend some months at some beautiful spot where I can rest in the inspiring beauty of natural scenery and come into touch with the living minds of the West.

ইটালি থাকার সময়েই ২৪ জানুয়ারি ১৯২৫ তিনি যে ইটালিয়া কবিতা লিখেছিলেন, তারও একই মর্ম। 'এখন শীতের দিন/কুয়াশায় ঢাকা আকাশ আমার, কানন কুসুমহীন।' ইটালিয়া কবিকে নিমন্ত্রণ করছেন আবার আসার জন্য। 'মধুর ফাগুন মাসে/কুসুম আসনে বসিব যখন ডেকে লব মোর পাশে।' বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলিতে (জুলাই ১৯২৫) রবীন্দ্রনাথ এই কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করলেন, শীতের ইটালি তাঁকে জানাচ্ছে,

In the sweet month of May
When I sit on my flower throne, I shall ask
thee to my side

সত্যসত্যই পরের মে-জুন মাসে রবীন্দ্রনাথ ইটালিতে কাটিয়েছিলেন, মুসোলিনির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে। হয়ত কবিতাটির শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনারত তুচ্চি মারফৎ অথবা ইটালিয়ান ভাষার তৎক্ষণাৎ অনূদিত হওয়ায় মুসোলিনি জানতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা।

২৪ জুন ১৯২৬ এর ডায়েরিতে কিন্তু রথী লিখেছেন অন্যকথা, যে কথা তাঁকে বলেছেন প্রশান্তচন্দ্র।

"রবীন্দ্রনাথ চমৎকারভাবে—(জঘন্যভাবে)—প্রতারিত হয়েছিলেন। ইতালিতে গত সফরের সময় (মিলান এবং জেনোয়ায়) তাঁর কাজ ছিল শুধু স্বাধীন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে। রাষ্ট্রের সঙ্গে কিছু ছিল না। ডিউক স্কোত্তির মতো তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুরা ছিলেন ফ্যাসিস্টবিরোধী এবং ভেনেতোর মতামতও ছিল তাই। ফ্যাসিস্ট সংবাদপত্রে খোলাখুলিভাবে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এক প্রতিকূল প্রবাহ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এবং মধ্য ইতালি ও রোমে তাঁর বক্তৃতা চালিয়ে যাওয়া বিচক্ষণের মতো হতো না। সেখানে অবশ্যই লজ্জাকর পরিস্থিতি এবং লাঞ্ছনার হাত এড়ানো যেত না"[৮]

ইটালিতে সে যাত্রায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ২১ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। মিলানে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি পড়েছিলেন 'People and Nation' সংবর্ধনা সভায় পরপর দুদিন পাঠ করেন 'The Voice of Humanity'। প্রথমটি প্রকাশিত হয় ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫), দ্বিতীয়টি বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলিতে (এপ্রিল ১৯২৫)। দুটোতেই তিনি আক্রমণ করেছিলেন সর্বগ্রাসী পাশ্চাত্য সভ্যতাকে।

ফরেয়ার্ড পত্রিকায় (জুলাই ২২, ১৯২৫) আমেরিকা প্রবাসী অধ্যাপক সুধীন্দ্র বোস রবীন্দ্রনাথের ইটালি ভ্রমণ বিষয়ে লিখে জানালেন, ইটালিতে রবীন্দ্রনাথের সম্যক সংবর্ধনা হয়নি, ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রতিকূলতার জন্য। ১৯২৫ আগস্ট সংখ্যায় মডার্ন রিভিউতে অশোক চট্টোপাধ্যায় এর প্রতিবাদ করেন। বেঙ্গলি পত্রিকার এক সাংবাদিক সুধীরকুমার লাহিড়ি সেই সময় ইটালিতে ছিলেন। তাঁর চাক্ষুষ সাক্ষ্যে মডার্ন রিভিউ জানাল, ইটালিতে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট সমাদর হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ কি তখন এই প্রতিকূলতার কিছুই টের পাননি? মুসোলিনির ফ্যাসিজম কি তাঁর একেবারেই অজানা ছিল? তা হলে ১৯২৬ সালে ইটালি সফরের পর তিনি কেন বলবেন[৯]

In India, the reports of fascist atrocities reached me from time to time and I had serious misgivings about coming back to Italy··· Professor Formichi and Dr. Tucci encouraged me to come to Italy but my misgiving were not dispelled and at one time I had practically decided to give up my projected tour in Italy. However I had my promise to fulfil. I also had a strong desire to meet and

spend a few days with Romain Rolland and this seemed the last chance of doing so.

প্রবাসী পত্রিকা পৌষ ১৩৩৩ সংখ্যায় জানিয়েছে :

"আশ্বিনের প্রবাসীতে রথীন্দ্রনাথের ইতালী ভ্রমণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ আমাদিগকে মৌখিক বলিয়াছেন যে, তাঁহারা কবির এইবার ইতালী যাত্রার বিরোধী ছিলেন। কবি স্বয়ংও আমাদিগকে মৌখিক এই কথা বলিয়াছেন।"

এই সংবাদ দেওয়ার কারণ, আশ্বিনের প্রবাসী অভিযোগ করেছিল, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের খবরাখবর না রাখতে পারেন, তিনি কবি, কিন্তু বিশ্বভারতীর কর্মসচিবদের জানা উচিত ছিল মুসোলিনি-চরিত্র। জেনেশুনেও তাঁরা রবীন্দ্রনাথের ইটালিযাত্রার বিরোধিতা করেননি কেন, আমন্ত্রণ গ্রহণ করে, আতিথ্যস্বীকার করে আমন্ত্রণকারীর নিন্দা ভদ্রতার পরিচয় নয়।

আশ্বিনের প্রবাসীর দুর্বিনীত ভাষা রবীন্দ্রনাথকে রুষ্ট করেছিল এবং সে কথা রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোপে ভ্রমণরত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে গোপন করেননি। সেই তীব্র ক্রোধের চিঠি 'কবির সঙ্গে য়ুরোপ' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। রামানন্দ কিন্তু লেখক অশোক চট্টোপাধ্যায়ের কোনো অন্যায় হয়েছে স্বীকার করেননি। প্রশান্তচন্দ্রকে তিনি বলেছিলেন ফ্যাক্টস্-এ ভুল থাকলে সেটা সংশোধিত হবে। আশ্বিনের সংবাদের সংশোধন পৌষ মাসে করা হল, শুধু বলা হলো প্রশান্তচন্দ্র এবং রথীন্দ্রনাথের কোনো দোষ হয়নি, তাঁরা শুরুতেই ইটালি-যাত্রার বিরোধী ছিলেন।

অশোক চট্টোপাধ্যায়ের মূল বক্তব্য ছিল, রবীন্দ্রনাথ ইটালির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে Compromise করেছেন। মুসোলিনির চিন্তাভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা কোনো সাদৃশ্য নেই। অতএব সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা তাঁর সঙ্গত হয়নি। আতিথ্যস্বীকার করার পর ফ্যাসিজমের নিন্দা করার অধিকার তাঁর নেই।

এছাড়াও যে প্রশ্নটি থেকেই যায়, সেটা হলো রবীন্দ্রনাথের ১৯২৫ সালে শান্তিনিকেতনে মুসোলিনির উপহার গ্রহণ। রলাঁর কাছে প্রশান্তচন্দ্রের সাক্ষ্য থেকে জানা যাচ্ছে, ১৯২৫ সালেই রবীন্দ্রনাথের ইটালি ভ্রমণের সময় ফ্যাসিস্ট প্রতিকূলতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলছেন, ১৯২৬ সালে ইটালি যাওয়ার আগেই তিনি ফ্যাসিস্ট বর্বরতার কথা শুনেছিলেন এবং ইটালি

যাবেন কি না মনস্থির করতে পারছিলেন না। যে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের তীব্র এবং নিরন্তর প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছেন, সাধারণ লোকের মনের উপর গান্ধী স্বৈরাচার করছেন, এই অভিযোগে, যে রবীন্দ্রনাথ চিন্তার স্বাধীনতার প্রবক্তা, সেই রবীন্দ্রনাথ চরম স্বৈরাচারী মুসোলিনির উপহার গ্রহণ করেছিলেন সজ্ঞানে, এটাই বিস্ময়ের ব্যাপার।

ফর্মিকি এবং তুচ্চি যে মুসোলিনির গুপ্তচর হয়ে এসেছিলেন, তার প্রমাণ, পাওয়া গেল, রবীন্দ্রনাথের মুসোলিনি-প্রত্যাখ্যানের (ফর্মিকিকে লেখা ৭ জুলাই ২১ জুলাই ১৯২৬ তারিখের চিঠি এবং অ্যাণ্ডরুজকে লেখা প্রকাশ্য চিঠি ২০ জুলাই ১৯২৬) পর ফার্মিকির দশা এবং তুচ্চির আচরণ। এবিষয়ে রলাঁর ডায়েরি উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্য দিচ্ছে। মাদলীন রলাঁ প্যারিসে আন্দ্রে কার্পেলের সঙ্গে দেখা করে রলাঁকে যে খবর দেন, সে বিষয়ে লিখে রলাঁ জানাচ্ছেন :

"ডিসেম্বর ১৯২৬ : রবীন্দ্রনাথের অস্বীকৃতি, ইউরোপীয় সংবাদপত্রগুলোয় তার ধ্বনিপ্রতিধ্বনি—তাঁর (ফর্মিকির) ম্যাকিয়াভেলীয় পরিকল্পনার সর্বনাশ ঘটিয়েছে; এবং সম্ভবত, তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে-সাফল্যের প্রত্যাশা করেছিল তারও সর্বনাশ ঘটিয়েছে। মুসোলিনির কাজে লাগার বদলে রবীন্দ্রনাথের সফর তার ক্ষতি করে ছেড়েছে। লোকে বলে, এতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। রথীন্দ্রনাথ ঠিক ক'রে ফেলেছেন, ভারতবর্ষে একবার ফিরলেই তিনি এই ব্যাপারটা নিয়ে লাগবেন। তিনি 'সেই অধ্যাপককে' জিজ্ঞেস করবেন: আপনি ফ্যাসিস্টবিরোধী, কি ফ্যাসিস্টবিরোধী নন? যদি হন' তাহলে কী করে ফ্যাসিস্ট সরকারের সরকারী দৌত্য গ্রহণ করতে পারলেন? যদি ফ্যাসিস্ট হন, এখানে আপনার স্থান নেই।"

রথীন্দ্রনাথকে কিছু করতে হয়নি, তুচ্চি নিজে থেকেই শান্তিনিকেতন ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং ভারতবর্ষের অন্যত্র চাকরি খুঁজছিলেন। ২০ অক্টোবর ১৯২৯ তারিখের রলাঁর ডায়েরি, মণিলাল প্যাটেলের সাক্ষ্য অনুযায়ী :

"ইউরোপ থেকে ফেরার পর হিমালয়ে প্রথমবার যখন অধ্যাপক তুচ্চির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, মণিলাল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন। (আগে দুজন বন্ধু ছিলেন।) তুচ্চি মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁকে নমস্কার করতে অস্বীকার করেছিলেন। তাছাড়াও, মণিলাল তুচ্চির সঙ্গে কাজ করেছেন, তাঁর জন্যে ইউরোপে সুপারিশপত্র দিতে অনুরোধ করায়, তুচ্চি তাঁকে বলেছিলেন, যদি

এখুনি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের ইস্কুল তিনি ছেড়ে দেন, শুধু তাহলেই তিনি সুপারিশ করবেন।"

১৯২৫ ফেব্রুয়ারিতে ইটালির প্রথম সফর শেষে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে আসেন। (মার্চ ১৯২৫) ফাল্গুন ১৩৩১ প্রবাসী জানায়, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সংবাদ নিয়েই বোধহয়,

"ইতালীর লোকেরা তাঁহাকে অসামান্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই। তাঁহারা বিশ্বভারতী লাইব্রেরীতে ইতালীর উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সমূহ উপহার দিবেন। এবং বিশ্বভারতীতে ইতালীয় ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দিবার জন্য একজন ইতালীয় অধ্যাপককে নিজব্যয়ে নিযুক্ত রাখিবেন।"

রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারততত্ত্বের অধ্যাপক ডক্টর কার্লো ফর্মিকি শান্তিনিকেতনে যোগ দেন ২০ নভেম্বর ১৯২৫।[১০] কিন্তু এর আগেই স্থির হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথ, প্রশান্তচন্দ্র, রানী ইটালি ভ্রমণে যাবেন ১লা আগস্ট ১৯২৫।[১১]

রানীও একথা লিখেছেন: ১৯২৫ সালের গ্রীষ্মকালে রবীন্দ্রনাথের য়ুরোপ যাবার কথা ছিল।[১২] লক্ষণীয়, শান্তিনিকেতন পত্রিকা লিখছে সমকালে 'ইটালি', রানী স্মৃতি-নির্ভর বৃত্তান্তে বলছেন ইয়োরোপ। মনে করা যেতে পারে, ইটালির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, কাব্য-ঐতিহ্য এবং ইয়োরোপের মনীষী-সংসর্গ, এই তিনের জন্যই রবীন্দ্রনাথ ইটালিভ্রমণ মনস্থ করেছেন। তখনও ফর্মিকি বা মুসোলিনির নিমন্ত্রণ আসেনি। অতএব, ফর্মিকি-তুচ্চি-ইটালির গ্রন্থপ্রাপ্তিতে কৃতজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, এটা ঠিক নয়। সেই গ্রীষ্মে অবশ্য যাত্রা ঘটেনি, রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতার জন্য।

ফর্মিকি আসেন ১৯২৫ নভেম্বরে, শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন ২৬ ফাল্গুন ১৩৩২ (মার্চ, ১৯২৬)।[১৩]

জুইসেপ্পে তুচ্চি ফর্মিকির সঙ্গে আসেননি, তবে এসেছেন ফর্মিকি আসার পর এক মাসের মধ্যেই।[১৪]

ফর্মিকি আর তুচ্চি কীভাবে রবীন্দ্রনাথের মনোহরণ করেছিলেন অনুমান করা যেতে পারে প্রবাসী পত্রিকার সংবাদবিবরণ থেকে।

চৈত্র ১৩৩২। অধ্যাপক ফর্মিকির বিদায় উপলক্ষ্যে অভ্যর্থনা।

····৫শে ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রা গৃহে তাঁহাকে বিদায় দান উপলক্ষ্যে একটি সুচিন্তিত, সুলিখিত ও সদ্ভাবপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। উত্তরে আচার্য ফর্মিকি সাশ্রুনেত্রে ও কম্পভারাক্রান্ত কণ্ঠে ভারতবর্ষের প্রতি, বিশ্ব-

ভারতীর প্রতি, এবং কবির প্রতি নিজের শ্রদ্ধা ও প্রীতি, জ্ঞাপন করেন। তাঁহাকে বিশ্বভারতী ও কবি যে প্রীতি ও সম্মান দেখাইয়াছেন এবং কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বর্গগতা জননী শুনুন ও তাঁহাকে আশীর্বাদ করুন। ইহা বলিতে গিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া যায়। ভাবাবেগ সংবরণ করিয়া তিনি কিছুক্ষণ পরে তবে নিজের বক্তব্য শেষ করিতে সমর্থ হন। তাঁহার মাতৃভক্তি সমবেত বাঙালী পুরুষ ও মহিলাদের মর্মস্পর্শ করিয়াছিল। অতঃপর কবি তাঁহাকে নিজের গ্রন্থ ও অন্যান্য দ্রব্য উপহার দেন।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩। রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব।

···ইতালীর বাণিজ্যদূতকে কিছু বলিতে আহ্বান করেন।···তিনি যাহা বলিলেন তাহার সময়োপযোগিতা ও আন্তরিকতা মর্মস্পর্শী হইয়াছিল। ইতালীর কন্সাল মহাশয় ইতালীতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা আছে তাহা বলিলেন। নিজের হৃদয়ের ভাবও প্রকাশ করিলেন। ইতালীর লোকেরা কিরূপ আগ্রহের সহিত তাঁহার পুনরাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাহা বলিলেন। তাহার পর তাঁহার পত্নী ইতালীয় প্রথায় নতজানু হইয়া রবীন্দ্রনাথকে অভিবাদনপূর্ব্বক একটি সুন্দর পুষ্পপাত্রে পুষ্পোপহার দিলেন।···ইতালীয় ভাষার অধ্যাপক ইতালীবাসী অধ্যাপক টুচ্চী অতঃপর ভাবাবেগপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা করিলেন এবং ইতালীয় প্রথায় নতদেহে তাঁহার হস্তচুম্বন করিলেন।

রানীও লিখেছেন, এবিষয়ে। "প্রফেসর টুচ্চির অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং অসামান্য প্রতিভা,—অদ্ভুত ক্ষমতা নতুন ভাষা শিখবার।···খুব অল্পদিনের মধ্যে টুচ্চি বাংলা ভাষাও এমন আয়ত্ত করে নিলেন যে রবীন্দ্রনাথের লিপিকা বইখানা বাংলা থেকে ইটালিয়ান ভাষায় তর্জমা করা হয়ে গেল। একজন বিদেশীর পক্ষ ও বই-এর রসাস্বাদন করতে পারা তো সমান্য প্রতিভার কথা নয়। এতেও কবির মন ওঁরা মুগ্ধ করতে পারবেন না কেন?"[১৫]

ফাসিস্ট সরকারের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ আসছে, এ বিষয়ে নানারকম অস্বচ্ছতা থাকাই সম্ভব। রথীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর পিতৃস্মৃতিতে লিখছেন, নিঃসঙ্কোচ ভাষায়,

The visit to Italy in 1926 on the invitation of Mussolini gave rise to much misunderstanding both in India and other countries.[১৬]

এই লেখার সাত বছর পরে লেখা রানী কিন্তু অতটা নিঃসন্দেহ নন।

"গ্রামের ছুটির কিছুদিন আগে শুনলাম, ইটালী থেকে কবির নিমন্ত্রণ এসেছে,—রোম বিশ্ববিদ্যালয় কি মুসোলিনীর আহ্বান তা জানি নে। তবে তিনি যে ইটালীর আতিথ্যেই যাচ্ছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কারণ শুনলাম লয়েড্ ট্রিস্টিনো জাহাজে কবিকে সঙ্গীসাথীসহ তাদেরই খরচে তারা নিয়ে যাবে।"[১৫]

লয়েড ট্রিস্টিনো সরকারি জাহাজ, তাছাড়া রবীন্দ্রনাথকে বলা হয়েছিল যত খুশি সঙ্গী তিনি নিতে পারেন। অতএব, নিমন্ত্রণ যে সরকারি সে বিষয়ে, আনুষ্ঠানিক নিমন্ত্রণ না হলেও, কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

ইটালিতে রবীন্দ্রনাথের সফরসূচী হয়েছিল এইরকম :

মে ৩০। নেপলসে পদার্পণ ও মুসোলিনির উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের স্বাগত অভ্যর্থনা। রেলযোগে রোম ও গ্র্যাণ্ড হোটেলে অবস্থান।

মে ৩১। মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ।

জুন ১। ফ্যাসিস্ট মুখপত্র 'ট্রিবিউনা'র সংবাদদাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ।

জুন ৩। La Voce Republican পত্রিকার সংবাদদাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ।

জুন ৭। রোমের গভর্ণরের আহ্বানে কবি সংবর্ধনা।

জুন ৮। Unione' Intellectuale Italion সমিতির উদ্যোগে সভা। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা Meaning of Art। শ্রোতাদের মধ্যে মুসোলিনি।

জুন ৯। Orti de Pace বিদ্যালয় দর্শন।

জুন ১০। কলোসিয়ামে বিশাল সংবর্ধনা।

জুন ১১। রাজা ভিকটর ইমানুয়েলের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

জুন ১৩। মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ। চিত্রা নাটকের অভিনয়।

জুন ১৫। ক্রোচের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ফ্লোরেন্স যাত্রা।

জুন ১৬। লেওনার্দো দা ভিঞ্চি সোসাইটির, ফ্লোরেন্স, সংবর্ধনা।

জুন ১৭। ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা : My School। Pitti এবং Uffizi গ্যালারি দর্শন।

জুন ১৮। তুরিন যাত্রা। মিলান স্টেশনে ডিউক স্কোটির (ফর্মিকির ইচ্ছার বিরুদ্ধে) সঙ্গে সাক্ষাৎ। তুরিন স্টেশনে অভ্যর্থনা।

জুন ১৯। Societa Pro Culture Femminele—মহিলা সমিতির বক্তৃতাভবনের উদ্বোধন। রাজার বোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

জুন ২০। মহিলা সমিতির দ্বিতীয় সভা। বক্তৃতা : City and Village দুটো বাংলা কবিতা আবৃত্তি। তিনটি রবীন্দ্রসংগীত.ইটালিয়ান ভাষায় শ্রবণ।

জুন ২২। টুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘরোয়া অভ্যর্থনা। কলা বিভাগের পনসিগলিও হলে অনুষ্ঠান।

১৯২৫ সালে ইটালি থেকে ফিরে ইণ্ডিয়ান ডেইলির সংবাদদাতাদের রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বন্ধুদের' আমন্ত্রণসত্ত্বেও তিনি তুরিন, ভেনিস, ফ্লোরেন্স, এবং রোমে যেতে পারেননি, এবং ১৯২৬ সালে ইটালি যাত্রার যে কারণ রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন, তা হলো ইটালির সেই 'people'দের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৯২৫ সালে যাঁরা আহ্বান করেছিলেন, ১৯২৬-এর সফরে দেখা গেল তাদের মধ্যে আছেন কেবল তুরিনেরম হিলাসমিতিটি। পুরনো বন্ধুদের মধ্যে দেখা হয়েছে শুধু ডিউক স্কোটির সঙ্গে, মিলানের প্ল্যাটফর্মে। আর living minds of the West-এর মধ্যে আছেন শুধু ক্রোচে। ক্রোচের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারটাও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কৌতূহলে নয়। রথীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন :

Mrs (Vaughan) Moody suggested one day that father should not leave the city without meeting the philosopher Benedetto Croce. Father, of course, had been wanting to meet him but did not know exactly how to bring it about not having any previous acquaintance with him nor knowing where he lived.[১৭]

জুন ২২ থেকে জুলাই ৪ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ভিলন্যভে ছিলেন রলাঁর সঙ্গে। এই পক্ষকাল, প্রশান্তচন্দ্র ও রথীন্দ্রনাথ ইঙ্গিতে এবং রলাঁ প্রকাশ্যে অনুরোধ করে চলেছেন, রবীন্দ্রনাথ যেন মুসোলিনির আসল চরিত্র উদ্ঘাটন করেন প্রকাশ্যে। রলাঁ, জুয়ামেল, রনিগার-এর পীড়াপীড়িতে রবীন্দ্রনাথ নিমরাজিও হয়েছিলেন, কিন্তু ফ্যাসিজম বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধটি পড়ে রলাঁরা খুশি হননি, প্রবন্ধটির মৃদুতা, অস্বচ্ছতা, দ্ব্যর্থতার জন্য। তখন রলাঁ আয়োজন করলেন কয়েকটি সাক্ষাৎকারের, ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের বলি কিছু লোকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের। এমনই একজন ছিলেন অধ্যাপক সালভাদোরির স্ত্রী। ৬ জুলাই জুরিখে তাঁর সঙ্গে দেখা হবার পর রবীন্দ্রনাথের মনে হলো, মুসোলিনির নিমন্ত্রণ-গ্রহণ তাঁর ঠিক হয়নি। কিন্তু মাদাম সালভাদোরিকে কৈফিয়ৎ দেবার সময়ও রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় নিচ্ছেন তাঁর পুরনো অজুহাতের :

Let me tell you why I came to Italy this time. As you know I had been invited by your people in Milan last year, I was strongly moved when I found that the people loved me and wanted me to be with them for some time. I fell ill, however, and had to return to India before fulfilling my engagements in other towns. I promised to come back in the following summer.[১৮]

Your people দের মধ্যে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে শুধু তুরিনের মহিলা সমিতির। ভেনিসে তিনি এবার যাননি, মিলানেও না, রোমে কেবল মুসোলিনি-ভক্তদের সঙ্গে দেখা করেছেন। ফ্লোরেন্সে তাঁর নিমন্ত্রণ এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে।[১৯]

সালভাদোরির সঙ্গে সাক্ষাৎই রবীন্দ্রনাথের মুসোলিনি বিষয়ে মোহভঙ্গের কারণ, পরের দিন ৭ জুলাই তিনি লিখবেন ফর্মিকিকে আক্রমণ করে চিঠি। রলাঁকেও এই সাক্ষাতের বিষয় জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, ১৫ জুলাই ব্রিস্টল হোটেল থেকে :

"জুরিখে শ্রীমতী সালভাদোরির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তার ফলাফল পরে দেখবেন। ইতালিতে আমি নিজেকে অশুচি হতে দিয়েছি, তার শুদ্ধির অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমাকে যেতে হবে।"[২০]

এখনও কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আঁকড়ে আছেন তাঁর পুরোনো কৈফিয়ৎটি। প্রশান্তচন্দ্র লিখছেনর লাঁকে এই একই বিষয়ে :

"শ্রীমতী সালভাদোরির সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকেই তিনি অত্যন্ত বিচলিত মানসিক অবস্থায় আছেন এবং আমি জানি যে, তাঁর মনোভাবের যথাযোগ্য প্রকাশ যতক্ষণ না ঘটাতে পারবেন তাঁর এই অবস্থা কাটবে না। ভিলন্যভে তিনি এই প্রশ্নের ব্যক্তিগত চেহারার সঙ্গে মুখোমুখি হননি ; এবং স্বাভাবিক-ভাবেই, তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী, তিনি একে দেখেছেন বিচ্ছিন্ন ও বুদ্ধিগত দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু শ্রীমতী সালভাদোরির সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকে তিনি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছেন। এখন তিনি সোজাসুজি অনুভব করতে পারেন, শুধুমাত্র বুদ্ধিগতভাবে আর নয়। ইতালিতে যাওয়ার জন্যে চরম ক্ষুব্ধ ; কিন্তু তিনি বলেন যে, তাঁর অন্য কোন উপায় ছিল না, কারণ তাঁকে ইউরোপে আসতে হবে আপনার সঙ্গে দেখা করতে। আর ইতালি না হয়ে তিনি আসতে

পারতেন না। ইতালীয়দের কাছে তাঁর গত বছরের প্রতিশ্রুতির জন্যে তিনি একেবারে ইতালিকে বাদ দিতে পারেননি।"[২১]

২১ জুলাই ১৯২৬ রবীন্দ্রনাথ সি এফ অ্যাণ্ডরুজকে লিখলেন প্রকাশ্য চিঠি, ফ্যাসিজম্‌কে ধিক্কার জানিয়ে। সেই চিঠি প্রকাশিত হলো ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে ৬ আগস্ট। অ্যাণ্ডরুজকে লেখা চিঠির প্রতিলিপি পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ফর্মিকিকে দ্বিতীয় চিঠি ; তাতেই দেখা গেল ১৯২৫ সালে ইটালির ফ্যাসিস্ট পত্রিকাগুলোতে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করা চিঠি তিনি ১৯২৫ সালেই পড়েছিলেন :

"ইতালি থেকে ফেরার পর গত বছর ভারতবর্ষে সংবাদপত্রগুলোয় যে বিবরণ বেরিয়েছিল, তার মধ্যে ছিল মানবিক আদর্শগুলোর জন্য আমাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা ইতালীয় সংবাদপত্রগুলোর উদ্ধৃতাংশ। আমি নিশ্চিত যে ফ্যাসিবাদের পক্ষ সমর্থন করা আমার পক্ষে এক ধরনের নৈতিক আত্মহত্যা।"[২২]

ফরোয়ার্ড পত্রিকায় সুধীন্দ্র বোস যে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের কথা বলেছিলেন, সেটা দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের চোখেও পড়েছিল। এবং ১৯২৬ সালে ইটালি সফর করার আগে তাঁর যে serious misgivings ছিল, সেটা তাহলে এই ফ্যাসিজম-আশঙ্কাই।

তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ যে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন, তার একটা কারণ বিশ্বভারতী। ফর্মিকিকে দ্বিতীয় চিঠিতে তিনি লিখছেন : "আমি আবার কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হচ্ছি, কারণ শুধু ইউরোপেই নয়, ভারতবর্ষেও জনরব উঠেছে যে আমি ফ্যাসিবাদী মত সমর্থন করেছি এবং ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে তার পক্ষ সমর্থনের ব্রত নিয়েছি।...আমার মতামত আপনাকে আঘাত করবে... এতে ইতালিতে আমাদের বিশ্বভারতীর স্বার্থের হানি হবে,—সেটা আমার কাছে অতি বড়ো দুঃখের ব্যাপার। কিন্তু তবু আমি যা করেছি, তা করা থেকে নিবৃত্ত হতে পারি না।"

যে বিশ্বভারতীর আদর্শ মুসোলিনির আদর্শ থেকে বিপরীত মেরুতে, সেই বিশ্বভারতীর জন্য রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন, সেটা কারোর কাছেই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত অনুরাগী আঁদ্রে কার্পেলে মাদলীন রলাঁকে জানিয়েছিলেন, ডিসেম্বর ১৯২৬, "রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফরের পরিকল্পনায় তিনি (রথীন্দ্রনাথ) ও তাঁর স্ত্রী অস্বস্তি বোধ করেছিলেন ; ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁকে হুঁসিয়ার করে দেবার চেষ্টাও

করেছিলেন ; কিন্তু সফরে ইচ্ছুক কবি ঝুঁকেছিলেন সবকিছুর আগে তাঁর বয়স্ক-শিশুসুলভ কৌতূহল মেটাতে তিনি কিছুই শুনতে চাননি এবং এইসব মন্তব্যকে বিদ্বিষ্ট ও অযৌক্তিক এবং নৈরাশ্যবাদের ফল ব'লেই গণ্য করেছিলেন।"[২৩]

রলাঁরও সেরকম ধারণা। কার্পেলের কথা শুনে এবং ফাসিস্ট হাঙ্গারির নিমন্ত্রণ রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন শুনে রলাঁর মন্তব্য :

"সমস্ত ইউরোপ সফর করার লোলুপ ও শিশুসুলভ বাসনায়, আর টাকা না-থাকায় রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতার জন্যে এক ইম্প্রেসারিওর হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছেন। এবং সেখানে ধনী ও স্নবদেরই প্রবেশাধিকার।—এইভাবে সর্বত্র তিনি এক তিক্ত হতাশা সৃষ্টি হতে দিয়েছেন। আর সবচেয়ে উদাসীন মানুষ হয়েও তিনি ধারণা জন্মিয়েছেন,—অহমিকার জন্যে, টাকার জন্যে তিনি সর্বত্র নিজেকে দেখিয়ে বেড়ান।"

এমন একটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, মুসোলিনি নিমন্ত্রণ করেছেন শুনলে রবীন্দ্রনাথ ইটালি-ভ্রমণের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন না। এরকম ব্যাখ্যার যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। মুসোলিনি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের হীন ধারণা ছিল না, ইটালি ভ্রমণের আগে বা পরে। ১৯২৫ সালে ভ্রমণের সময়ে তাঁর জাতীয়তাবাদ-বিরোধী দর্শনের জন্য ফ্যাসিস্ট পত্রিকাগুলো আক্রমণ করেছিল, তার তীব্রতা তিনি জানতেন, একথা তিনি ফর্মিকিকে লিখেছিলেন। সরকারি জাহাজে, সদলবলে, নেপলস যাত্রার সময়েই তাঁর বোঝার কারণ ছিল, নিমন্ত্রণটা সরকারি। সেই বিখ্যাত Babu changes his mind ঘটনাটি এবার ঘটেনি বরং ফ্যাসিজমের ইতিবাচক দিকটি দেখতেই তিনি উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

২১ শে জুলাই ১৯২৬ এর বিখ্যাত ফ্যাসিস্টবিরোধী চিঠিতে তিনি লিখেছেন :

Knowing all this, could I be credited with having played my fiddle while an unholy fire was being fed with human sacrifice ?[২৪]

ইটালি সফরের সময় এই নরবলির কোনো চিহ্ন তাঁকে দেখানো হয়নি সুতরাং রলাঁর কথামতো তিনি ফ্যাসিজমকে স্পষ্ট ধিক্কার দিতে রাজি হননি।

৬ জুলাই ১৯২৬ মাদাম সালভাদোরিকে তিনি বোঝাতে চান :

"I did not support fascism, though I did express my admiration for Mussolini as possessing the personality which alone can effect the miracles of creation in human history . I was careful to make this distinction. About fascism the only thing of which I was assured by almost everyone I met was that it had saved Italy from economic ruin." [২৪]

রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাখ্যায় তাঁর দীর্ঘ জীবনের জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, গান্ধীবাদ, অসহযোগিতা, সব রাজনৈতিক দর্শনের বিপরীত মেরুতে চলে গেছেন।

মাদাম সালভাদোরির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ জানালেন:

"I wish I had known for certain the dark deeds that were being done in Italy, then I would not have come to that country—I certainly would not . I had not met any of the people who suffered . But now that I have seen you I realise my own responsibility"[২৫]

ফ্যাসিজমকে ধিক্কার দেওয়ার জন্য এই চাক্ষুষ প্রমাণের দরকার ছিল ? অনেকের মনে হয়েছিল, ছিল, যেমন এলমহার্স্টের।

"...as poet and artist he felt entitled to make so as to come to his own conclusion about his notable contemporaries without having to accept at second hand everybody else's summing up"[২৫]

কথাটি রবীন্দ্রনাথের ইটালি-ভ্রমণ প্রসঙ্গে বলা। এই ভ্রমণ সময়ে এলমহার্স্ট ফর্মিকির কাছে অপমানিত হয়েছিলেন, নেপলসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে। রবীন্দ্রনাথের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ ট্রেনে তিনি উঠতে গেলে, ফর্মিকি তাঁকে হাত নেড়ে নেমে যেতে বলেন। ফলে এলমহার্স্ট তিন চার দিন পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ ছেড়ে ইংল্যাণ্ড ফিরে যান। এলমহার্স্টের অপমান সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের কোনো ভাববিকার ঘটেনি, ফ্যাসিজম সম্পর্কে কোনো সন্দেহের জন্ম হয়নি এবং ইটালি-ভ্রমণ ত্যাগ করেননি—এর ফলে রবীন্দ্রনাথের ইটালি-ভ্রমণ সম্পর্কে এলমহার্স্টের কোনো সহানুভূতি থাকার নয়। তবু সেই এলমহার্স্টই রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন করছেন, রবীন্দ্রনাথ অন্যের মুখে ঝাল না খেয়ে নিজের চোখে ফ্যাসিজম দেখতে চেয়ে কোনো অন্যায় করেননি।

তবে প্রশ্ন থেকে যায়—রবীন্দ্রনাথ কি ফ্যাসিজমের চেহারা দেখেননি ? তবে রলাঁর কাছে এলমহার্স্ট ১৯২৫ ইটালি-সফরের যে বিবরণ দিয়েছিলেন,

সেটার মর্ম কী? সেই সফরের সঙ্গী ছিলেন এলমহার্স্ট। ইটালি থেকে সুইজারল্যাণ্ডে আসবেন, রবীন্দ্রনাথ রলাঁর সঙ্গে থাকবেন, এই রকম কথা ছিল। কিন্তু মিলান থেকে রবীন্দ্রনাথ জানালেন তাঁর অসুখ হয়েছে এবং ভ্রমণসূচী বাতিল করে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে যাচ্ছেন। চিঠি ছাড়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর তখনকার সেক্রেটারি এলমহার্স্টকে পাঠালেন রলাঁর কাছে, সুইজারল্যাণ্ড না আসার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে। ১৯ জানুয়ারি ১৯২৫ রলাঁর ডায়েরিতে দেখা যাচ্ছে এলমহার্স্ট তাঁকে বলেছেন:

"ল্য হাভর্ ও বুয়েনোস-এয়ারসের মধ্যে জাহাজে এক রাতে অকারণে এক বিক্ষুব্ধ ও প্রচণ্ড ভাবের শক্তির তাঁর উপর ভর করেছিল। তার ঘোরে তাঁকে কবিতা লিখতেই হয়েছিল। যার কোনো ব্যাখ্যাই নিজের কাছে করতে পারেননি। বুয়েনোস-এয়ারসে পৌঁছে—সেখানে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিছানা নিয়েছিলেন—তিনি কিছুকাল পরে ভারতবর্ষের সংবাদ পেয়েছিলেন। যা তাঁকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল (—বাংলাদেশে নতুন করে গ্রেপ্তার)। তখন তিনি বিশ্বাস করলেন, তিনি এর পূর্বাভাষ পেয়েছিলেন। জাহাজে কোন্ তারিখে তাঁর এই অনন্যসাধারণ ভরটি ঘটেছিল তা খুঁজে বার করলেন। ভারতবর্ষের ঘটনাবলীর সেই একই তারিখ।—রবীন্দ্রনাথ বলেন, টেলিপ্যাথির এই রকম অস্বাভাবিক ব্যাপার তাঁর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে দেখা দিয়েছে। এলমহার্স্ট আরও বললেন, এ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত যে আর্জেন্টিনায় তাঁর অসুস্থতা এবং ইতালিতে হঠাৎ আবার তা শুরু হওয়ার কারণ ছিল আভ্যন্তর বিপর্যয়, যা তাঁর দেহযন্ত্রে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। দ্বিতীয়বারে করেছিল আতঙ্ক, যা ঘটিয়েছিল ফ্যাসিবাদ।"[২৬]

এলমহার্স্ট তাহলে স্বীকার করছেন, ১৯২৫ সফরেই ফ্যাসিবাদের চেহারা দেখে রবীন্দ্রনাথের আতঙ্ক হয়েছিল। তাহলে পরে তিনি কেন বলছেন রবীন্দ্রনাথ নিজের চোখে ফ্যাসিবাদ দেখতে চেয়েছেন ১৯২৬ সালে—সেটা বোঝা গেল না, স্মৃতি লোপ ছাড়া যার অন্য কোনো ব্যাখ্যা হয় না।

তবে ফ্যাসিবাদ লক্ষ্য করলেও রবীন্দ্রনাথ যে বিশেষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিলেন, মনে হয় না। অসুখের মধ্যে সুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণসূচী বাতিল করে দিলেও, ২৫ জানুয়ারি ১৯২৫, ভারতবর্ষে ফেরার জন্য জাহাজে ওঠার সাতদিন আগে, ইটালিয়া কবিতা নিয়ে ইটালি পুনরাগমনের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করলেন; এবার তিনি—

এসেছি শুনিয়া তাই,
উষার দুয়ারে পাখির মতন গান গেয়ে চলে যাই।

১৯২৬ সালে যখন তিনি সফর করছেন, তখনও তিনি উষার দুয়ারে পাখির মতন গান গেয়ে চলেছেন। ৩০মে নেপলসে ফর্মিকির হাতে এলমহার্স্টের লাঞ্ছনা, ১৫ জুন ক্রোচের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করার জন্য বিচিত্র উপায়, ১৮ জুন ডিউক স্কোটির ফ্যাসিজম-ভীতি, ১৯ জুন ইটালির রাজার বোনের ফ্যাসিজম-ভীতি, জুন ২৪ থেকে জুলাই ৪ পর্যন্ত রলাঁর ক্রমাগত প্রার্থনা কিছুই তাঁকে মুসোলিনি-প্রীতি থেকে আদৌ টলাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ৬ জুলাই মাদাম সালভাদোরির কাছে কৈফিয়তে তিনি ফ্যাসিজম এবং মুসোলিনি এই দুয়ের মধ্যে একটা ভেদরেখা টানলেন, ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে আপত্তি জানালেন কিন্তু মুসোলিনি বিষয়ে নয়। ২১ জুলাই অ্যাণ্ডরুজকে প্রকাশ্য চিঠিতেও মুসোলিনি-প্রশস্তি থেকেই গেল। ৫ আগস্ট ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানের সাংবাদিকদের কাছেও তাঁর neutral থাকার ইচ্ছা। তখনও তাঁর বক্তব্য, ইটালিতে তিনি খারাপ কিছু দেখেননি।[২৭]

২১ নভেম্বর ১৯২৫ ফর্মিকির মারফৎ মুসোলিনির বই উপহার পেয়ে তিনি মুসোলিনিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন a spirit of magnanimity worthy of the tradition of your great country দেখানোর জন্য।[২৮]

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৫ তিনি রলাঁকে লিখেছিলেন, অসহযোগের ভারতবর্ষ তাঁর মনের উপর একটা অসহ্য মানসিক উত্তেজনা চাপিয়ে দিয়েছে, তিনি ভারতবর্ষ থেকে পালাতে পারলে বাঁচেন।[২৯]

৩১ মে ১৯২৬ মুসোলিনিকে দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হলেন। তাঁর মাথা আর কপালের গড়ন, সুন্দর মুখ, মানবিক হাসির কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন রলাঁকে ২৪ জুন।

১৩ জুন সাক্ষাৎকারের সময় রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনিকে জানালেন:

You know you are the most misrepresented person in the world. I also come with grave doubts and misgivings but I am glad to have met you, for it has cleared many misunderstandings···

I see signs of this masterful vision in Italy. We are waiting for this freedom of the spirit without which all discipline is meaningless.[৩০]

ফমিকির ভাষ্য নয়, প্রশান্ত মহলানবিশেরই প্রতিবেদন ছিল এরকম :

২৪ জুন রবীন্দ্রনাথ রলাঁকে ফ্যাসিজমের উপকারিতা বোঝাতে গেলেন :

"ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক আলাপ ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপগামী জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। তারপর ইতালীতে থাকার সময় বন্ধুদের অথবা সব ধরনের ব্যক্তিদের সঙ্গে। সকলেই ফ্যাসিবাদের গুণগান করেছেন, বলেছেন, এটা প্রয়োজন, এর অবশ্যম্ভাবী এবং পরিত্রাতার চরিত্রটি ভালো করে সমর্থনের জন্য নিজেদের হেয় করেছেন। গোটা ইতালিকে হেয় দেখিয়েছেন; তাঁরা বলেছেন, ইতালি নিজেকে শাসন করতে, কর্তৃত্ব বজায় রাখতে, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করতে অক্ষম। তখন রবীন্দ্রনাথ (তার মধ্যে যা দেখে অবাক হয়ে গেলাম) লেগে গেলেন ফ্যাসিবাদের ন্যায্যতা প্রতিপাদনের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে : যদি কোনো জাতি প্রকৃতই নিজেকে চালাতে অক্ষম হয়, অরাজকতায় এবং নিষ্ফল হিংসায় যদি সেই জাতির তলিয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য সাময়িকভাবে বিশেষ বিশেষ স্বাধীনতাকে দমনকারী এক অনমনীয় কর্তৃত্বের প্রয়োজন তাকে মানতেই হয়।"

রবীন্দ্রনাথের এই ফ্যাসিস্ট তত্ত্ব রলাঁর কাছে অসহ্য মনে হলো, তিনি জানালেন,

"মিলানের তরুণ ছাত্রদের কথা, যাদের শিক্ষকেরা ত্যাগ করেছে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে,—লিবারেল উমবের্তো জানোত্তি-বিয়াংকোর কথা, অসম্মানিত বিবেক, লজ্জায় ও নৈতিক বেদনায় পীড়িত আদর্শবাদী মাজিনিপন্থীদের কথা—নিহত জ্ঞানী আমেনদোলার কথা,—নির্বাসিত এবং ঘাতকের ভয়ে সর্বদা ভীত সং সাল্‌ভেমিনির কথা—ইত্যাদি।"

রলাঁর মনে হয়েছিল, এই অত্যাচারের কথা শুনে রবীন্দ্রনাথের মুখ কুঁকড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সত্যই কি তাই? তিনি ফ্যাসিবাদের সমর্থনে ভারতবর্ষে প্রসঙ্গে এলেন :

"তিনি বিশ্বাস করেন না যে, এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের পক্ষে নিজেকে শাসন করা সম্ভব। বিদেশী শাসন এখনো সবচেয়ে কম খারাপ। এবং সমস্ত বিদেশী শাসনের মধ্যে মারাত্মক ভুলভ্রান্তি, সংকীর্ণতা ও উপলব্ধির অভাব সত্ত্বেও, ইংরেজ শাসন নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। এ যদি চলে যায় ভারতবর্ষে তার স্থান নেবে আফগান অথবা জাপানী শাসন, তারা হবে সবচেয়ে খারাপ।"

রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে প্রশান্তচন্দ্র জানালেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা

হয়েছিল, রলাঁর বন্ধু মাদাম অ-এর সঙ্গে, এক ইংরেজ ক্যাথলিকের সঙ্গে, আসজিওলি নামে এক তরুণ দার্শনিকের সঙ্গে। কিন্তু এঁরা তখন সবাই ফ্যাসিজমের ভক্ত।

১০ জুন, রলাঁর ভর্ৎসনার পর, রবীন্দ্রনাথ প্রথম জানতে চাইলেন, ইটালির কাগজপত্রে কী বেরিয়েছে। এবং সেই দিনই প্রথম সাহস করে প্রশান্তচন্দ্র পড়ে শোনালেন ইটালির পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ফ্যাসিজম-প্রশস্তি।

৩০ জুন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ফ্যাসিজম বিষয়ে প্রবন্ধটি পড়ে শোনালেন। রলাঁ, দুয়ামেল এবং রনিগার হতবুদ্ধি হয়ে শুনলেন, মুসোলিনির সঙ্গে আলেকজাণ্ডার এবং নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা। ফ্যাসিজম বিষয়ে তিনি আপত্তি জানিয়েছেন তাত্ত্বিক স্তরে, জীবনের অভিজ্ঞতার স্তরে নয়। ক্রুদ্ধ রলাঁর ভাষায় "ফ্যাসিবাদের কাজকর্ম সম্পর্কে তিনি বিচার করতে পারেন না, তিনি কিছুই দেখেন নি, কিছুই শোনেন নি, কিছুই বোঝেন নি, কিছুই জানেন না। তিনি হাত ধুয়ে ফেলেছেন।" দুয়ামেল জানালেন এই প্রবন্ধ ফ্রান্সের ফ্যাসিবিরোধী পত্রিকা ছাপবে না, ছাপতে উৎসাহী হবে ইটালিরই ফ্যাসিস্ট পত্রিকাগুলো।

ইটালি-ভ্রমণ সেরে ১০ জুন ১৯২৬ রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনের ডেইলি নিউজকে বলেছিলেন :

I am glad of this opportunity to see for myself the work of one, who is assuredly a great man and a movement that will certainly be remembered in history"[৩১]

৩০ জুন তারিখেও তাঁর মতামত পালটায়নি এলমহার্স্ট, ক্রোচে, স্কোটি, ইটালির রাজার বোন, রলাঁর অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও।

৬ জুলাই মাদাম সালভাদোরির সঙ্গে সাক্ষাতের পর, রলাঁর ভর্ৎসনার ব্যঞ্জনা তিনি বুঝতে পারলেন। এর পর ৭ জুলাই এবং ২১ জুলাই ফমিকির কাছে চিঠি, ২১ জুলাই অ্যাণ্ডরুজকে চিঠি, এবং ২০ সেপ্টেম্বর ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে বিবৃতির মাধ্যমে ফ্যাসিজমের নিন্দায় তিনি স্পষ্ট এবং তীব্র হলেন। কিন্তু সেখানেও, ইটালি সম্পর্কে তিনি অস্বচ্ছ থেকেই গেলেন :

সালভাদোরিকে ৬ই জুলাই : If, on the contrary, Italy in the pursuit of her political power and material gain, has sacrificed some ideal of humanity, she deserves condemnation.[৩২]

অ্যাণ্ডরুজকে ২১শে জুলাই : If Italy has made even a temporary

gain though a ruthless politics she may be excused for such an obsession—but for us outsiders, who believe in idealism, there can be no such excuse.[৩৩]

তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ তাহলে ফ্যাসিজম-বিরোধী, কিন্তু ব্যবহারে নয়? অথবা মুসোলিনির ইটালি ফ্যাসিস্টই নয়?

ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানকে ২০ সেপ্টেম্বর: বিদ্যালয়ে জবরদস্তি করে ধর্মপাঠ করার সমর্থনে রোমের জনৈক ইংরেজের যুক্তি শুনে অবাক রবীন্দ্রনাথ It struck me all the strongly because I knew that there was a time when Mussolini had openly expressed his hatred of all religions in an extravagant language of abhorrence. For the first time it made me suspect that possibly there was something unnatural in the high pitched protestain of happiness by the people whom I met, that it rang loudly upon the dead bush of a universal fear[৩৪]

মুসোলিনি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দুর্বলতা স্পষ্ট হলো তাঁর ১৯৩০ সালের এক চিঠিতে।[৩৫] আমেরিকা থেকে তিনি ২১ নভেম্বর লিখছেন রবীন্দ্রনাথকে:

"Prof Formichi এসেছিলেন। এখনো আমাদের উপরে তাঁর আন্তরিক টান আছে। আমার সঙ্গে দেখা হতেই তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ইটালি দিয়ে আমার যাওয়া চলবে কিনা। তিনি বললেন মুসোলিনিকে একখানা চিঠি লিখলেই সমস্ত জঞ্জাল সাফ হয়ে যায়। আমি তাঁকে বলেচি, চিঠি লিখব। চিঠিটা এই সঙ্গে পাঠাই। যদি দ্বিধার কারণ না থাকে পাঠিয়ে দিস্। চিরকাল ইটালির সঙ্গে ঝগড়া জাগিয়ে রাখা ঠিক নয়।"

মুসোলিনিকে লেখা প্রস্তাবিত চিঠিটি ছিল এইরকম:

Your Excellency,

It often comes to my memory how we were startled by the magnanimous token of your sympathy reaching us through my very dear friend—Professor Formichi. The precious gift, the library of Italian literature, is a treasure to us highly prized by our institution and for which we are deeply grateful to your Excellency.

I am also personally indebted to you for the lavish generosity you showed to me in your hospitality when I was your guest in

Italy and I earnestly hope that the misunderstanding which has unfortunately caused a barrier between me and the great people you represent, the people for whom I have genuine love, will not remain permanent, and that this expression of my gratitude to you and your nation will be accepted. The politics of a country is its own, its culture belongs to all humanity. My mission is to acknowledge all that has eternal value in the self-expression of any country. Your Excellency has nobly offered to our institution in behalf of Italy the opportunity of a festival of spirit which will remain inexhaustible and ever claim our homage of a cordial admiration.

I am, Your Excellency,
Gratefully Yours
Rabindranath Tagore

রানী যাঁকে জানতেন গুপ্তচর সেই ফর্মিকিকে রবীন্দ্রনাথ যে পছন্দ করতেন, এই চিঠির পরেও, প্রমাণ পাওয়া গেল Golden Book of Tagore সংকলনের সময় ফর্মিকিকে নিমন্ত্রণ করার সময়, রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে লেখার জন্য। ফর্মিকি লিখলেনও, ১৯২৬-এর ইটালি ভ্রমণান্তর রবীন্দ্রনাথের সাময়িক 'ভ্রান্তি' উপেক্ষা করে, রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তুচ্চিকেও বিশ্বভারতী পরে সম্মান জানিয়েছে দেশিকোত্তম উপাধি দিয়ে।

উৎস-নির্দেশ

১. Rabindranath through Western Eyes, Alex Aronson (1978), ৬৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।
২. ভারতবর্ষ, রমাঁ্যা রলাঁ। অবন্তীকুমার সান্যাল অনূদিত। ১৫৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।
৩. কবির সঙ্গে য়ুরোপে। নির্মলকুমারী মহলানবিশ। উপক্রমণিকা।
৪. ওই। ভূমিকা।
৫. ভারতবর্ষ। পৃ. ১৩৬।
৬. The Modern Review। মার্চ ১৯২৫।
৭. The Visva-Bharati Quarterly। জুলাই ১৯২৫।
৮. ভারতবর্ষ। পৃ. ১০৬।

৯. The Visva-Bharati Quarterly। অক্টোবর ১৯২৬।
১০. শান্তিনিকেতন পত্রিকা, কার্তিক ১৩৩২ (অক্টোবর-নভেম্বর ১৯২৫)।
১১. শান্তিনিকেতন পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৩২ (জুন-জুলাই ১৯২৫)
১২. কবির সঙ্গে য়ুরোপে। পৃ. ১।
১৩. প্রবাসী। চৈত্র ১৩৩২।
১৪. শান্তিনিকেতন পত্রিকা। কার্তিক ১৩৩২।
১৫. কবির সঙ্গে য়ুরোপে। পৃ. ৪।
১৬. On the Edges of Time, Rathindranath Tagore। পৃ. ১৫৬।
১৭. ওই। পৃ. ১৩৭।
১৮. Visva-Bharati Quarterly। অক্টোবর ১৯২৬
১৯. কবির সঙ্গে য়ুরোপে। পৃ. ৩৮।
২০. ভারতবর্ষ। পৃ. ১৫৩।
২১. ওই। পৃ. ১৫৫-১৫৬।
২২. ওই। পৃ. ১৫৬।
২৩. ওই। পৃ. ১৭৬-১৭৭।
২৪. Visva-Bharati Quarterly। অক্টোবর ১৯২৬।
২৫. Personal Memory by L. K. Elmhirst, Sahitya Akademy Tagore Centenary Volume.
২৬. ভারতবর্ষ। পৃ. ৭৯।
২৭. ভারতে জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, নেপাল মজুমদার, গ্রন্থে উদ্ধৃত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৫।
২৮. ওই। পৃ. ৩০১।
২৯. ভারতবর্ষ। পৃ. ৯৪।
৩০. আরনসন। পৃ. ৬৩।
৩১. নেপাল মজুমদার। পৃ. ৩৩৫।
৩২. ওই। পৃ. ৩৩১।
৩৩. Visva-Bharati Quarterly ১৯২৬ অক্টোবর।
৩৪. নেপাল মজুমদার। পৃ. ৩৩৭।
৩৫. চিঠিপত্র, ২য় খণ্ড ॥

প্রবন্ধ

দেবী : তত্ত্বে, নৃতত্ত্বে

দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

'লেভি স্ত্রোস' তাঁর নিজস্ব সমালোচনা পদ্ধতি সম্পর্কে মনে করতেন—"It should help to explain not only how cultural symbols convey messages within a particular cultural milieu but how they convey messages at all. The structure of relations which can be discovered by analysing materials drawn from any one culture is an algebraic transformation of other possible structures belonging to a common set and this common set constitutes a pattern which reflects an attributes of the mechanism of all human brains."১ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি বা সহজাত প্রবণতার ভিত্তিতেই সাহিত্যশাস্ত্রীরা দেশকাল নিরপেক্ষ ভাবে অনুসন্ধান করেন সংস্কৃতির একটি সাধারণ সূত্রকে। তাই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ভিন্নতা সত্ত্বেও এই সাধারণ সূত্রের মূল উপকরণগুলো সহজে নিজেদের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করে একাধিক সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে। কল্পনার মধ্যে দিয়ে যে তত্ত্বের জাতকর্ম, তার সুনির্দিষ্ট, সার্বজনীন অবয়ব প্রদানই যদি বিজ্ঞানের কাজ বলে ধরা যায় তবে সাহিত্য-সমালোচনা-প্রস্থানে যে একাধিক ধারা গড়ে উঠেছে কল্পনার সূত্রধরেই তারা কাল্পনিক হয়ে যায় না বরং বিজ্ঞান-সম্মত হয়েই উঠে।

সাম্প্রতিক সাহিত্য সমালোচনা প্রস্থানে নৃতাত্ত্বিক আলোচনার ধারা গড়ে উঠেছে ১৯ শতকে। মহাকাব্য, লোকসাহিত্য কিংবা সাহিত্যের অন্যান্য ধারায়

(Genre) এর প্রয়োগ করে সাহিত্য-শাস্ত্রীরা মানব সমাজ বা জীবনধারার পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের চরিত্রকে কোনো নির্দিষ্ট সাহিত্য-নিদর্শের মধ্যে থেকে কেন্দ্রীয় গল্পটি – যাকে 'মিথ' (Myth) হিসেবে চিহ্নিত করেন, তাকে অনুসন্ধান করে তার স্বরূপ নির্ধারণই এই ধারার সাধারণ পদ্ধতি। সুতরাং দেশগত, কালগত বা মানবজীবনের বিবর্তন পর্বের অন্তর্গত সাধারণ প্রবণতার ভিত্তিতে খুঁজে নেওয়া হয় কোন কাহিনীগুচ্ছ বা নির্দিষ্ট সাহিত্য-ধারার অন্তর্লীন কেন্দ্রীয় বিন্দুটিকে। পাশ্চাত্য-সাহিত্য-সমালোচনায় যে নৃতাত্ত্বিক সমালোচনার ধারা গড়ে উঠেছে তার পরিসর শুধুমাত্র নৃতত্ত্বের মধ্যে সীমায়িত নয়। ডারউইনের 'বিবর্তন বাদ' কিংবা ইয়ুং-এর 'কালেকটিভ আনকনসাসনেস' (Collective unconsiousness) প্রভৃতি তত্ত্বকে স্বীকার করেই এ ধারার অনুবর্তন। এডোয়ার্ড টোলর, জেমস্ ফ্রেজার, কিংবা কার্ল ইয়ুং-এর প্রচেষ্টায় যে ধারার সূত্রপাত, পরবর্তী কালে 'কেমব্রিজ স্কুল'-এর সমালোচক কিংবা মারে, ক্রক, ফার্গুসন, ফেডলার বা ফ্রাই প্রমুখ সমালোচকদের হাতে তা পল্লবিত হয়ে উঠে, কখনো মহাকাব্য (Epic) বা পুরাণ, মিথ, প্রাচীন নাটকের ক্ষেত্রে অথবা লোকসাহিত্যের পরিসরে। বলাবাহুল্য এই আলোচনা পদ্ধতির প্রভাব যে সৃজনশীল লেখকদের উপরও পড়েছে, তা সমালোচকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। Northrop Frye তাঁর আলোচনায় যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তাকে মনে রেখেই ভাবা যেতে পারে আমাদের পূজিত দেবী – দুর্গা সম্পর্কে।

সমাজ জীবনে সন্তান ধারণের গুরুত্বপূর্ণ ভার যিনি বহন করেন সেই নারী সামাজিক কারণেই গুরুত্ব পেয়ে এসেছেন সমস্ত দেশে, সমস্ত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেই। গ্রীস, ফ্রিজিয়া কিংবা মিশরের প্রাচীন সভ্যতায়ও এই প্রবণতা যেমন লক্ষ্য করা যায় তেমনি লক্ষণীয় ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও। নারী তাই একদিকে যেমন পূজ্যা দেবী হয়ে ওঠেন তেমনি অপরদিকে নারীর প্রজনন শক্তি প্রতীকী রূপ পায় সমাজ জীবনের নানা স্তরে, নানা আচার-অনুষ্ঠানে, নানা অনুষঙ্গে। শস্যের উৎপত্তি, ভূমির উর্বরতা, বৃক্ষের জন্ম, শস্য দান কিংবা ঋতুচক্রের আবর্তন-বিবর্তন বারবারই উপমায়িত হয় জৈব-জীবনচক্রের সঙ্গে। নৃতাত্ত্বিকরা তার পরিপ্রেক্ষিতে সাজিয়ে নিয়েছেন তুলনামূলকভাবে উদ্ভিদ-জীবনচক্র, জৈবজীবনচক্র কিংবা সৌর বা চান্দ্র পরিক্রমণ চক্রকে একটি বৃত্তের মধ্যে। আর নৃতাত্ত্বিক সমালোচকদের মতে তার থেকেই এসেছে সাহিত্যের নানা শাখার উদ্ভব ও বিকাশ। সেজন্যেই সাহিত্যের নানা কাহিনীর মধ্যে লুকিয়ে থাকে মানুষের চৈতন্যজাত নানা উপমা বা প্রতিমা (imagery) যা প্রতীকীরূপ হিসেবে প্রকাশ করে আমাদের নানা অভিজ্ঞতার নির্যাস, বোধ কিংবা সমাজজীবনের নানা ইঙ্গিতকে।

শুধু সংস্কৃত বা বাঙলা সাহিত্যে নয় সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেই যে কাহিনী বৈদিক যুগ থেকে সূচিত হয়ে পৌরাণিক ও মধ্যযুগের সাহিত্য শাখায় নিজের প্রভাব অক্ষুন্ন রেখেছে, তা হল দেবী-মাহাত্ম্য সূচক কাহিনী। মাতৃদেবতার উপাসনার ঐতিহ্য আর্যপূর্ব যুগের না আর্যোত্তর যুগের তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু বেদের 'দেবী সূক্ত' বা মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার মাতৃমূর্তির কথা মনে রেখে এই ধারার প্রাচীনতাকে স্বীকার করতে হয় ঐতিহাসিক কারণেই। এই ঐতিহ্য পৌরাণিক যুগে এসে নানা ধারায় বিভক্ত হয়েছে এবং বলা বাহুল্য রেখে গেছে এই উত্তরাধিকারের অনুবর্তিত রূপ—মধ্যযুগের শেষপর্ব পর্যন্ত বাঙলার মঙ্গলকাব্য, পদাবলী-সাহিত্য কিংবা লৌকিক সংস্কৃতিই তার নিদর্শন। অম্ভৃণ দুহিতা 'বাক' নাম্নী বিদুষীর আত্মপরিচয়ের' মধ্যে অঙ্কুরিত যে দেবীর রূপরেখা পৌরাণিক যুগের দুর্গা, চণ্ডী প্রভৃতি দেবীর পরিকল্পনা ভূমির ভিত্তি হয়েছিল তা একদিকে যেমন নাগরিক সাহিত্যের সৃজনশীল কবিকর্মে 'কুমার সম্ভবম্' হয়েছে ; চণ্ডী, দুর্গা, গৌরী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবীকে নিয়ে রচিত মঙ্গলকাব্য কিংবা শিবায়নে হয়ে উঠেছে নতুন কাহিনী, তেমনি অপরদিকে ঝুমুর বা গম্ভীরার গানে, পাঁচালীতে, পদাবলীতে, (শাক্ত) নতুন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে সাবলীল ভাবেই। কখনো ব্রতকথার মধ্যে সেই কাহিনীই প্রতীকীরূপ পায় ঐহিক আকাঙ্ক্ষার বিমূর্ত চিত্র হিসেবে, আবার তন্ত্রের মধ্যে সে কাহিনীই আত্মগোপন করে কখনো তত্ত্বের আবরণে, কখনো বাস্তবের গা ছুঁয়ে। নারী দেবতা সম্পর্কিত এই কাহিনীর প্রবহমানতা শাস্ত্রীয় থেকে লৌকিকে হোক বা লৌকিক থেকে শাস্ত্রীয় স্তরে হোক, তার গতায়াত উভয়স্তরেই স্বচ্ছন্দ। কিন্তু যেটি লক্ষণীয় তা হল এই আপাত ভিন্ন কাহিনীগুচ্ছ বা কল্পনাগুলোর মধ্যে প্রায়ই একটা আবছা সাদৃশ্য চোখে পড়ে। চোখে পড়ে গঠনের সাম্যিতি—যার থেকে এ প্রশ্ন স্বভাবতই জাগে, তবে কি এই কাহিনীগুলির মধ্যে একটা ঐক্য-সূত্র আছে, আছে একটা সাধারণ উৎস-ভূমি ? অর্থাৎ একটি মূল কাহিনীকে ঘিরেই কি গড়ে উঠেছে এই পল্লবিত ধারাগুলো ?

ঋগ্বেদের 'দেবী সূক্তের' প্রতিপাদ্য বিষয় হল কোনো দেবীর আত্মপরিচয়—যিনি মূলত সমস্ত শক্তি বা চৈতন্যের অধিষ্ঠাত্রী, বিশ্বের পরমা নিয়ন্ত্রী। বস্তুত

এই আত্মপরিচয় ভিত্তিগত ভাবে দার্শনিক। অলৌকিক মহিমার আরোপ বা প্রলেপ পড়ল পরবর্তীকালে এর ওপর, পৌরাণিক যুগে এসে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, বামন পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, কালিকা পুরাণ, দেবী পুরাণ কিংবা দেবী-ভাগবতে এই দেবীকে নিয়ে সৃষ্টি হল নানা কাহিনী। দুর্গা আদিতে দেবতাদের সম্মিলিত তেজপুঞ্জের প্রভাবে সৃষ্ট দেবীহলেও, তাঁর জ্যোতিঃস্বরূপঅনড় থাকেনি শেষ পর্যন্ত। যদিও তিনি মায়ারূপে সর্বত্রব্যাপ্ত এবং দেবগণ প্রয়োজন অনুসারেই তাঁর জাগরণ ঘটান (বোধন করেন) কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনি হয়ে পড়েন "অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যে অনলে" কিংবা "সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে"[৩] একমাত্র ত্রাণকর্ত্রী দেবী। অর্থাৎ তাঁর অধিকার ভূমি প্রসারিত হয় কখনো পশুকুলের অধিষ্ঠাত্রী হিসেবে (চণ্ডী), শত্রুদমনকারিণী হিসেবে; কখনো বা যুদ্ধে জয়দাত্রী কিংবা বিপদে ত্রাণকর্ত্রী হিসেবে। যিনি পতিগৃহ কৈলাসে পতিপুত্র সমন্বিত পরিবারের কর্ত্রী, তিনিই দক্ষের কন্যা সতী কিংবা হিমালয় নন্দিনী উমা। একই দেবী বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করেন কল্পান্তরে। অর্থাৎ অবতারতের মাধ্যমে এই যে বিভিন্ন রূপ কিংবা নিজের আবরণ দেবতা (উগ্রচণ্ডা, চণ্ডী ইত্যাদি) বা শক্তি হিসেবে (গৌরী ইত্যাদি অষ্টমাতৃকা, উগ্রচণ্ডা ইত্যাদি অষ্টশক্তি, কালী ইত্যাদি দেবীরা) যে বিভিন্ন দেবীদের দেখা যায় তাঁর বস্তুত হয়ে পড়েন একই দেবীর 'বহুরূপতা' (isomorph)। সুতরাং যিনি আদি মাতৃদেবতা—সেই একজন দেবীর বিভিন্ন বহুরূপতাকে(isomorphs) গ্রথিত করা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন লৌকিক বা পৌরাণিক আখ্যানরূপে। বহুরূপে বিভক্ত এই কল্পনার কেন্দ্রীয় রূপটি ভেবে দেখা যেতে পারে নৃতাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে, বলা বাহুল্য এ আলোচনা থেকেই বেরিয়ে আসে সেই মূল দেবীর আদি থেকে আজ পর্যন্ত বিবর্তনের পর্যায়গুলো এবং এই বহুরূপতার চরিত্রটি।

ভারতীয় সভ্যতার আদিরূপ আর্যসভ্যতায় নিহিত। প্রাক্-আর্য ভারতবর্ষে অন-আর্য উত্তরাধিকারের মধ্যে দেবী-ভাবনার ঐতিহ্য থাকলেও আর্য-অনার্য সম্মিলনের ফলশ্রুতিতে যে সমন্বিত চেহারা আসে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেখানে অনার্য কিংবা আর্য সংস্কৃতি-ধারা অবিমিশ্রভাবে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারেনি। আর্যসভ্যতার আদি নিদর্শন হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োতে নানা প্রত্নবস্তুর মধ্যে যে দেবীমূর্তিটি পাওয়া গেছে তার ব্যাখ্যা পণ্ডিতজনের কাছে বিতর্কের বস্তু হতে পারে, কিন্তু তার আপাত অবয়ব থেকে যে সাধারণ

ধারণা করা যায় তা হল, একজন নারী—যার যোনিদেশ থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি গাছ। মূর্তিটি দেবী বা মানবী যাঁরই হোক, তাঁর এই চেহারা সাক্ষ্য দেয় যে নারীর উর্বরা শক্তির সঙ্গে বৃক্ষের সম্পর্ক অথবা বৃক্ষ যেখানে জন্মায় সেই ভূমির সঙ্গে নারীর সম্পর্ক। একে অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে নারী, ভূমি, নারীর উর্বরা শক্তি কিংবা বৃক্ষ বা সন্তান কোনো না কোনো ভাবে এখানে প্রতীকী তাৎপর্য পেয়েছে।

নৃতত্ত্বের মতে মানব সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে নারী পূজ্যা হয়ে ওঠেন, সম্মানীয়া হয়ে ওঠেন তাঁর উর্বরা শক্তির (fertility) জন্যেই—সে কথা আগেই বলেছি। এই জাতীয় নারীর উর্বরা শক্তির উপাসকরা অভিহিত হন 'Fertility Cult' হিসেবে। বিশ্বের নানা প্রান্তের প্রাচীন ধর্মে বা সাহিত্যে, আচার-অনুষ্ঠানে তাই স্থান পেয়েছে নানা প্রতাক বা প্রতীকী ক্রিয়াকলাপ যাদের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষের যন্ত্রের প্রতিরূপ স্পষ্ট, কিংবা মৈথুন ক্রিয়ার আভাস স্পষ্ট। জৈবিক প্রবণতা—স্ত্রীপুরুষের মিলন, সন্তানের জন্ম ইত্যাদি ঘটনা প্রথমে বিস্ময়ের বস্তু থেকে শ্রদ্ধার বস্তুতে রূপায়িত হয়েছে, প্রবেশ করেছে ধর্মের মধ্যে। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে কিংবা মহাকাব্য, পুরাণ বা লোককথায় যে প্রতিমাটি (imagery) প্রায়ই লক্ষণীয় তা হল—অনন্ত আকাশ হলেন পিতা আর ধরিত্রী মাতা। এদের মিলনে বৃষ্টিধারার মাধ্যমে নিষিক্ত হয় বীজ, আর তারই ফলশ্রুতিতে জন্ম নেয় সন্তান—শস্য। সুতরাং আদি মাতা পৃথিবী, পিতা—আকাশ। Frye বলেন—"In the rituals and myths the earth that produces the rebirth is generally a female figure."[৪]

সারা বিশ্বের পুরাণ কিংবা লোককথার মধ্যে এই পৃথিবী হয়ে উঠেছেন দেবী, যিনি প্রতি বছরে শস্যের পুনর্জন্ম দেন, শস্যের বীজকে নিজের মধ্যে ধারণ করে রাখেন। তাঁর ক্ষয় নেই, চিরজীবিতা। বিশ্বের সমস্ত প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যেই পৃথিবীর এই দেবী-রূপ লক্ষ্য করা যায়। Muro S. Edmonson প্রাচীন সংস্কৃতিগুলির মধ্যে পৃথিবী-দেবতা (earth God) ও মাতৃ-দেবতার (Mother God) যে পরিকল্পনা দেখা যায় তার একটি তালিকা দিয়েছেন।[৫] তার মধ্যে থেকে কয়েকটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে গ্রীক দেবী 'Rhea' ছিলেন এমনই পৃথিবী-দেবী। রোমান দেবী 'Cybele'-ও তাই। পুরোনো কালে জার্মানীতে পূজিত ও জনপ্রিয় দেবী 'Nerthus' ছিলেন এমনই পৃথিবী দেবী। ট্যাসিটাসের সাক্ষ্য থেকে তারই সমর্থন মেলে—

"Nearly all the Germans unite in worshipping Nerthus, that is to say, Mother Earth'[৬] মিশরেও এক প্রাচীন দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়, তিনি হলেন 'Isis'। ইনিও পৃথিবীর সঙ্গে অভিন্না। Stith Thompson-এর ভাষায়—"Isis, a very ancient Egyptian deity, was the goddess of fecundity, the counterpart of the Roman Ceres and the Greek Demeter—all three of them evidently local versions or atavistic survivals of the original Mediterranean Mother Goddes. When this Great Mother was thought of as identified with the bountiful fecund earth, the might be known as Gæa or Ge (Greek) or Tellus (Roman). আরও স্পষ্ট করেই এই ভূমি-রূপা মাতৃদেবতার কথা বলেছেন Frazer—"According to Brugsch She is not only the creatress of the fresh verdure of vegetation which covers the earth, but is actually the green corn-field itself, which is personified as a goddess.[৮] অষ্টম-সপ্তম খৃস্টপূর্বাব্দে, আনাতোলিয়ায় পূজিত এমনই পৃথিবীরূপা মাতৃদেবতা 'গ্‌দান মা'র কথা আমাদের দৃষ্টি গোচরে এনেছেন আচার্য সুকুমার সেন।[৯] গ্রিজিয় সংস্কৃতির মধ্যেও যে পৃথিবী-মাতার পরিকল্পনা ছিল তা বোঝা যাচ্ছে। যে দেবীদের প্রসঙ্গ এনেছি তাঁদের অবয়ব বা চরিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যেতে চাই না কিন্তু এ থেকে যেটি বেরিয়ে আসে তা হল বিশ্বের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে মাতৃ-দেবতা এবং পৃথিবী-দেবতার পরিকল্পনায় একটি ঐক্যসূত্রের অবস্থিতি। শস্যের সঙ্গে দেবীর, পৃথিবীর সঙ্গে দেবীর পরিকল্পনায় মানব মনের একটি সাধারণ প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ইস্কাইলাস লিখেছেন—

"The pure sky yearns with love to wound the Earth
The loving Earth yearns likewise to be wed,"[১০]

পিতা আকাশ ও মাতা ধরিত্রী—এই ধারণার প্রসঙ্গ আগেই বলেছি। সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্বের বা লোকবিজ্ঞানের পরিসর ছেড়ে এই ধারণা যে সাহিত্যেও স্থান করে নিয়েছে তার প্রমাণ ইস্কাইলাসের এই ছত্রটি। পৃথিবীকে মাতা হিসেবে পরিগণিত করার যে সাধারণ প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে তার সঙ্গে এটিও লক্ষণীয় যে পুরাণ বা লোককথার মধ্যে আকাশ ও পৃথিবীর এই সম্পর্ক

দেশ-কাল নিরপেক্ষ ভাবে গড়ে উঠেছে। আকাশ ও পৃথিবীর এই সম্পর্কের মূল সূত্র হল—"Earth goddess universally in mythology the wife of the sky-deity"[১১] ভূমির উর্বরাশক্তির প্রশ্নেও এসে যায় আকাশের ভূমিকা ...."male divinity appears, sometimes descending from the sky. Male divinity is sometimes a sky-power fertilising Mother Earth."[১২] সুতরাং মাতৃ-দেবতা ও পৃথিবী-দেবতার পরিকল্পনায় অভিন্নতা এবং আকাশ ও পৃথিবীর সম্পর্কের যে রূপরেখাটি প্রতীচীর সাহিত্যে, ধর্মে কিংবা বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, প্রাচীর ধর্মে, সাহিত্যে বা সংস্কৃতিতে সে ভাবনা কি তেমনভাবেই ছিল?

ভারতীয় সমাজ মূলত কৃষি ভিত্তিক। কৃষি নির্ভর সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশেই গড়ে উঠেছে তার সাহিত্য, ধর্ম কিংবা সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতির চরিত্র। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বেদকে তুলনা করেছিলেন 'Golden treasury of songs and Lyrics' এবং স্যাণ্ডিনেভিয়ান 'সাগা'র সংগ্রহ-গ্রন্থের সঙ্গে[১৩]। অর্থাৎ বেদ তাঁর মতে, লোকজীবনে প্রচলিত সাহিত্য বা গীতিকার সংগ্রহ-গ্রন্থ মাত্র। বৈদিক সাহিত্যের অজস্র উপমা, প্রতিমা কিংবা প্রার্থনার মধ্যে এই কৃষিভিত্তিক জীবনধারার সাক্ষ্যই স্পষ্টতর। ইস্কাইলাসের মতোই ঋগ্বেদের ঋষি নিদ্বিধায় বলেন—"দ্যৌর্মে পিতা···মাতা পৃথিবা মহীয়ম্" (১/১৬৪/৩৩)[১৪] দ্যৌ অর্থে আকাশ, তাই পৃথিবী শুধু মাতা হিসেবেই সম্বোধিতা বা পরিগণিতা হননি বৈদিক সাহিত্যে, আকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে যান বারবার, বিভিন্ন সূক্তে, তেমনি অপর একটি—

"ভূরিং দ্বে অচরন্তী চরন্তং
পদ্বন্তং গর্ভমপদী দধাতে
নিত্যং ন সূনুং পিত্রোরুপস্থে
দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥" (১।১৮৫।২)

অথবা—"ঋতং দিবে তদবোচং পৃথিব্যা
অভিশ্রাবায় প্রথমং সুমেধাঃ
পাতামবদ্যাদ্দুরিতাদভীকে
পিতা মাতা চ রক্ষতামবোভিঃ ॥" (১।১৮৫।১০)

প্রথম শ্লোকে লক্ষণীয়—দ্যাবা পৃথিবী প্রাণিসমূহকে গর্ভে রক্ষা করেন—এই প্রতীকটি এবং দ্বিতীয় শ্লোকে দ্যাবাপৃথিবী সম্বোধিত হন 'পিতামাতা' হিসেবে।

বস্তুত বৈদিক সাহিত্যে পৃথিবী প্রায় সমস্ত সময়ই 'দ্যাবা পৃথিবী' হিসেবে-সম্বোধিত হন অর্থাৎ 'দ্যৌ' এর সংযুক্ত হিসেবে, কখনো একক ভাবে নয়। এমন উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। কিন্তু উল্লেখ্য যে প্রসঙ্গটি তা হল —ঋগ্বেদেই দেবমাতা অদিতিকে পৃথিবীর সঙ্গে অভিন্না বলা হয়েছে—"মহ্না মহদ্ভিঃ পৃথিবী বি তস্থে মাতা পুত্রৈরদিতির্ধায়সে বঃ।" (১।৭২।৯) অদিতি এবং পৃথিবীর এই অভিন্নতা পরবর্তীকালে অথর্ববেদ বা সংহিতা গ্রন্থেও লক্ষণীয়। উদ্ধৃত উদাহরণ থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে ভূমাতা বা পৃথিবী দেবীর কল্পনা যেমন মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পায় প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর মধ্যে আভাসিত, তেমনি তা স্পষ্টভাবে সূচিত বৈদিক সাহিত্যে। বৈদিক সাহিত্যে পৃথিবী শুধু দেবীই নন বা মাতাই নন, তিনি আদিমাতা—দেবমাতা। আর এরই সঙ্গে সমর্থন পাওয়া যায় নৃতত্ত্বের সেই সুপরিচিত তত্ত্বটির—পিতা আকাশ বা দ্যৌ এবং মাতা পৃথিবী, প্রশ্ন তুলেছিলেন ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত—"বেদ-পরবর্তী যুগে আমরা অদিতিকে দক্ষজননী—আবার দক্ষকন্যা উভয় রূপেই দেখিতে পাই। এই দক্ষকন্যা রূপেই কি তিনি গিয়া পরবর্তী কালের দক্ষকন্যা সতীর রূপান্তর লাভ করিয়াছিলেন?" [১৫]

পৌরাণিক যুগ সমন্বয়ের যুগ। বেদের দেবতারা কখনোই সমাজের সর্বস্তরে নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা পাননি। তাই পুরাণকারদের হাতে ঘটে চলেছিল নতুন দেবতাদের উদ্ভব। বৈদিক, লৌকিক কিংবা কল্পিত দেবদেবীদের মধ্যে নানা সমন্বয়ও ঘটে চলেছিল এ যুগে। বৈদিক বা লৌকিক ঐতিহ্যকে তাঁরা অম্লান বদনে মিলিয়ে দিচ্ছিলেন পৌরাণিক দেবদেবীদের মধ্যে। পৌরাণিক দেবতাদের মধ্যে ভূদেবীর অস্তিত্ব কখনো স্বতন্ত্রভাবে থাকলেও তা বিক্ষিপ্ত ধারা মাত্র। বিষ্ণুমূর্তির পার্শ্বদেবী হিসেবে কখনো কখনো শ্রী এবং ভূদেবীকে দেখা যায় প্রস্তর স্থাপত্যে। কিন্তু সেই ভূদেবী বা বসুমতী ব্যাপকভাবে গৃহীত হননি জনমানসে। অপর দিকে ঋগ্বেদের দেবীসূক্তের সূত্র ধরে যে দেবীর পরিকল্পনা সূচিত হল পুরাণে, তিনি দুর্গা। দেবী-পরিকল্পনার আপাত ভিন্নতার মধ্যে কার্যত তিনি হয়ে ওঠেন শ্রেষ্ঠতমা কিংবা প্রধানা। প্রমাণ মেলে যখন বলা হয়—[১৬]

"হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈঃ...
সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত—
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা॥" (মৃ. চ./৪/৭)

কিংবা

"দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহ মূর্ত্যা।" (মৃ. চ./৪/৩)

—এই শাশ্বতী প্রকৃতি, যিনি সমস্ত রূপের মূল, তিনি যে সব দেবীদের আদি উৎস একথা তত্ত্বগতভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

দুর্গার কাহিনীকে নিয়ে যে পুরাণটি মুখ্যত রচিত, সেই মার্কণ্ডেয় পুরাণের সাক্ষ্যে দুর্গা কার্যতই আদি মাতা—"ত্বং দেবজননী পরা" (প্র. চ./১/৫৫) এবং বিশ্বের (সৃষ্টির) ধারণকর্ত্রী—"বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।" (উ. চ. ১১।৩৩) সুতরাং আদিমাতার যে নৃতত্ত্ব সমর্থিত পরিকল্পনা বৈদিক সাহিত্যেও পেয়েছি তারই রূপারোপ ঘটল দুর্গার পরিকল্পনায়। মিলিয়ে দিলেন পুরাণ-কারেরা। চিরন্তন কাল ধরেই দুর্গার পতি হলেন শিব। শিবের আটটি মূর্তির কথা বলেন পুরাণ। ক্ষিতি, জল প্রভৃতি আটটি মূর্তিতে প্রকাশিত শিবের পঞ্চম মূর্তি হল "ভীমায় আকাশ মূর্ত্তয়ে···"। এই আকাশ মূর্তি শিবই কি আদিতে ছিলেন দ্যৌ? বৈদিক ঐতিহ্যের যে উত্তরাধিকার—দ্যৌ ও পৃথিবীর সম্পর্ক তারই অনুবর্তন ঘটল এক্ষেত্রেও কি? আদি মাতা পৃথিবীর পতি হয়ে যান আকাশ-মূর্তি শিব চিরন্তন ভাবেই। 'স্বয়ম্ভূ' শিব এবং 'অযোনিসম্ভবা' দুর্গার এই সম্পর্ক তাই আকস্মিক মনে হয় না, তা সনাতনী। আর এই আদি মাতা দুর্গা যে বস্তুত পৃথিবীমাতাই, তার প্রমাণ দেয় পুরাণই। 'চণ্ডী' (মার্কণ্ডেয় পুরাণ) বলেন যে দুর্গা হলেন 'নিত্যা' এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ হল তাঁর মূর্তি—"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি" (প্র.চ/১/৬৪)। যাঁর ক্ষয় বা লয় নেই সেই শাশ্বতী দেবী 'নিত্যা' হিসেবে অবস্থান করেন জগৎ রূপেই। বস্তুজগতের সমস্তই তাই দুর্গার অবয়বে অঙ্গীভূত হয়ে যায়। সম্ভবত সেজন্যেই মানুষের চৈতন্য, নিষ্কণ্টক জীবনধারণ, ঐশ্বর্য, শস্য-সবকিছুরই নিয়ন্ত্রী হয়ে যান তিনি অরণ্য, রণক্ষেত্র, অনল, সাগর, জৈবিক সুখ-দুঃখ সমস্তই তাঁর অধিকার ভূমির মধ্যে আসে। ভূমির সঙ্গে বা পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের প্রমাণ এইটুকুই নয়। সে কথা আরও স্পষ্ট করে বলেন চণ্ডী—

"আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।" (উ.চ.।১১।৪)

জগতের আধারভূত যে দেবী মহীস্বরূপে বিরাজিত বস্তুত তিনি হয়ে পড়েন

পৃথিবীদেবী বা ভূমাতা। মার্কণ্ডেয় পুরাণের এই উক্তি থেকে একথা স্পষ্টতই বেরিয়ে আসে যে ভূমি-মাতার বা পৃথিবী-মাতার যে কল্পনা চলে আসছিল বৈদিক যুগ থেকে, দুর্গা তার সঙ্গে মিলে যান, হয়ে ওঠেন 'মহীস্বরূপা'। এমন প্রমাণ ইতস্তত অনেক আছে। দুর্গার বিভিন্ন রূপভেদের কথা আগেই বলেছি। চণ্ডীতে বলা হয় লক্ষ্মী দুর্গারই একটি রূপ (সে আলোচনায় পরে আসব)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেন শ্রী বা লক্ষ্মী হলেন পৃথিবী, (৫।৩।৫)। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালে লেখা 'নারায়ণোপনিষৎ' এই পৃথিবীদেবীকে স্তুতি করেন লক্ষ্মী হিসেবে—"অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে" (খ/১/৫৮) অথবা "ভূমির্দ্ধেনুর্ধরণী লোক ধারিণী।" (খ/১/৩৯) অর্থাৎ সুখদাত্রী এবং শস্য ও ধনের ধারয়িত্রী হিসেবে পৃথিবী অভিন্না হয়ে যান লক্ষ্মীর সঙ্গে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত এই নারায়ণোপনিষদেই প্রথমদুর্গি বা দুর্গা দেবীর নামোল্লেখ (খ/১/৩৪, খ/২/২) পাই। তেমনি কালিকাপুরাণে দুর্গার একরূপ জগদ্ধাত্রীকে অভিন্না বলা হয়েছে পৃথিবীর সঙ্গে—"পৃথিব্যাহং জগদ্ধাত্রী মদ্রূপং মৃন্ময়ন্ত্বিদম্" (৩৮।৬৩)। উদাহরণের ভার না বাড়িয়ে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মন্তব্যটি উল্লেখ করা যেতে পারে প্রাসঙ্গিক ভাবেই—"বহু পুরাণেই পৃথিবী-দেবীকে আমাদের পৌরাণিক মহাদেবী বা মহাশক্তি দুর্গার সহিতই এক করিয়া দেখা হইয়াছে···দেবীর পূজাবিধি লক্ষ্য করিলে আমরা তাঁহার পৃথিবী-রূপের অনেক পরিচয় লক্ষ্য করিতে পারি।"[১৭]

ফ্রাই বলেন—"The vegetable world supplies us of course with the annual cycle of seasons, often identified with or represented by a divine figure···The divine figure may be male (Adonis) or female (Proserpine), but the symbolic structures resulting differ some what"[১৮]

প্রতীচীর লোককথার উদাহরণ এনে ফ্রাই যে তত্ত্বের অবতারণা করেন প্রাচীর ক্ষেত্রে তার সম্ভাবনা ও যৌক্তিকতা ভেবে দেখা যেতে পারে। কৃষিভিত্তিক ভারতীয় জীবনধারায় আমাদের জীবনযাত্রার সমস্ত পর্যায়—আচার ব্যবহার, উৎসব-অনুষ্ঠান কিংবা ধর্ম আচরণ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে কৃষির সঙ্গে। আমাদের মূল দেবীকল্পনা যদি পৃথিবীদেবী হিসেবেই রূপায়িত হয়ে থাকে তবে প্রশ্ন জাগে যে ফ্রাই-এর আলোচিত ঋতুচক্র এবং পরিকল্পিত দেবী দুর্গার সঙ্গে সংযোগ সূত্র কোথায়? বলাবাহুল্য এ আলোচনা

থেকেই বেরিয়ে আসে দুর্গার বিভিন্ন রূপভেদের পরিকল্পনার চরিত্রটি। কিন্তু সে প্রশ্নে যাবার আগে বুঝে নেওয়া দরকার আমাদের দেবীভাবনার ঐতিহাসিক ক্রমটি।

আর্য-ঐতিহ্যে দেবী পরিকল্পনার মূল ভিত্তি প্রোথিত ছিল প্রকৃতির সঙ্গে। উষা, অদিতি (দেবমাতা বা বসুন্ধরা), শ্রী (ভূমি), সরস্বতী (নদী) প্রভৃতি দেবীরা প্রধানত সম্পর্কিত হয়ে যান প্রকৃতির সঙ্গে। অনার্য ঐতিহ্যে চণ্ডী প্রভৃতি দেবীদের অস্তিত্ব সম্পর্কে পণ্ডিতজনেরা নানা অনুমান করেছেন। কিন্তু তাঁদের যথার্থ স্বরূপ বা চরিত্র খুঁজে বের করা সম্ভবপর হয়নি। পৌরাণিক যুগে নানা ধারার সমন্বয়ে যে দেবীদের উদ্ভব ঘটল, তাঁদের মধ্যে প্রকৃতির অনুষঙ্গ যেমন সংযুক্ত হয়েছিল তেমনি দার্শনিক তত্ত্বও। পাশাপাশি যে ধারাটি প্রবহমান থেকেছে অথর্ববেদ সংকলনের যুগ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত তা হল তন্ত্রের ধারা। তন্ত্রের মধ্যেও একাধিক স্বতন্ত্র দেবীর উদ্ভব ঘটেছিল যাঁরা আপাত চরিত্রে স্বতন্ত্র হলেও মূলত পৌরাণিক দেবীদের সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রভাবশালী পৌরাণিক দেবীদের সঙ্গে চরিত্রগত সমন্বয় ঘটিয়ে তন্ত্রে নতুন দেবীদের পরিকল্পনা সূচিত হল। লৌকিক ধারাকেও তন্ত্রে অস্বীকার করা হয়নি, বলাবাহুল্য কৃষিভিত্তিক ভারতীর জীবনধারার পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠা তন্ত্রে যে দেবীদের পরিকল্পনা, তাঁরাও জড়িত হয়ে পড়েছিলেন কৃষি, কিংবা কৃষিভিত্তিক জীবনধারার অনুষঙ্গে। ষোড়শ শতকে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ যখন বাঙলাদেশে ভক্তি আন্দোলন প্রভাবিত তান্ত্রিক প্রস্থানের নবজাগরণ ঘটালেন, বাঙলাদেশের আবহাওয়ার সঙ্গে তন্ত্র সেদিন আরো ঘনিষ্ঠতর হল। এ সময়ে এমন অনেক দেবীই গৃহীত হলেন জনজীবনে, যাঁরা আগে গৃহীত হননি—যেমন কালী। কালীপুজোর প্রচলন খুব বেশি দিন আগে ঘটেনি।[১৯] ষোড়শ শতকের পর এই কালীই বাঙলার অন্যতম প্রভাবশালী দেবী হয়ে পড়েন। কেন জনপ্রিয় হন সে আলোচনা স্বতন্ত্র কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়ে এই অর্বাচীনত্বের তথ্যটিই প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

পুরাণ বলেন আদি দেবী দুর্গা মহাকালী, মহাসরস্বতী এবং মহালক্ষ্মী রূপা। অর্থাৎ সরস্বতী কিংবা লক্ষ্মী দুর্গারই রূপভেদ (isomorph)। কিন্তু বাঙলা দেশের দুর্গা প্রতিমায় যে লক্ষ্মীকে পাই, প্রচলিত সংস্কারে তিনি দুর্গার কন্যা। দার্শনিকভাবে ধরে নেওয়া হয় যে একসঙ্গে দেবীর রাজসিক, সাত্ত্বিক এবং

তামসিক রূপের পুজো এটি। কিন্তু 'কন্যা' কথাটি বোধহয় অন্য তাৎপর্যবহন করে। দুর্গা যদি পৃথিবী মাতা হন তবে শস্য হল তাঁর সন্তান। গ্রামবাঙলায় আজও লক্ষ্মীপুজোয় প্রতিমার পরিবর্তে ধানের বা শস্যের পুজো প্রচলিত। অর্থাৎ লক্ষ্মী হলেন শস্য। সেজন্যেই কি কৃষিজীবনের অনুষঙ্গে বাঙলাদেশে লক্ষ্মী তত্ত্বগতভাবে দুর্গার রূপভেদ হওয়া সত্ত্বেও পরিগণিত হন দুর্গার কন্যা হিসেবে?

প্রতীচীর ভাণ্ডারে খোঁজ করলে মা-মেয়ের এই ভেদাভেদের প্রশ্নটিও অভিনব মনে হয় না, যেমন অভিনব মনে হয় না দুর্গার সঙ্গে পৃথিবীর অভিন্নতা কিংবা দেবমাতা অদিতির সঙ্গে পৃথিবীর অভিন্নতা। যেহেতু পৃথিবী সারা বিশ্বের প্রাচীন ঐতিহ্যেই মাতৃকা হিসেবে পরিগণিত—"often the mother Goddess is chthonic, i.e. an earth deity, from whom all growing things come"[২০] এবং "...this Great Mother was thought of as identified with the bountiful fecund earth," তাই তাঁর সঙ্গে প্রজনন-শক্তি (জীব বা শস্যের) এবং যে কোনো কিছুর জন্ম বা উদ্ভবের সম্পর্ক ও কারণ সম্পর্কিত হয়ে যায়। এই পরমা জননী বা Great Mother-ই হয়ে ওঠেন দেবমাতা—"Thus the Great Mother evolved through the centuries into the totemic mother, the Mother of God,"[২১] ঋগ্বেদ দেবমাতা অদিতিকে বলেছেন পৃথিবী-রূপা। পুরাণ দুর্গাকে বলেন পৃথিবী-রূপা, পরমা জননী। সুতরাং অদিতি, পৃথিবী এবং দুর্গা অবস্থান করেন রৈখিকভাবে। এঁদের অভিন্নতা স্পষ্ট হয় যখন চণ্ডী বলেন—"ত্বং দেবজননী পরা।" (প্র. চ./১/৭৫)। প্রাচী ও প্রতীচীর ঐতিহ্য এখানে অবস্থান করে সমান্তরাল ভাবেই, যেমন সমান্তরাল অবস্থান চোখে পড়ে লক্ষ্মী ও দুর্গার ভেদাভেদের প্রশ্নে। Frazer এমন উদাহরণ দিয়েছেন গ্রীকদেবতাদের ক্ষেত্রে 'Demeter' এবং 'Persephone' হলেন—"the figures of the two goddesses, the mother and the daughter, resolve themselves into personifications of the corn."[২২] এক্ষেত্রে Demeter হলেন শস্যবীজের এবং Persephone হলেন শস্য-বৃক্ষের প্রতীক, যেখানে—"The essential identity of mother and daughter is suggested..."[২৩] মা ও মেয়ের প্রসঙ্গে শস্যবীজ ও বৃক্ষের এই প্রতীক আরোপের ক্ষেত্রে অপর একটি ব্যাখ্যারও উল্লেখ করেছেন তিনি—"The only alternative to this view of Demeter would seem to be to suppose that she is a personification of the earth from whose broad bosom the corn and all other plants spring up, and of which accordingly they may appropriately enough be regarded as the daughters."[২৪] Demeter-Persephone-র মতোই শস্যদেবী 'Attis' ও 'Lityerses' এর ভেদ-অভেদের অপর একটি উদাহরণ এনেছেন Frazer।[২৫] শস্যের জন্মদাত্রী পৃথিবীরূপা দুর্গা এবং লক্ষ্মী, যিনি শস্যের রূপেই পূজিত, উভয়ে একই ভাবে হয়ে উঠেছেন মা এবং মেয়ে। তাঁদের এই স্বতন্ত্র অস্তিত্বও তত্ত্বের মধ্যে এক হয়ে গেছে। Frazer-এর ভাষায় যা—"as if their separate individualities had almost merged in a single divine substance."[২৬] সুতরাং দুর্গা ও লক্ষ্মীর শাস্ত্রীয় স্তরে অভেদ রূপ এবং লৌকিক স্তরে মা-মেয়ের সম্পর্ক ভারতীয় ঐতিহ্যেই একক নয়, তেমন নজির জগতে আরও আছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে দেবী কল্পনার যে সাদৃশ্যের কথা বলেছি, সে সব ক্ষেত্রে এ জাতীয় সংস্কৃতিগুলির পারস্পরিক সমন্বয় বা প্রভাবের ফলেই যে এমন ঘটছে, তা বলতে চাই না। তেমন সম্ভাবনা থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। সভ্যতার বিকাশে মানব মনের যে দেশকাল নিরপেক্ষ সাধারণ চরিত্র লক্ষণীয় হয়ে ওঠে নানা পর্যায়ে, মনের সেই সামান্য ধর্মেরই বহিঃপ্রকাশ হল এই সাদৃশ্যের অন্তর্নিহিত কারণ। বিজ্ঞান সেই সামান্যধর্মকেই অনুসন্ধান করে নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য, ধর্ম বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে—আপাত বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেও।

সুতরাং একজন দেবী—যিনি আদি, নিত্য কিংবা সনাতনী, তিনি ভাগ হয়ে যান চরিত্রের আপাত ভিন্নতায়। ভাগ হয়ে যান সমাজ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে status, ধর্মের বিভিন্ন প্রস্থানে একাধিক রূপে। বেদের উষা সরস্বতী, অদিতি বা পৌরাণিক দুর্গা, চণ্ডী সরস্বতী, লক্ষ্মী প্রভৃতি তন্ত্রের মধ্যে হয়ে যান জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা, চণ্ডী বা চামুণ্ডা, দশমহাবিদ্যা। আবার এঁরাই দার্শনিক কৌলিন্য হারিয়ে লৌকিক স্তরে নেমে আসেন মঙ্গলচণ্ডী, মনসা গৌরী উমা হিসেবে, খানিকটা অধঃপাতিত (filtered down) হয়েই—যার প্রমাণ বাঙলার মঙ্গলকাব্যগুলি। স্বর্গীয় পরিমণ্ডল ছেড়ে, দার্শনিক ব্যাখ্যার কুয়াশার আড়াল থেকে এঁরা বেরিয়ে আসেন মাটির কাছাকাছি। হয়ে ওঠেন বন্য-পশুকুলের রক্ষয়িত্রী চণ্ডী, সর্পদেবী মনসা কৃষিজীবী স্বামীর ঘরণী—যিনি ভালো বাসেন শাঁখা পরতে, সাহায্য করেন স্বামীর কৃষিকর্মে, প্রতিপালন করেন

সংসার নানা অভাব অনটনের মধ্যে। অর্থাৎ সুরলোক, কৈলাস পর্বত কিংবা বিষ্ণুর নাভিপদ্মে নিশ্চিন্ত যোগনিদ্রা ছেড়ে প্রত্যক্ষত যুক্ত হয়ে যান কৃষিজীবী সমাজের সঙ্গে, কৃষিকর্ম বা শস্যের সঙ্গে কিংবা গ্রামজীবনের আচার-অনুষ্ঠান, আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে। ফ্রাই যে "...earth...a female figure" বা "a divine figure"—এর কথা বলেন তাকে খুঁজে পাওয়া যায় প্রাচীর ভাবনায়—আমাদের দেবী দুর্গা তার সমস্ত রূপভেদের সমন্বিত চেহারা নিয়েই হয়ে যান আদিমাতা, পৃথিবীমাতা। তাই শুধু দুর্গা নন তাঁর সমস্ত রূপভেদ-জাত দেবীরাই সম্পর্কিত হয়ে পড়েন আমাদের সমাজ-চরিত্রের সঙ্গে।

Frye মানুষের সাধারণ প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত করেন যেটি, তা হল—

"There is a curious tendency in human life to imitate some of the aspects of 'lower' forms of existance, like the rituals which imitate the subtle synchronizations with the rhythms of the turning year that vegetable life makes."[২৭] এই প্রবণতার ভিত্তিতে এবং ভূমি-মাতার পরিকল্পনার সাপেক্ষে তিনি উদ্ভিদ-জীবন, সৌর আবর্তন কিংবা জৈব-জীবন ইত্যাদির সাহায্যে একটি পূর্ণ আবর্তন-চক্রের ইঙ্গিত দেন আর তাঁর মতে সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার (Literary Genre) উদ্ভবের বীজ সেখানেই নিহিত—

"The divine activity is usually identified or associated with one or more of the cyclical process of nature. The God may be a sun-god, dying at night and reborn at dawn, or else with an annual rebirth at the winter solstice, or he may be god of vegetation, dying in autumn and reviving in spring, or (as in the birth stories of the Buddha) he may be an incarnate god going through a series of human or animal life-cycle" [২৮] যে প্রাকৃতিক-চক্রের সঙ্গে দেবদেবীদের কর্মপদ্ধতিকে সংযুক্ত করেন, তাঁর মতে সেই চক্র হল—

"These cyclical symbols are usually divided into four main phases, the four seasons of the year being the type for four periods of the day (morning, noon, evening, night) four aspects of the water-cycle (rain, mountains, rivers, sea or snow) four periods of life (youth, maturity, age, death) and the like,"[২৯]

প্রাকৃতিক-চক্রের যে পর্যায়গত বিভাজন এখানে পাওয়া যাচ্ছে তা মূলত পাশ্চাত্যের প্রাকৃতিক পরিবেশ সাপেক্ষে। তাই এদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভাবতে গেলে Frye-এর মতকে সামান্য পরিমার্জনা করে নিতে হয় আমাদের ঋতুচক্র এবং উদ্ভিদ-জীবনচক্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই, পাশ্চাত্যের ঋতুচক্রে চারটি ঋতু কিন্তু আমাদের ছটি। এই ছটি ঋতুর সঙ্গে সংযোগ রেখেই আমাদের কৃষির ছটি পর্যায় ভাগ করে নেওয়া যায়, বলা বাহুল্য তা অবিমিশ্রভাবেই Frye নির্দেশিত 'Vegetable cycle' নয়। অর্থাৎ যেটি বলতে চাইছি, তা হল—আমাদের ছটি ঋতুর আবর্তনের সঙ্গে আমাদের কৃষিকর্ম বা শস্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায় জড়িত হয়ে আছে, আর আমাদের দেবীভাবনা, আচার-অনুষ্ঠান অথবা ঋতুভেদে দেবীপুজোর যে ঐতিহ্য তা সম্পর্কিত হয়ে আছে উক্ত পর্যায়গুলোর সঙ্গে।

শুধু দেবী-পরিকল্পনায় নয় ছটি ঋতুর এই বিভাজনকে জৈবজীবন-চক্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে Frye-এর ইঙ্গিতকে মেনে। মানুষের জীবনচক্রেরও আমরা ছটি ভাগ নির্দেশ করতে পারি—১) জন্ম, ২) কৈশোর, ৩) যৌবন, ৪) প্রৌঢ়ত্ব, ৫) বার্ধক্য, ৬) মৃত্যু। কিন্তু সৌর বিবর্তনের পর্যায়গুলোর ক্ষেত্রে অবিমিশ্রভাবে আমরা সাদৃশ্য খুঁজে পাই না দেবী কল্পনার ক্ষেত্রে, যদিও সূর্যের একটি পরিক্রমণকে আমরা ছটি ভাগে ভাগ করতে পারি —১) ঊষা, ২ দিবা ভাগ, ৩) মধ্যাহ্ন, ৪) অপরাহ্ন, ৫) সায়াহ্ন, ৬) রাত্রি। কিন্তু হিন্দুধর্মীয় প্রধানে এই সৌরআবর্তনচক্র মুখ্যত তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়াহ্ন—এই তিনটি মূল বিভাজনের ভিত্তিতে আমাদের দেবী-কল্পনা বিন্যস্ত। ব্রাহ্মণের উপাস্যা গায়ত্রী দেবী তাই প্রাতে কুমারী রূপা, মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপা এবং সায়াহ্নে বৃদ্ধা, শিবরূপা। অর্থাৎ সকালে যিনি কুমারী, মধ্যাহ্নে তিনি যৌবনবতী, সায়াহ্নে বৃদ্ধা আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর যদি সৃজন, পালন এবং সংহারের প্রতীক হন তবে কুমারী হয়ে ওঠেন সৃজনের প্রতীক। বৈষ্ণবী পালনের এবং শিবা সংহারের প্রতীক হয়ে ওঠেন। এই একই ব্যঞ্জনা লক্ষণীয় জগদ্ধাত্রীর একদিনে তিনবার—সকাল, দুপুর এবং রাতে পুজোয় তিনটি রূপের পরিকল্পনায়—

প্রাতশ্চ সাত্ত্বিকী পূজা মধ্যাহ্নে রাজসী মতা।

সায়াহ্নে তামসীপূজা ত্রিবিধা পরিকীর্ত্তিতা॥৩০

সুতরাং Frye-এর তত্ত্ব অনুসারে সৌরআবর্তনচক্রকে প্রত্যক্ষভাবে দেবী পরিকল্পনার সঙ্গে সংযুক্ত করা না গেলেও পরোক্ষ একটা যোগ সূত্র থেকেই যায়। যে কথা আগে বলেছি যে আদিমাতা দুর্গা যদি মূলত পৃথিবীমাতা হন তবে তাঁর রূপভেদের কল্পনায়ও ভারতীয় কৃষিভিত্তিক জীবনধারার প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে। ঋতুচক্রের সঙ্গে দেবী পরিকল্পনা বা দেবী উপাসনার এই সংযোগ সূত্রটি ভেবে দেখা যেতে পারে। এ আলোচনায় হিন্দুদেবীদের প্রত্যেকের প্রসঙ্গ আলোচনা সম্ভব নয়—তা বলাই বাহুল্য। দেবীদের সংখ্যাধিক্যের কথা মনে রেখে শুধু মাত্র প্রতিনিধি স্থানীয় কিছু দেবীদের উদাহরণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে। যদিও আলোচিত সব দেবীই ব্যাপক-ভাবে জনপ্রিয় বা প্রচলিত নন কিংবা অনেকেরই পূজো আজ প্রচলিত নেই, তবু তাঁদের পরিকল্পনার তত্ত্বগত ভিত্তিকে অবলম্বন করেই সূচনা করা যেতে পারে এ আলোচনার।

পাশ্চাত্যের প্রাকৃতিক পরিবেশে Spring হল নবজীবনের দ্যোতক। Summar যৌবনের, Autumn বার্ধক্যের এবং Winter মৃত্যুর। এই বিভাজনের মূলভিত্তি উদ্ভিদ-জীবনচক্রের পর্যায়গুলো। বসন্তে যে অঙ্কুরোদ্গম তার মধ্যে নবজন্মের বা জীবনের আভাস গ্রীষ্মে তার যৌবনপ্রাপ্তি, শরতে বার্ধক্য এবং শীতের তুষারপাতে তার মৃত্যু। কিন্তু প্রাচ্যের ঋতুচক্র তেমন নয়। যদিও আমাদের বর্ষ সূচিত হয় গ্রীষ্মে কিন্তু এ ঋতু বহন করে মৃত্যুর দ্যোতনা। অগ্নিদগ্ধ প্রকৃতি নবজীবন পায় বর্ষায়। গ্রীষ্মের তাপে উদ্ভিদের মৃত্যু। বর্ষার জলে বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম। শরতে যে অঙ্কুর বেড়ে ওঠে তারুণ্যের সজীবতা নিয়ে, হেমন্তে তার যৌবনোদ্গম। শীতে শস্যসম্ভারের পূর্ণতায় আসে প্রৌঢ়ত্ব। বসন্তে যখন ফসল কেটে ঘরে আনা হয় তখন তা বহন করে বার্ধক্যের ব্যঞ্জনা। শেষে গ্রীষ্মের খরতাপে আসে মৃত্যুর আভাস।

পৃথিবীমাতা যিনি বীজকে সযত্নে লালন করেন 'Summer Demon'-এর হাত থেকে বর্ষায় তিনি হয়ে ওঠেন রজস্বলা। পিতা দ্যৌ-এর সঙ্গে মিলনে ঘটে শস্যের জন্ম—শস্যে অঙ্কুরোদ্গম। কর্দম ষষ্ঠী, লুণ্ঠন ষষ্ঠী প্রভৃতি শাস্ত্রীয় ষষ্ঠী পুজো কিংবা মেয়েদের ষষ্ঠীব্রত তাই এসময় শুধুমাত্র সন্তানের কল্যাণকামনাই হয়ে ওঠে না, শস্য সন্তানের নির্বিঘ্ন জাতকর্মের ইঙ্গিতও বহন করে। শস্য যখনও জন্মায়নি,

অঙ্কুরোদ্গমের মধ্যে দিয়ে প্রত্যাশা জেগেছে মাত্র, তখন আমরা কল্পনা করি শাকম্ভরীর—যিনি বৃষ্টি পর্যন্ত শাকপত্রাদি দিয়ে আমাদের পালন করেন। চণ্ডী বলেন—

ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ॥ (উ./১১/৪৮)

বর্ষা ঋতুর সঙ্গে শাকম্ভরীর এই পরিকল্পনা তাই নিছক কাক-তালীয় নয় বরং সম্পর্কযুক্ত।

শরতে অঙ্কুর থেকে বেড়ে ওঠে গাছ। শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তীর্ণ সন্তানের মতোই। আমাদের শরৎকালীন কেন্দ্রীয় উৎসবের উপলক্ষ্যও হয়ে ওঠে এই শস্য বা ওষধি বৃক্ষের পুজো— নবপত্রিকা পুজো। শরতের দুর্গাপুজোর কেন্দ্রীয় রূপ হল এই নবপত্রিকা পুজো। প্রমাণ মেলে যখন স্মার্ত রঘুনন্দন বলেন— "যদা তু পত্রিকা পুজা ন পর্বেদুরভবিষ্যতি"। (দুর্গোৎসব তত্ত্ব) ভূমি-মাতা দুর্গা কিংবা শস্যদেবী লক্ষ্মী একাকার হয়ে যান এই নব পত্রিকার মধ্যে। দুর্গাপুজোর যে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাই প্রচারিত হয়ে থাকুক আমাদের শরৎ ঋতুর আরাধ্যা দেবী হয়ে যান নবপত্রিকা, কৃষিজীবী সমাজের অনুষঙ্গেই।

হেমন্তে শস্যের উদ্গম হয়। পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত গাছে শস্য-সম্ভানের উদ্গমে ভবিষ্যৎ সুখের, নির্বিঘ্ন শস্যপ্রাপ্তির স্বপ্ন দেখে মানুষ। সেই প্রত্যাশার সার্থকতা জনিত কামনাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে দীপান্বিতা লক্ষ্মীর পরিকল্পনায়। হেমন্তের কালীপুজো যে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের অনুবর্তন সে কথা আগেই বলেছি। কিন্তু শুধু লক্ষ্মীই নন, হেমন্তে পূজিতা জগদ্ধাত্রী— যিনি অনন্ত ঐশ্বর্য নিয়ে রাজ-রাজেশ্বরী, সেই পূর্ণবৈভব মূর্তি দ্যোতনা পায় মাঠ ভরা ফসলের, পূর্ণতার। যৌবনোচ্ছলা ষোড়শীর কল্পনাও যেন মিলে যায় এর সঙ্গে।

পৌষ এবং মাঘে শীত ঋতুর মধ্যে দিয়ে আসে জীবনের নতুন প্রত্যাশা। পাকা ফসলে ভরে ওঠা ডালা এবার ঘরে আনার পালা। শস্যই যদি লক্ষ্মী হন তবে এতো লক্ষ্মীকেই ঘরে আনা, পালি ভরা ধান, গুচ্ছ বাঁধা ধানের শীষে সেদিন তাই পৌষ লক্ষ্মীর পুজো। অপর দিকে মাঘের সরস্বতী পুজোও বস্তুত লক্ষ্মীরই পুজো রঘুনন্দনের নির্দেশে "পঞ্চম্যাং—পুজয়েল্লক্ষ্মীং" (তিথিতত্ত্বম্) থাকলেও এই লক্ষ্মীপুজো কালানুক্রমিক বিবর্তন ও সামাজিক কারণের সাপেক্ষে সরস্বতী পুজো হয়ে উঠেছে কিন্তু আচারের মধ্যে আজও স্থান পেয়ে গিয়েছে নানা জিনিস— যবের শীষ, আমের বোল, পলাশ ফুল কিংবা সরস্বতীর আগে লক্ষ্মীর পুজোর

রীতি। অর্থাৎ শীত ঋতুতে লক্ষ্মী আমাদের আরাধ্যা হয়ে ওঠেন এককভাবেই। এর পাশাপাশি দেখা যেতে পারে যে, ভুবনেশ্বরীর ব্যক্তিত্বময়ী ও ঐশ্বর্যশালিনী রূপের মধ্যে যেমন আছে প্রৌঢ়ত্বের আভাস তেমনি পূর্ণতার আভাসও আছে।

শস্যের প্রাপ্তিতে নিশ্চিন্ত গ্রামবাসী ফসল তুলে রাখে গোলায়। বসন্তে এই গোলাভরা ধানের সামনে তার নিশ্চিন্ত বিশ্রাম, আনন্দ উৎসব। বসন্তকালে পূজিত দেবীদের রূপ পরিকল্পনায়। তাই এই ঐশ্বর্যময়তা প্রকাশ পায়। বাসন্তী কিংবা অন্নপূর্ণার রাজকীয় মহিমা অর্থবহ হয়ে ওঠে গ্রামবাঙলার পরিমণ্ডলে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় 'অন্নপূর্ণা' নামটিও। অন্নদানে নিরতা অন্নপূর্ণার বৈভব স্মরণ করায় শস্যসম্পদে ঋদ্ধ গ্রামবাঙলাকে। অপরদিকে দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত ধূমাবতী—যিনি বৃদ্ধা এবং কুলো হাতে ফসল ঝাড়েন, তাঁর সঙ্গেও একটা অস্পষ্ট সংযোগ তৈরি হয় বসন্ত ঋতুর। বাসন্তীর কিংবা অন্নপূর্ণার ঐশ্বর্যময় রূপ কিংবা ধূমাবতীর পরিকল্পনা তাই একাকার হয়ে যায় বসন্তকালের সঙ্গে, ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে।

বসন্তের শেষে চৈত্র লক্ষ্মীর পুজোর মধ্যে দিয়ে যেন আগত বছরে নির্বিঘ্ন ফসল প্রাপ্তির প্রত্যাশা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বসন্তের শেষে গ্রীষ্মের কঠিন তাপে, শস্যরিক্ত মাঠ পরিত্যক্ত শবের মতোই পড়ে থাকে। প্রকৃতির এই নগ্ন রূপ রুক্ষ, তৃষিত রূপের আভাস আছে আমাদের দেবী-কল্পনায়ও। গ্রীষ্মকালে লোকজীবনে যে পুজোটি ব্যাপক প্রচলিত তা হল মঙ্গলচণ্ডী বা চণ্ডীর পুজো অথবা ব্রত। চণ্ডী তাই এই প্রাকৃতিক অনুষঙ্গে মিলে যান কালীর সঙ্গে। তিনি হয়ে ওঠেন "রক্তবীজাশনী" অথবা "কালী করালবদনা···শুষ্ক মাংসাতি ভৈরবা" এবং অভিন্ন হয়ে যান কালীর সঙ্গে—"কালীং রত্ন নিবদ্ধ-নূপুর-লসৎ পাদাম্বুজা-মিষ্টদাং"[৩১]। কালী,তারা, চণ্ডী, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি দেবীদের পরিকল্পনার সঙ্গে এই গ্রীষ্মের প্রকৃতির একটা আবছা সাদৃশ্য বার বারই চোখে পড়ে। অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ কিংবা শস্যহীনতায় আমাদের কল্পনা গড়ে তোলে এমনই অনেক দেবীকে—রক্তদন্তিকা বা শতাক্ষীকে। চণ্ডীতে পাই—

"ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যা মনাবৃষ্ট্যা মনম্ভসি।
মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সম্ভবিষ্যাম্যযোনিজা" (উ১/১/৪৬)

গ্রীষ্মের প্রকৃতির রুক্ষরূপের সঙ্গে আমাদের দেবী কল্পনারও প্রত্যক্ষ সংযোগ এর দ্বারা প্রমাণিত হয়। বলা বাহুল্য এর সঙ্গে সংপৃক্ত হয়ে আছে মৃত্যুর একটা ব্যঞ্জনা।

সুতরাং আদিমাতা দুর্গা মূলত ভূমাতা বা পৃথিবী-মাতা হলেও তার সমস্ত রূপভেদের পরিকল্পনার সঙ্গে কৃষিভিত্তিক জীবনধারার প্রত্যক্ষ সংযোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এরই সঙ্গে সৌরআবর্তনচক্র কিংবা জৈবজীবনচক্রেরও একটা আবছা সাদৃশ্য চোখে পড়ে। একটি সারণীর মধ্যে আমরা সাজিয়ে দিতে পারি আলোচিত পর্যায়গুলো।

ঋতুচক্র	সৌরআবর্তনচক্র		জৈবজীবন চক্র		দেবী-কল্পনা
বর্ষা	উষা	প্রাতঃ	জন্ম	সাত্ত্বিকী, ব্রাহ্মী	শাকম্ভরী, ষষ্ঠী।
শরৎ	পূর্বাহ্ন		কৈশোর	(সৃষ্টিরূপা)	নবপত্রিকা।
হেমন্ত	মধ্যাহ্ন	মধ্যাহ্ন	যৌবন	রাজসী, বৈষ্ণবী	জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, ষোড়শী।
শীত	অপরাহ্ন		প্রৌঢ়ত্ব	(পালন কর্ত্রী)	লক্ষ্মী, ভুবনেশ্বরী।
বসন্ত	সায়াহ্ন	সায়াহ্ন	বার্ধক্য	তামসী, শিবা	অন্নপূর্ণা, ধূমাবতী, চণ্ডী, কালী, তারা
গ্রীষ্ম	রাত্রি		মৃত্যু	(সংহাররূপা)	ছিন্নমস্তা, শতাক্ষী।

Frye যে Archetype-এর কথা বলেছিলেন, তার যথাযথ প্রয়োগ প্রাচীর জীবন ও মননধারার সাপেক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সে তত্ত্বের ভাববস্তুকে গ্রহণ করে আমরা একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। যদিও এ আলোচনার পরিমণ্ডলকে মূলত বাঙলাদেশেই সীমাবদ্ধ রেখেছি তবু এই বিশ্লেষণ সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বাঙলাদেশের প্রচলিত সংস্কারে ব্যাপকভাবে গৃহীত দেবীদের বা আচার অনুষ্ঠান নিয়েই এ আলোচনা সীমাবদ্ধ এবং পৌরাণিক ও তান্ত্রিক দেবীদের একত্রিত করেই উদাহরণ দিতে চেষ্টা করেছি। এককভাবে বৈদিক, তান্ত্রিক বা পৌরাণিক দেবদেবীদের নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা হলে আরও স্পষ্ট ধরা পড়তে পারে আমাদের দেবতা পরিকল্পনার স্বরূপটি। বলা বাহুল্য আমাদের আচার-অনুষ্ঠান; ব্রত কিংবা লোকাচারের বিশ্লেষণ থেকেও বেরিয়ে আসে ভারতীয় কৃষিভিত্তিক জীবনধারার স্বরূপটি। ধর্মের অনুষঙ্গে আমাদের মানসিকতার ছবিই শুধু পাওয়া যায় না এ বিশ্লেষণ থেকে, দেশকাল নিরপেক্ষভাবে মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতার সাধারণ মানদণ্ডে আমরা মিলিয়ে নিতে পারি নিজেদের ঐতিহ্যকে। তবে সে ব্যাপক আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। Frye-এর নির্দেশিত পথে যে বিষয়ের অবতারণা করেছি[৩২] তাতে এটুকু স্পষ্ট যে জগতের

সমস্ত প্রাচীন সভ্যতার মতোই আমাদের হিন্দুধর্ম-প্রস্থানে পৃথিবীমাতার পরিকল্পনা নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মিশে গিয়েছিল দুর্গার সঙ্গে এবং দুর্গার সমস্ত রূপভেদের পরিকল্পনা আপাত ভিন্ন হলেও সম্পর্কিত হয়ে আছে আমাদের জীবনধারার মৌল চরিত্রের সঙ্গে। জৈবজীবনচক্র ও সৌরআবর্তনচক্র কিংবা উদ্ভিদজীবনচক্রের সঙ্গে আমাদের দেবীকল্পনার মূল ভাবনাটি একাকার হয়ে যায় একটি বলয়ের মতো। লেভি স্ট্রোস "mechanism of all human brains"-এর সাপেক্ষে এবং একাধিক "cultural milieu"-র মধ্যে যে সাধারণ প্রবণতার কাঠামোর কথা বলেন, যাকে আঙ্কিক নিয়মেই ("algebraic transformation") প্রতিস্থাপন করা চলে এক পরিমণ্ডল থেকে অপর পরিমণ্ডলে, তার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয় এ আলোচনা থেকেই। অনুভব করা যায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে এর সার্থকতাকে।

প্রাসঙ্গিক সূত্র

১. Leach, Edmund ; *Lévi-Strauss* (London, 1972), pp. 52-53

২. ঋগ্বেদে ১০ ম মণ্ডলের ১২৫ সংখ্যক সূক্তটি 'বাকে'র আত্মপরিচয় জ্ঞাপক এটি 'দেবীসূক্ত' হিসেবে পরিচিত।

৩. এ দুটি শ্লোক পুরাণোক্ত দুর্গাস্তোত্রের অন্তর্গত। দ্রষ্টব্য গম্ভীরানন্দ সং, 'স্তবকুসুমাঞ্জলি' (কলকাতা, ?) ৭ম সংস্করণ, পৃ. ৩৪৮।

৪. Frye, Northrop ; *Anatomy of Criticism* (U. S A., 1971), p. 183.

৫. Edmonson, Munro S. ; *Lore* (U. S. A., 1971), p 62 ;

৬. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ ; 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' (কলকাতা, ১৩৮৭) পৃ ১৫।

৭. Thompson, Stith ; Mother-worship, mariology in Leach Mariaed.. *Dictionary of Folklore mythology and Legend* (New York, 1950), Vol-2, p. 752.

৮. Frazer, James George ; *The Golden Bough* (London, 1957), vol II, p. 504

৯. সেন, সুকুমার ; "দুর্গাপ্রতিমার কথা," দ্রষ্টব্য সরকার, অভাক, সং ; 'আনন্দবাজার পত্রিকা' [দৈনিক] (কলকাতা, ১৯৮৩), ১৩ অক্টোবর, ক্রোড়পত্র, পৃ. ৩।

১০. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ ; 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' (কলকাতা ১৩৮৭), পৃ. ১৮।

১১. Jobes, Gertrude ; *Dictionary of Mythology Folklore and Symbols* (New York, 1961) Part I, p. 485

১২. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ ; 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' (কলকাতা ১৩৮৭), পৃ. ১৮।

১৩. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ ; "বেদ ও বেদব্যাখ্যা" দ্রষ্টব্য চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার প্রভৃতি সং. 'হরপ্রসাদ রচনাবলী' (কলকাতা. ১৯৬০). ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯০

১৪. প্রবন্ধে ব্যবহৃত বেদের সমস্ত উদ্ধৃতি নিয়েছি হরফ প্রকাশনী প্রকাশিত 'ঋগ্বেদ সংহিতা' থেকে।

১৫. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ ; 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' (কলকাতা, ১৩৮৭), পৃ. ১৯।

১৬. প্রবন্ধে ব্যবহৃত 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ' বা 'চণ্ডীর' উদ্ধৃতিগুলো নিয়েছি উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' থেকে। 'নারায়ণোপনিষৎ'-এর উদ্ধৃতি বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 'উপনিষদ গ্রন্থাবলী', 'কালিকা পুরাণের' উদ্ধৃতি বঙ্গবাসী সংস্করণ এবং 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র উদ্ধৃতি এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত সংস্করণ থেকে নিয়েছি। প্রাসঙ্গিক সূত্র দীর্ঘায়ত না করে উদ্ধৃতিগুলির শ্লোক সংখ্যা তাদের পাশেই প্রথম বন্ধনীর দেওয়া হল ; বিস্তারিত উৎস নির্দেশ দেওয়া হল না। এক্ষেত্রে নির্দেশিত প্র. হল প্রথম, ম. হল মধ্যম, উ. হল উত্তর এবং চ হল চরিত্র (চণ্ডীর উদ্ধৃতিগুলিতে ব্যবহৃত)।

১৭. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ ; 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' (কলকাতা ১৩৮৭), পৃ. ২৩।

১৮. Frye, Northrop ; *Anatomy of criticism* (U. S. A., 1971), p. 160

১৯। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ ; 'হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান' (কলকাতা, ১৩৭৭), পৃ. ২২ এবং বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচকড়ি ; "শ্রীশ্রীকালী-

পূজা', দ্রষ্টব্য রায়, অমরেন্দ্রনাথ, সং : "বাঙ্গালীর পূজা-পার্ব্বণ," (কলকাতা, ১৩৫৬), পৃ. ৫৭।

২০. Potter, Charles Francis ; "Mother Goddess" in Leach Mariaed. *Dictionary of Folklore Mythology and Legena* (New York, 1950), vol. 2, p. 751.

২১. Thompson, Stith ; "Mother-worship, mariology" in Leach Mariaed. *Dictionary of Folklore mythology and Legend* (New York, 1950), p. 752.

২২. Frazer, James George ; *The Golden Bough* (London, 1957) vol. II, p. 520.

২৩. পূর্বোক্ত সূত্র , p. 524.

২৪. পূর্বোক্ত সূত্র , p. 523.

২৫. পূর্বোক্ত সূত্র , p. 579.

২৬. পূর্বোক্ত সূত্র , p. 524.

২৭. Frye, Northrop ; *Anatomy of criticism* (U. S. A., 1971) p. 343.

২৮. পূর্বোক্ত সূত্র , p. 158-159.

২৯. পূর্বোক্ত সূত্র , p. 160.

৩০. ভট্টাচার্য সুরেন্দ্রনাথ সংকলিত ; 'সর্ব্বদেবদেবী পূজাপদ্ধতি' (কলকাতা, ১৩৫৫), পৃ. ২১০.

৩১. তিনটি উদ্ধৃতির জন্যে দ্রষ্টব্য স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সং ; 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' (কলকাতা, ১৩৬৯), পৃ. ১০, পৃ. ২৩০-৩১ এবং পৃ. ৯।

৩২. এ প্রবন্ধে উপস্থাপিত বক্তব্যের দায় সম্পূর্ণত আমার হলেও তত্ত্ব ও তথ্যের ক্ষেত্রে সোৎসাহ সহায়তা পেয়েছি এবং আলোকিত হয়েছি আমার অধ্যাপিকা ডঃ নবনীতা দেবসেন ও আমার অধ্যাপক ডঃ পবিত্র সরকারের কাছে। এ বিষয়ে আমার আগ্রহ সঞ্চার করে ও প্রসঙ্গ বিশেষে আলোচনার সুযোগ দিয়ে সস্নেহ প্রশ্রয় দিয়েছেন ডঃ শ্রীজীবন্যায়-তীর্থ এবং ডঃ সুকুমার সেন। এঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার আমার ঔদ্ধত্যের নামান্তর।

আলোচনা

দুর্নীতি ও তার প্রতিকার

বিচিত্র গুপ্ত

দেশ স্বাধীন হওয়ার মুখে আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সেই ঐতিহাসিক উক্তি সকলেরই মনে আছে। ব্ল্যাকমার্কেটারকে নিকটস্থ লাম্পপোস্টে ঝুলানো হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটিও ব্ল্যাকমার্কেটারকে আলোকস্তম্ভে ঝোলানো হয়নি। বোধ হয় পণ্ডিত নেহেরুর আত্মাকে তাঁর শপথ বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই ব্ল্যাকমার্কেট কথাটাই আমাদের অভিধান থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। 'ব্ল্যাকমার্কেট' বা 'কালোবাজার' কথা চলে গিয়ে তার জায়গায় এসেছে 'খোলাবাজার'। 'ব্ল্যাকমার্কেট প্রাইস্' এসেছে 'প্রিমিয়াম প্রাইস্'। 'ফেয়ার প্রাইস্ শপ'-ও কিছু কিছু দেখতে পাই। তাহলে বাকি সব দোকানগুলি কি 'আনফেয়ার প্রাইস্ শপ'? তারপরই আবার প্রশ্ন আসে এই 'আনফেয়ার প্রাইস্ শপ গুলি চলছে কি করে? সরকারই বা কি করে এদের বরদাস্ত করছেন?

রাষ্ট্রক্ষেত্র বা বাণিজ্যক্ষেত্র যে কোন ক্ষেত্রই হোক না কেন সব নীতির পেছনে একটা অর্থনৈতিক কারণ কাজ করে। অর্থনীতির খেলার 'ফাইনাল'টা দেখা যায় 'মার্কেট প্লেসে' বা বাজার ক্ষেত্রে যেখানে সাধারণ মানুষকে কেনাকাটা করতে হয়। বাজারের রং যাই হোক না কেন, খোলা বন্ধ যে নামেই তাকে ডাকা যাক্ না কেন, এখানকার ফাইনাল খেলার আগে অনেক ঘটনাই ঘটে যায় যার জন্য বাজারের দর চড়ে। প্রশাসনে, ব্যবসা-পরিচালনায় এবং জনসাধারণের জীবনে এত দুর্নীতি এমন গভীর এবং ব্যাপক ভাবে কাজ করছে

যে তারই ফলে চড়া দাম—ন্যায্য পাওনার চেয়ে বেশ কিছু বেশি দিতে হয় অথবা নিজের ন্যায্য পাওনা আদায় করতে কিছু গুণাগার দিতে হয়। দোষ কার বা দায়ী কে জিজ্ঞেস করলে দেখা যাবে একজন আরেকজনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন। ক্রেতারা অসাধু ব্যবসায়ীদের দোষ দেন; ব্যবসায়ী দুর্নীতি-গ্রস্ত সরকারী কর্মচারীকে দায়ী করছেন। তারপরই আসছেন পলিটিসিয়ান বা রাজনীতিওয়ালারা।

একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে অসাধু-ব্যবসায়ী, বেসরকারী কর্মচারী, সরকারী কর্মচারী, রাজনীতিওয়ালা এবং সাধারণ নাগরিক সকলেই মিলেমিশে দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মপ্রবাহে সুন্দর একটা 'সিষ্টেম' তৈরি করেছেন। তাই বিচ্ছিন্ন-ভাবে কাউকে না দেখে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমস্যাটির দিকে তাকানো ভাল। এ দের প্রত্যেকেই একজন আরেকজনকে কাজে লাগান। দুর্নীতির রঙ্গমঞ্চে প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ ভূমিকা আছে এবং প্রকৃতপক্ষে একজন আরেকজনের পরিপূরক। আলোচনার খাতিরে আরম্ভ করা যাক্ একজন অসাধু ব্যবসায়ীকে দিয়ে। একজন অসাধু ব্যবসায়ীর বেসরকারী সংস্থায় একজন অসাধু কর্মচারী দরকার। এই অসাধু বেসরকারী কর্মচারীর অস্তিত্ব নির্ভর করছে একজন অসাধু সরকারী কর্মচারীর উপর। এই অসাধু ছোট সরকারী কর্মচারীর আবার দেখা যাবে একজন 'গড্‌ফাদার' আছেন যিনি বেশ একজন হোমড়া-চোমড়া অফিসার। আবার উচ্চ পদস্থ অফিসারটিরও যোগ রেখে চলতে হয় কোন মন্ত্রী বা পার্টির দাদার সঙ্গে। দুষ্টচক্রটি আরম্ভ করা হয়েছিল অসাধু ব্যবসায়ী থেকে এবং শেষ হোল রাজনীতিওয়ালাতে। কিন্তু এই চক্রটি যে-কোন বিন্দু থেকে আরম্ভ হতে পারে এবং বিপরীত দিকেও ঘুরতে পারে।

বিদেশী শাসন ব্যবস্থা থেকে আমাদের দেশ উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু আইন-কানুন পেয়েছে এবং আধুনিক প্রশাসনের প্রয়োজনে আরও নিয়মবিধি প্রচলন করা হয়েছে। আমাদের দেশে লোকসংখ্যা বেশি কিন্তু তার তুলনায় জিনিসপত্র বা সেবামূলক ব্যবস্থা (service facilities) অনেক কম। সব কিছুতেই ঘাটতি। কেরোসিন তেল, রান্নার গ্যাস থেকে আরম্ভ করে, শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল—সব কিছুতেই নেই নেই ভাব। সার্ভিস ফেসিলিটিজ এর কথা? ছেলে-মেয়েদের স্কুল কলেজ, রুগীর জন্য হাসপাতাল, ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি, টেলিফোন সব জায়গাতেই যোগানের চেয়ে চাহিদা বেশি। সাধারণ নাগরিক যদি ন্যায়-নীতির কঠোর পথে অবিচল থেকে চেষ্টা চালিয়ে যান তাহলে দেখা যাবে যে

তাঁর ভাগ্যে কিছুই জুটছে না। কাজেই বুদ্ধিমান নাগরিক ন্যায়নীতির দুরূহ পথ বর্জন করে উপরোক্ত যে কোন একজনকে অবলম্বন করে ঐ দুষ্টচক্রে ঢুকে নিজের কাজটি সহজে উদ্ধার করেন। ঐ দুষ্টচক্রে কার সঙ্গে যোগস্থাপন করতে হবে তার জন্য উপদেষ্টা বা পথ প্রদর্শকও পাওয়া যাবে। পুরো ব্যাপারটাই বেশ 'ইন্‌ষ্টিটিউশানালাইজ্‌ড্' হয়ে গেছে। তাই আজকাল বাজারে একটা কথা বেশ চালু হয়ে গেছে—'এবিলিটি টু কোরাপ্ট্ আদারস্ ইজ দ্য কী টু সাক্সেস্' অর্থাৎ অপরকে দুর্নীতিগ্রস্ত করতে পারার মধ্যেই আছে সাফল্যের চাবিকাঠি।

দু একটা উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে। ধরা যাক্ কোন একটি প্রতিষ্ঠান এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মাল পাঠাবেন। একজন সৎ বিবেকবান কর্মচারীকে রেল অফিসে পাঠানো হোল রেল ওয়াগনের জন্য। এদিকে রেল ওয়াগন পাওয়া বেশ কষ্টকর কেননা সরবরাহের তুলনায় চাহিদা বেশি। বিবেকবান কর্মচারী পরিস্থিতির যুক্তি গ্রহণ করলেন এবং নিজের সততার নীতিতে অনড় থেকে হতাশ হয়ে ফিরে এলেন। এবার অফিস থেকে আরেকজনকে পাঠানো হোল 'যিনি বেশ চালাক চতুর এবং প্রয়োজনবোধে বিবেককে হিমঘরে জমা রেখে চলতে পারেন। তিনি সুবিধেমত ঐ পূর্বোক্ত চক্রে ঢুকে কয়েকটি রেল ওয়াগনের স্পেশাল এ্যালট্‌মেণ্ট করিয়ে এলেন। এরপর অফিসে ঐ দ্বিতীয় ভদ্রলোকটিকে নিয়ে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। তাঁর পদোন্নতিও ঘটলো। এ রকম ব্যাপার ঘটে নানারকম 'পারমিট' সংগ্রহের বেলায়। সে-ই তো কাজের লোক যে যেন তেন প্রকারেণ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে পারে, যেমন তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরোহিত যাঁর হাত থেকে দেবতা নৈবেদ্য গ্রহণ করেন অর্থাৎ দেবতাকে নৈবেদ্য গ্রহণ করানোর কৌশলটা যাঁর জানা আছে।

দেশে দুর্নীতি বাড়ার একটা কারণ বোধহয় দুর্নীতির প্রতি সামাজিক উদাসীন বা সহনশীল প্রতিক্রিয়া। আগে ঘুস, উৎকোচ বা বাঁ হাতের রোজগার—এসব কথা শুনলে লোকে একটু নাসিকা কুঞ্চিত করতো। আজকাল কিন্তু তা করে না। এখন প্রায়ই শোনা যায়, ছেলের মাইনে হাজার টাকা কিন্তু উপরি নিয়ে রোজগার প্রায় তিনহাজার। অর্থাৎ দুরাচারলব্ধ রোজগার এখন সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু যে দুরাচারলব্ধ রোজগার সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে সেটা কি পুরোপুরি লাভ করতে পারছেন উপার্জন কর্তারা? নিশ্চয়ই না। দুর্নীতির দুষ্টচক্রে যেমন চক্রাকারে একটি আয়ের ব্যবস্থা আছে তেমনি একটি ব্যয়ের ব্যবস্থাও আছে কেননা একজনের ব্যয় থেকেই তো

আরেকজনের আয়।

কথাটা একটু বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা করা যাক। ঘুসকে আমরা যে নামেই ডাকি না কেন (যেমন 'স্পীড মানি', 'চায়-পানি' বা 'পান খাওয়ার খরচ' ইত্যাদি), এর অর্থ হোল একজনকে কিছু খরচ করতে হচ্ছে। চক্রাকারে যেমন একটা প্রাপ্ত যোগের সিষ্টেম খাড়া করা হয়েছে তেমনি খরচটাকে পুষিয়ে নেবার বা self compensation-এর একটা 'সিষ্টেম' সৃষ্টি করা হয়েছে। ধরা যাক, একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার মিটার-নির্দেশিত ভাড়ার চেয়ে বেশি আদায় করেন অসহায় যাত্রীদের কাছ থেকে। এয়ারপোর্ট থেকে শহরে আসতে মিটারে ত্রিশ টাকা ওঠার কথা, কিন্তু যাত্রীকে দিতে হচ্ছে পঞ্চাশ কি ষাট টাকা। ট্যাক্সি চালকের সঙ্গে যদি বিশ্বাস স্থাপন করা যায় তাহলে সে স্বীকার করে তার ট্যাক্সি সংগ্রহ করতে কত বাড়তি খরচ হয়েছে—যেমন লাইসেন্স বের করতে, ফিটনেস সার্টিফিকেট করতে এবং ব্যাংক থেকে ধারে টাকা বের করতে। তারপর এয়ারপোর্টে ডিউটিরত পুলিশ, হোটেলের ডোরম্যান এবং তাছাড়া রাস্তার মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ তো আছেই। এতসব জায়গায় যে 'প্রণামী' দিতে হয় ড্রাইভারকে, সে তা পুষিয়ে নিচ্ছে—যাত্রীদের কাছ থেকে বাড়তি ভাড়া আদায় করে যে ভাড়া মিটারের নির্দেশকে মান্য করে না। এখানেই কিন্তু self compensation-এর process-টা শেষ হচ্ছে না। ট্যাক্সিতে নানা রকমের যাত্রী চড়েন। যেমন উকিল হলে মক্কেলের কাছ থেকে, ডাক্তার হলে রুগীর কাছ থেকে, অফিসের কর্মচারী হলে টি. এ বিল থেকে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হলে খদ্দেরের কাছ থেকে নিজের নিজের ক্ষতি পূরণ করে নিচ্ছেন। অবশেষে নদীর জল যেমন সাগরে গিয়ে পড়ে, তেমনি সব ক্ষতিপূরণের শেষ ফলটা যায় বাজার ক্ষেত্রে। বাজারের সব জিনিসের দরের মধ্যেই আছে ক্ষতিপূরণের প্রতিফলন। যে যেখানে যা বাড়তি রোজগার করেছিলেন এখানে সব খোয়ালেন। কাজেই স্ব-ক্ষতিপূরণের মধ্যেই আছে আত্মপরাজয়ের বীজ।

অনেকেই এখন অভিযোগ করেন, আগে দেখেছি কলকাতা সহরে এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বাড়ার জন্য জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল—প্রতিবাদে দাবানল জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু এখন ট্রাম বাস ভাড়া বাড়লে, কেউ কিছু বলেন না—ব্যাপার কি? ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, গত পনেরো কুড়ি বছরে জনসাধারণ অনেক চালাক চতুর হয়েছে, সেল্‌ফ্ কমপেন্‌সেশনের কলা কৌশল রপ্ত ফেলেছে। তাই তারা বিক্ষোভের রাস্তা ছেড়ে, নির্বিবাদে বাড়তি

ভাড়া দিয়ে অন্যভাবে পুষিয়ে দিচ্ছে। এখন একটা প্রশ্ন আসে, সবাই কি পুষিয়ে নিতে পারছে? এমন তো লোক আছেন যাঁরা ডাক্তার উকিল না বা ছোট বড় দোকানদার নন বা যাঁর 'এক্‌সপেন্‌স্ একাউন্ট' বলে কিছু নেই। এঁদের বাঁধা রোজগারের মধ্যে বন্দী থেকে বাজারের বাড়তি দরের সঙ্গে লড়তে হচ্ছে। এঁরাই হতভাগ্য—এঁদেরই দেখতে পাই ট্যাক্সি চালকের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ করতে অথবা কোন অন্যায্য দামের চাহিদার মুখে রেগে ফেটে পড়তে। এই হতভাগ্য লোকগুলিই হোল এই যুগজুলুমের প্রধান শিকার।

দুর্নীতিকে সমর্থন করতে গিয়ে অনেকেই বলেন, বাজারে যে রকম মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে তার জন্যই দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। কথাটা অংশত সত্য মাত্র। এই প্রসঙ্গে তর্ক উঠলে, আলোচনাটা দাঁড়াবে আদিম প্রশ্নে—কোনটা আগে, বীজ না বৃক্ষ? বীজ ছাড়াও বৃক্ষ জন্মায় এবং সব বৃক্ষেই বীজ হয় না। কাজে কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে সৃষ্টিকর্তা বোধ হয় প্রথম বৃক্ষই সৃজন করেছিলেন। দুর্নীতি থেকেই মূল্যবৃদ্ধি এসেছে এবং পরে মূল্য-বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আরেক প্রস্ত দুর্নীতি। আবার একটু বেশি মাত্রায় দুর্নীতি এবং তারপর আবার মূল্যবৃদ্ধি। তাহলে এর শেষ কোথায়?

কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে ইন্দোনেশিয়া বা নাইজিরিয়ার মত দেশের দিকে তাকিয়ে নাক সিটকে বলতাম কি দুর্নীতির জায়গা। কিন্তু আজ সে কথা বলার নৈতিক অধিকার আর আর আমাদের নেই। দুর্নীতি আমাদের দেশ থেকে অপসারণ করতে হলে একটু ভেবে দেখতে হয় ঠিক কোন জায়গায় বড় ফাঁকটা আছে। প্রথমেই ধরা যাক আমাদের রাজনৈতিক কাঠামোর কথা। আমাদের দেশে নির্বাচনী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—কিন্তু এই নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যেই বিরাট একটা ফাঁক রয়ে গেছে। নির্বাচন একটি বিরাট ব্যয়-সাপেক্ষ অনুষ্ঠান—সরকারের দিক থেকে এবং প্রার্থীদের দিক থেকে। প্রত্যেক আসন প্রার্থীকে বিধিবদ্ধ ব্যয় সীমা মেনে চলার কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় না। কোন কোন মহলের হিসেবে বিধান সভার আসনের প্রত্যেক প্রার্থীকে প্রায় তিনচার লক্ষ টাকা খরচ করতে হয় এবং কেন্দ্রীয় আসনের জন্য দশ লক্ষের উপর। এই টাকাটা আসে কোত্থেকে?—একমাত্র পার্টির সভ্য সমর্থকদের চাঁদা থেকে কখনই নয়। যে-ই টাকার যোগান দেন তাঁর পক্ষে এটা একটা ইনভেস্টমেন্ট—কাজেই নির্বাচনের পর নানা রকম উপায়ে ব্যয়ের কয়েকগুণ তাঁকে উদ্ধার করতেই হবে। এরকম ব্যাপার বিদেশেও অনেক

ঘটেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসায়ীরা নির্বাচনে টাকা ঢালা প্রথম আরম্ভ করেন ১৮৯৬র রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে। এই নির্বাচন যুদ্ধে লড়েছিলেন উইলিয়াম জেনিংস্ ব্রাইয়ান এবং উইলিয়াম ম্যাকিন্‌লে। ব্যবসায়ীদের এই কাজে কৌশলপূর্ণ নেতৃত্ব দিয়েদিলেন ওহাইও (ohio) স্টেটের শিল্পপতি মার্ক হান্না। নির্বাচনে শিল্পপতিদের টাকা ঢালা যে একবার সুরু হয়েছিল সেই ট্র্যাডিশন এখনও সমানে চলেছে। এর বিনিময়ে ব্যবসায়ীরা কি পাচ্ছেন তার একটা ছোট হিসেব নেওয়া যাক্। ডিফেন্সে যত কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হয় তার প্রায় ষাট শতাংশ বিনা টেণ্ডারেই বিলি করা হয়। মার্কিণ শিল্পের বড় খদ্দের হোল, সরকার এবং ১৯৭৭-এ বিভিন্ন শিল্পের কত অংশ সরকার কিনেছিলেন তা আঁচ করা যাবে নিম্নোক্ত ছক থেকে—

শিল্প	সরকারের ক্রয়ভাগ (শতাংশ)
বিমান সরবরাহ	৫৬
রেডিও এবং যোগাযোগ যন্ত্রপাতি	৫৬
এঞ্জিনীয়ারিং এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি	১২
ইলেকট্রন সম্প্রসারণ টিউব	১২

কাজেই রাজনীতিতে যে ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের উৎসাহ থাকবে তা আর বিচিত্র কি? আমাদের দেশেও প্রায় সে রকম জিনিসই হচ্ছে। কাজেই দেশ থেকে দুর্নীতি অপসারণ করতে হলে চাই রাজনীতিতে শিল্পোৎভব অর্থ বিনিয়োগ বন্ধ করা। কাজটা কিন্তু মোটেই সহজসাধ্য নয়। আমাদের দেশের ভোটদাতাদের একটি বিশেষ দুর্বলতা আছে—তাঁরা মোটেই সংঘবদ্ধ নন। তাঁরা ভোট দেন শ্লোগান শুনে আর দেওয়ালের লিখন পড়ে। একবার ভোট দেওয়ার পর ভোট দাতাদের তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধির উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ভোট দেওয়ার আগেও তাঁরা প্রার্থীর কাছ থেকে তাঁর ভবিষ্যৎ আচরণ সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি নেন না। কাজেই জনসাধারণকে আরও একটু সচেতন হতে হবে এবং আরও একটু সাবধান হতে হবে। জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ হতে বললে আন্দোলনের কথা নিজে থেকেই এসে যায়। আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে জনসাধারণ নিশ্চয়ই শক্তি সঞ্চয় করে। কিন্তু এতকাল যে ধরণের আন্দোলন করা হয়েছে তা আর চলবে না। স্বাধীনতা লাভের পর এতদিন যে আন্দোলন করা হয়েছে, তা শুধু এক শ্রেণীর

লোকের কিছু সুবিধে আদায়ের আন্দোলন। যেমন বেতনবৃদ্ধি চাই, বেশি বোনাস চাই, বেশি মাগ্‌গীভাতা চাই, কর্মভারে স্বল্পতা চাই, কাজে উপস্থিতি সম্বন্ধে শিথিলতা চাই। এই সব চাই-এর পেছনে আছে একটাই তাগিদ—সহজে বা বিনা শ্রমে কতগুলি সুবিধে আদায়। এক গোষ্ঠীর লোকের সুবিধে লাভ করার জন্য যে অপর আরেক গোষ্ঠী অসুবিধেয় পড়লো সে সম্বন্ধে কারুর ভ্রূক্ষেপ নেই। অথচ এখন ভেবে দেখার সময় এসেছে এই সুবিধেমুখী আন্দোলনের ফলে যা পাওয়া যায় তা অল্পকালের মধ্যেই খোওয়া যায়। তাহলে এই আন্দোলন করে লাভ কি? তার চেয়ে এমন কিছু করা ভাল যাতে দীর্ঘ মেয়াদী সুফল পাওয়া যায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে কষ্ট বা অসুবিধে থাকে তার মূলে থাকে কোন গভীর অবিচার বা কোন মৌলিক ভারসাম্যহীনতা। এই ব্যাধির মূলে কুঠারাঘাত করা দরকার—এই পথেই দুর্নীতির প্রতিকার সম্ভব। তা না হলে 'সেলফ কমপেন্‌সেশন্' প্রসেস চলতেই থাকবে যা হোল দুর্নীতিকে পাকাপাকি ভাবে রেখে দেওয়ার কায়েমী ব্যবস্থা।

WITH THE COMPLIMENTS
OF

INDIAN TUBE

সম্পাদকীয়

গত সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর কাশ্মীরে ও অন্ধ্রে যা ঘটে গেল তা এতই নক্কারজনক ও গণতন্ত্রবিরোধী যে তা নতুন কোনো উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। শেষ অবধি আবার রামা রাওকে ফিরিয়ে আনতেই হ'লো। এমন সর্বাঙ্গ চুনকালি বোধহয় আর কখনো পড়েনি শাসকদলের মুখে। কিন্তু তবু যে আমরা নতুন করে স্মরণ করছি তার কারণ সামনেই নির্বাচন। নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হবে কিনা জানি না। কেননা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী "রাষ্ট্রপতি" ধাচের শাসনে কোনো ত্রুটি দেখেন না বলে জানিয়েছেন। আসলে এই তথাকথিত নির্বাচন, লোকসভা নেতাদের পার্লামেণ্ট বা এসেমব্লিতে এসে জন্তরও লজ্জাজাগানো যে সব ব্যবহার করেন, তাতে বহু আগেই গণতন্ত্র শব্দটি প্রহসনে পরিণত হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। রাজনীতি-অনীতির এই মগের মুল্লুকে চিন্তাবিদ স্বদেশপ্রাণ বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ এখনো তেমন ভাবে দেখা গেল না বা যাচ্ছে না এই ক্ষোভ থেকেই যায়। বিভাবের সম্পাদকীয় স্তম্ভের বক্তব্য যে মাঝে মাঝেই রাজনীতির পরোক্ষ আলোচনায় সংপৃক্ত হয় তার মূল কারণ মানবিক। যদিও বিভাব কোন অর্থেই কোনো দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নয় এবং আমরা জানি আমাদের দুঃখ নিদারুণ আত্মজ্ঞানের এই বাঙালি ভাষা দিল্লীর কোনো নেতা বা মন্ত্রীর নিদ্রার তিলেক ব্যাঘাতও ঘটাবে না। তবু আমাদের ঘৃণা আমাদের বিপুল বিরক্তির একটা লিখিত সাক্ষ্য থাকুক—মাত্র এইটুকু ছাড়া আমাদের অন্য কোনো পরিত্রাণ নির্দেশের বাসনা নেই।

কিউবা বিপ্লবের পঁচিশ বছর পূর্তি হলো। এই উপলক্ষ্যে কার্পেন্তিয়ারের বিখ্যাত উপন্যাস "এই মর্তের রাজত্ব"-এর সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হলো। বাঙলাভাষার সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা "পুতুল নাচের ইতিকথার"-ও পঞ্চাশ বছর চলছে, এই সম্পর্কে একটি মূল্যবান রচনাও এ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। আসলে উল্লেখযোগ্য গল্পে-কবিতায়-প্রবন্ধে সাজিয়ে সংখ্যাটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে বহুদিন পরে আমরা নিজেরা অন্তত খুশী। পাঠকরা সন্তুষ্ট হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

এই সংখ্যার জন্য বিশেষ শ্রম স্বীকার করেছেন বিভাবের সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম শ্রীশুভকুমার বসু। আসলে মূলত তারই একক উদ্যোগে বিভাব এখন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। পরিশেষে বিভাবের সমস্ত শুভানুধ্যায়ী পাঠক, গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের শারদীয় শুভেচ্ছা জানাই।

বিভাব সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

"কোথাও ধানের খেতের ধারে
ঘন কলাবন বাঁশঝাড়ে,
ঘন আম কাঁঠালের বনে
গ্রাম দেখা যায় এক কোণে।
সেথা আছে ধান গোলাভরা
সেথা খড়গুলা রাশ করা।"

সমবায় সংগঠনে দীর্ঘমেয়াদী কৃষি সংশ্লিষ্ট ও
কৃষিঋণের একমাত্র প্রতিষ্ঠান

ওয়েষ্ট বেঙ্গল সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ব্যাংক লিমিটেড
২৫ডি. সেক্সপীয়র সরণী, কলিকাতা—৭০০ ০১৭

আঞ্চলিক অফিস—শরৎ বোস রোড, শিলিগুড়ি
নতুন পল্লী, বর্দ্ধমান

Let the buds of your hopes and Aspirations
Blossom under the surest protection of peerless

With Best Compliments of :

★

The Peerless General Finance
&
Investment Company Limited

ESTD:1932

Regd. & Head Office :
PEERLESS BHAVAN, 3 ESPLANADE EAST,
CALCUTTA-700069

TOTAL ASSETS OVER Rs. 500 CRORES
INDIA'S LARGEST NON-BANKING
SAVINGS COMPANY

অনুবাদ

কিউবা বিপ্লবের পঁচিশ বছর পূর্তি
উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র

আলেহো কার্পেন্তিয়ের উপন্যাস

এই মর্তের রাজত্ব

এল রেইনো দে এস্তে মুন্দো

অনুবাদ
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম

শয়তান ॥ আমি চাই প্রবেশাধিকার···

ঈশ্বর ॥ কে তুমি? কী পরিচয়?

শয়তান ॥ প্রতীচীর রাজা।

ঈশ্বর ॥ অভিশপ্ত ওরে, তোকে আমি
খুব ভালো জানি। আয় তবে।
(সে প্রবেশ করে)

শয়তান ॥ ধন্য, রাজসভা, ধন্য,
চিরন্তন ঈশ্বর আমার!
কলম্বাস—তাকে তুমি পাঠাও কোথায়?
আমার সমস্ত পাপ, সকল দুষ্কৃতি
সে আবার ঘটাক নতুন ক'রে, সত্যি এই চাও?
তুমি কি জানো না তবে কতকাল সে যে
আমিই রাজত্ব করি ঐ রাজ্যপাটে?

—লোপে দে ভেগা

১

মোমে তৈরি মাথা

জাহাজের কাপ্তেন—তার সঙ্গে নর্ম্যাণ্ডির এক পশুপালকের কিছু-একটা শরিকি ব্যবস্থা ছিলো—যে-কুড়িটা পয়দাবাজ ঘোড়া কাবো ফ্রান্সেস্‌এ এনেছিলো, তি নোয়েল কোনো দোনোমনা না-ক'রেই বেছে নিয়েছিলো সেই মরদটাকে যার ছিলো শাদা চারটে পা আর ভরাট গোল পাছা—মাদি ঘোড়াদের তোফা কাজে লাগবে—মাদিগুলো সম্প্রতি যে-সব বাচ্চা পাড়ছিলো, তা প্রতি বছরই ছোটো হ'য়ে আসছিলো। ক্রীতদাসটা যে ঘোড়ার মাংসের এলেম অদ্ভুতভাবে জেনে ফেলতে পারে ম'সিয় লেনরর্ম দ্য মেজি তা জানতেন ; তার পছন্দকে কোনো প্রশ্ন না-ক'রেই তিনি ঝমঝমে সোনার লুই দিয়ে দাম মিটিয়ে দিয়েছিলেন। মুখে পরাবার জন্য লাগামের দড়িটা পাকিয়ে-পাকিয়ে তৈরি করেছিলো তি নোয়েল ; ফুটফুট দাগে ভরা ভারি জানোয়ারটার শ্বাসপ্রশ্বাস বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই অনুভব করেছিলো সে ; তার দুই উরুর ফাঁকে দরদর ঘাম তেজি ঘোড়াটার পুরু চামড়ায় মাখিয়ে দিয়েছিলো অম্ল কটু গন্ধ। মালিক চড়ছিলেন এক পাটকিলে রঙের হালকা ক্ষিপ্র ঘোড়া ; তাঁর পেছন-পেছন তি নোয়েল পেরিয়ে এলো খালাশিদের মহল্লা, তাদের দোকানপাটগুলোর গায়ে লোনা আমিষ গন্ধ, স্যাঁৎসেঁতে ব'লে পালের কাপড়গুলো আড়-ধরা, সমুদ্রের চাপাটিগুলো এত শক্ত যে ঘুষি মেরে টুকরো করতে হয় ; তারপর সে এসে পড়লো বড়ো রাস্তাটায়, সকালে এ-সময় রংবাহার থাকে এখানে, বাজার থেকে বাড়ি ফিরছে নিগ্রো মাগিগুলো, ঝলমলে সব চৌখুপি-কাটা বান্দানা মাথায় জড়ানো। দু-পাশে ভারি-ভারি সোনার পাত লাগানো রাজ্যপালের ঘোড়ার গাড়ি থেকে ম'সিয় লেনর্‌ম দ্য মেজির দিকে আদিখ্যেতায় ভরা সম্ভাষণ ভেসে এলো। তারপর মালিক আর গোলাম দুজনেই নাপিতের দোকানের সামনে তাদের ঘোড়াগুলো বাঁধলো। তার শিক্ষিত খদ্দেরদের আলোকপ্রাপ্তির জন্য এই নাপিত 'লেদেন গেজেট' পত্রিকা রাখে দোকানে।

মালিকের যখন দাড়ি কামানো হচ্ছে, তি নোয়েল তখন চোখ ভ'রে দেখে নিতে লাগলো দরজার পাশের কাউন্টারটায় শোভা পাওয়া মোমে তৈরি মাথা

চারটে। পরচুলার গোল কোঁকড়া লালচে পশমিনার ওপর থেকে থোকা-থোকা নেমে এসেছে কোঁকড়ানো বিনুনি, অভিব্যক্তিবিহীন মুখগুলোর কাঠামোর মতো। এদের স্থির নিষ্পলক চাউনি এমন মরা দেখতে হ'লে কী হবে, এই মাথাগুলোকে ঠিক সত্যিকার দেখায়—সেই-যে ভবঘুরে হাতুড়ে বদ্যিটি কয়েক বছর আগে কাবোতে দাঁতব্যথা আর বাতব্যাধি সারাবার সঞ্জীবনী বেচতে এক কথাকওয়া নরমুণ্ড নিয়ে এসেছিলো, হুবহু তারই মতো। মজার একটা কাকতালই হয়তো, পাশে যে মাংসের দোকানটা তারও জানলায় ছিলো বাছুরের মুণ্ড, চামড়া ছাড়ানো, প্রত্যেকটার জিভের ডগায় একগোছা ক'রে···তাদের মধ্যেও ও-রকম একটা মোম-মোম ভাব। জারানো ষাঁড়ের ল্যাজ, বাছুরের পায়ের মোরব্বা, আর কাঁ-র কেতায় বানানো পাকস্থলির ডেকচির মধ্যে তারা যেন ঘুমিয়ে আছে। শুধু একটা কাঠের দেয়ালই আলাদা ক'রে রেখেছে কাউন্টার দুটোকে ; আর, ক্যাকাশে বাছুর মুণ্ডুগুলোর সঙ্গে শাদা আদমিদের মুণ্ডুগুলো একই দস্তরখানের ওপর পরিবেশন করা হচ্ছে—এই দৃশ্যটা মনে-মনে ভেবে তি নোয়েলের ভারি মজা লাগলো। ঠিক যেমন ভোজসভায় শোভা পায় পালক-টালক শুদ্ধু পাখি-মুরগি, তেমনি কোনো ওস্তাদ করাল খানশামা হয়তো সুন্দর ক'রে সাজিয়ে দেবে মাথাগুলো, তাদের সেরা পরচুল পরিয়ে। শুধু যা নেই, চারপাশে, তা হ'লো লেটুস পাতার একটা অচল অথবা লিলিফুলের মতো ক'রে কুঁচোনো মুলো। তাছাড়া, বাবলার আঠার বোয়ম, ল্যাভেণ্ডার জলের শিশি-বোতল, চালের গুঁড়োর বাক্স, রুজের রেকাবি আর নাড়িভুঁড়ির চাটনির বদনার পাশে, খুব কাছে ব'লেই, এইসব গোলমরিচ, কাঞ্জিক ও তেল রাখবার শিশিবোতলের কাকতাল কেমন-এক বীভৎস ভোজের ছবিটাকেই ফুটিয়ে তোলে।

সকাল বেলাটাই মাথায়-মুণ্ডে ছয়লাপ, কারণ মাংসওলার দোকানের পাশেই বই বিক্রেতা একটা কাপড়মেলার তারের ওপর ঝুলিয়ে দিয়েছে পারী থেকে আনা সর্বাধুনিক ছবিগুলো। তাদের অন্তত চারটেয় শোভা পাচ্ছে ফ্রান্সের রাজার মুখ, স্বর্গ, তলোয়ার আর পত্রালির কাঠামোর মধ্যে। কিন্তু তাছাড়াও ছিলো আরো অনেক পরচুল শোভিত মাথা, সম্ভবত রাজসভার মাতব্বরদেরই। যোদ্ধাদের চেনা যায় তাদের রণংদেহি ভঙ্গি দেখে ; বিচারপতিদের, তাদের ভয়াবহ ভ্রূকুটি দেখে ; রসিক নাগরদের, তাদের ঠোঁটের কুশকায়িত হাসি দেখে ; দুটো কাটাকুটি-করা কলমের ওপর কবিতার চরণগুলোর পুরোভাগে তারা শোভমান ; তি নোয়েলের কাছে এ-কবিতার কোনোই মানে নেই, কারণ

ক্রীতদাসেরা পড়তে পারে না। ছিলো কিছু রঙিন মিনে-করা খোদাইও, হালকা ধরনের : কোনো নগরীর দখল উদ্‌যাপন করার উৎসবে আতশবাজির খেলা, নাচের দৃশ্য—যেগুলোয় ডাক্তারেরা সব মস্ত সরু পিচকিরি উঁচিয়ে আছে, একটা বিতানে কারা যেন কানামাছি খেলছে, তরুণ সব লম্পট, পরিচারিকাদের বুকের জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে, অথবা প্রেমিকদের সেই চির-অব্যর্থ কৌশল—একটা দোলনায় দোল খাচ্ছে এক তরুণী, নির্দোষ ভঙ্গিতে, আর শ্যামল তৃণভূমিতে শুয়ে ওপর দিকে সুগাবেশে তাকিয়ে থেকে কেউ দেখে যাচ্ছে তার অন্তর্বাসের সবখোল উড়াল। তি নোয়েলের মনোযোগ কিন্তু আকৃষ্ট হয়েছে তামার পাতে খোদাই-করা একটা ছবির দিকে, সেই পর্যায়ের সেটাই শেষ ছবি, বিষয়বস্তু আর অঙ্কনরীতি দু-দিক দিয়েই সেটা অন্যগুলোর চেয়ে আলাদা। তাতে দেখা যাচ্ছে এক ফরাসী নৌসেনাপতি বা রাজদূতকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে সিংহাসনে ব'সে-থাকা এক নিগ্রো, পালকের চামরের আঁচল তার দু-পাশে, আর তার সিংহাসনের গায়ে আঁকা বাঁদর আর গিরগিটির মূর্তি।

'কেমনতর লোক এরা?' সাহসে ভর ক'রে সে জিগেশ করলে বইওলাকে —যে তখন তার দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে লম্বা একটা মাটির পাইপ জ্বালাচ্ছিলো।

'তোমাদের দেশের রাজা।'

সে যা অনুমান করেছিলো, তার যাথার্থ্যস্বীকার কিন্তু আদপেই জরুরি ছিলো না, কারণ ততক্ষণে এই তরুণ ক্রীতদাসটির মনে প'ড়ে গেছে সেইসব কাহিনী, লেনরম ছ মেজির খামারের সবচেয়ে বুড়ো ঘোড়াটা যখন চিনির কারখানার বেলনের মতো দাঁড়টাকে টেনে ঘোরাতো, মাকান্দাল তখন যা গুনগুন ক'রে গেয়ে শোনাতো। নিগ্রো সুরটা ইচ্ছে ক'রে অবসাদ আর বিষাদ আনতো এই মান্দিঙ্গ, আর শ্রোতাদের ওপর প্রভাব ফেলবার পক্ষে তা খুবই কাজে লাগতো, সে বলতো কী-কী ঘটেছিলো পোপো, আরাদা, নাগোস আর ফুনাহ্‌দের মহান রাজত্বগুলোয়। সে বলতো উপজাতিদের সদলে দেশান্তরী হওয়ার কাহিনী, যুগযুগান্তরব্যাপী যুদ্ধের কথা, মহাকাব্যপ্রতিম সব সমর-কাহিনী—যাতে পশুরাও ছিলো মানুষের মিত্র। সে জানতো আদনহুয়েসোর গল্প, আঙ্গোলার রাজকাহিনী, রাজা ডা-এর উপাখ্যান—যে ছিলো স্বয়ং নাগ-দেবতারই অবতার, যে-নাগদেবতাই শাশ্বত সূচনা ও অনন্ত সমাপ্তি, যার রতিসুখ ছিলো ইন্দ্রিয়াতীত, যে-রাণীর সঙ্গে তার রতি বিলাস হ'তো সে ছিলো

ইন্দ্রধনু, জলের দেবী, সংসারের সবকিছুর জন্মের ধাত্রী। কিন্তু কাঙ্কান মুজার উপাখ্যানেই ভাষার বৈভব সে উপহার পেয়েছিলো সবচেয়ে বেশি—সেই-যে ভয়ংকর মুজা, যে কিনা মান্দিঙ্গদের দৃশ্যাতীত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, যার ঘোড়া-গুলোর গায়ে ছিলো রৌপ্যমুদ্রার আর কশিদার ঝালরের অলংকরণ, যাদের হ্রেষা ছিলো লৌহঝঞ্ঝনার চেয়েও বেশি সশব্দ, কাঁধ থেকে ঝোলা দুই নাকাড়ার মধ্যে যারা বহন করতো বজ্রনিনাদ। উপরন্তু, এই রাজারা ভল্ল উঁচিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে যেতো তাদের বাহিনীর পুরোভাগে, আর পুরোহিতদের বিজ্ঞানের কল্যাণে তাদের আহত করা ছিলো অসাধ্য, তারা শুধু তখনই জখম হ'য়ে প'ড়ে যেতো যদি তারা কোনো কারণে রুষ্ট ক'রে তুলতো বিদ্যুৎ বা যুদ্ধের দেবতাকে। রাজা ছিলো তারা, সত্যিকার রাজা, ও-রকম কোনো সার্বভৌম নয় যারা নকল চুলের পরচুলা লাগায় মাথায় আর পেয়ালা আর নাচের খেলায় মত্ত হ'য়ে থাকে, আর শুধু তখনই এরা দেবতা হ'য়ে ওঠে যখন এরা নিজেদের রাজসভার মঞ্চের ওপর পেগম তুলে ঘুরে বেড়ায়, মেয়েলি ভাবে নিজেদের ঝালর লাগানো পোশাক পরা ঠ্যাং দেখিয়ে এই শাদা রাজাগুলো অনেক বেশি কান পাতে বেহালার সমতানে আর কেচ্ছা গুজবের ফিশফিশানিতে, রক্ষিতাদের খুনশুটি কথায় আর তাদের তন্ত্রীময় পক্ষিদের সুরধ্বনিতে, প্রতিপদের চাঁদের বাঁকা কাস্তের পটে গ'র্জে ওঠা কামানের নিনাদে নয়। যদিও শিক্ষা বলতে প্রায় কিছুই নেই তি নোয়েলের, তবু সে এইসব সত্যে দীক্ষা পেয়েছে মাকান্দালের গভীর প্রজ্ঞা থেকেই। আফ্রিকায় রাজা ছিলেন যোদ্ধা, শিকারি, বিচারক আর পুরোহিত; তাঁর মূল্যবান ঔরস এক বিশাল বীরদের ধারা ছড়িয়ে দিয়ে শত-শত উদর ফুলিয়ে দিতো। ফ্রান্সে, স্পেনে, রাজা নিজে না গিয়ে যুদ্ধে পাঠায় তার সেনাপতিদের; আইনের জট খোলায় সে নিতান্তই অসমর্থ; উটকো যে-কোনো রাস্তার ফায়ারকে এসে তাকে ধমকে যেতে দেয় সে। আর যখন পুরুষালি ক্ষমতার প্রশ্ন ওঠে, সে জন্ম দেয় কোনো ঘ্যানঘেনে ছিচকাঁদুনে রাজকুমারের, খেদাদের সাহায্য ছাড়া যে এমনকী একটা হরিণছানাকেও পেড়ে ফেলতে পারে না, এবং যে-কী অচেতন পরিহাস ব্যাপারটায়—কিনা শুশুকের মতো কোনো নিরীহ বোকা-হাবা মাছের নাম ধ'রে বসে। অথচ, ঐ ওখানে, সেখানে রাজ-কুমারেরা সবাই নেহাইয়ের মতো কঠিন, আর রাজকুমারেরা সেখানে একেকজনে চিতাবাঘ আর রাজকুমারেরা জানে জঙ্গলের ভাষা, রাজকুমারেরা শাসন করে দিগ্‌দর্শিকার চতুর্বিন্দু, তারা সবাই মেঘমালার প্রভু, বীজ ও ঔরসের প্রভু,

ব্রন্জের প্রভু, আগুনের প্রভু।

তি নোয়েল তার মালিকের গলা শুনতে পেলো; গালে বেজায় পাউডার ঘ'ষে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন ক্ষৌরকারের ডেরা থেকে। কাউন্টারের ওপর ঐ যে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে বোকার মতো হাসছে চারটে রংচটা মোমের মাথা, এখন তাঁর মুখের সঙ্গে কী তাকলাগানো মিল তাদের। বেরুবার পথে মঁসিয় লেনর্মঁ দ্য মেজি মাংসওলার দোকান থেকে একটা বাছুরের মাথা কিনে নিলেন, এবং সেটা তুলে দিলেন ক্রীতদাসটির হাতে। শ্যামল প্রান্তরের আকাঙ্ক্ষায় ঘোড়াটা হাঁপাচ্ছে; তার পিঠে চ'ড়ে তি নোয়েল কানে জড়িয়ে ধরলো সেই শাদা, ঠাণ্ডা মাথাটা, মনে-মনে ভাবলো তাঁর পরচুলার আড়ালে মালিকের যে টাকপড়া মাথাটা লুকোনো তার সঙ্গে সম্ভবত এর বিস্তর মিল। হাটবাজার থেকে ফিরতে থাকা নিগ্রো মেয়েদের বদলে রাস্তায় এখন দশটার প্রার্থনাসভা থেকে বেরুনো মহিলাদের ভিড়, কার পেছনে হয়তো আসছে তার দাসী—তার নিজেরই মতো সন্দেহজনক যার গায়ের রং, হাতে তালপাতার পাখা, তার প্রার্থনাপুঁথি, আর তার সোনালি ঝালর লাগানো আতপত্র। একটা মোড়ে যাযাবর সঙেদের একটা দল নাচছে। তারও ওপাশে দূরে এক খালাশি মহিলাদের কাছে গছাবার চেষ্টা করছে ইস্পানি পোশাক পরানো ব্রাজিলের এক বাঁদর। পানশালাগুলোয় লবণ আর ভিজে বালির মধ্যে গোঁজা মদের বোতলগুলো ঠাণ্ডা হচ্ছে, আর ছিপি খোলা হচ্ছে একেকটার। লিমোনাদ-এর পল্লিগির্জার সহকারী যাজক, পাদ্রি কর্নেঝি তার রাসভরঙা খচ্চরে চেপে এই মাত্র এসে পৌঁছেছেন ক্যাথেড্রালে।

যে-রাস্তাটা সমুদ্রতীরকে আঁচলের মতো জড়িয়ে রেখেছে, সেটা ধ'রে মঁসিয় লেনর্মঁ দ্য মেজি আর তাঁর ক্রীতদাস শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। কেল্লার নিচু পাঁচিল থেকে বাবুম-বুবুম ক'রে উঠলো এক তোপধ্বনি। সম্রাটের নৌবহরের জাহাজ 'সাহসিনী'কে—দেখা গেলো, ইল্ দ্য লা তোর্‌তু থেকে ফিরছে। জাহাজ-টার পাশের ঢালে ধাক্কা লেগে ফিরে এলো ফাঁকা আওয়াজগুলোর প্রতিধ্বনি। তার মালিকের বুকের মধ্যে নৌবহরের ক্ষুদে অফিসার হিশেবে কাজ করার স্মৃতি ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠলো, আর সে শিস দিতে লাগলো বাঁশিতে-বাজানো একটা কুচকাওয়াজের সুর। তি নোয়েল, মনে-মনে, তার পালটা বিন্দু হিশেবেই যেন, নিঃশব্দে গুনগুন করলে একটা মাল বওয়ার গান, বন্দরের পিপেওলাদের কাছে যেটা খুবই জনপ্রিয়, যেটার মধ্যে ইংলণ্ডের রাজাকে লক্ষ্য ক'রে যাচ্ছে-

তাই সব খিস্তি করা হয়েছে। এই কথাটা সে কিন্তু নিশ্চিত ক'রেই জানে, যদিও গানের কথাগুলো কিন্তু মোটেই ক্রেয়োল নয়। তাছাড়া, ইংলণ্ডের বা ফ্রান্সের, বা স্পেনের রাজাদের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিলো থোড়াই; তারা দ্বীপের অন্য অর্ধেক শাসন করে, আর তাদের বউয়েরা, মাকান্দালের মতে—নাকি ষাঁড়ের রক্তে গাল রাঙায় আর একটা মঠে না সন্ধ্যে গিয়ে ভ্রূণগুলো গোর দেয়—মঠের মাটির তলার ভাঁড়ার ঘরটা হাড়ে-কঙ্কালে ভরপুর—সত্যিকার স্বর্গ যাদের প্রত্যাখ্যান করেছে, প্রকৃত দেবতাদের না-মেনে যারা মারা গেছে তাদের সঙ্গে বাপু কোনো কাজ কারবারই চলে না।

২

অঙ্গচ্ছেদ

তি নোয়েল নিজেকে বসিয়েছিলো একটা ওলটানো দ্রোণীর ওপর, বুড়ো ঘোড়াটাকে দিয়ে ঘোরাতে দিচ্ছিলো কলটা, এমন তুলকি চালে অভ্যাস যাকে ক'রে তুলেছে যান্ত্রিক। মাকান্দাল আখের আঁটি খাওয়াচ্ছিলো কলটাকে, লোহার বেলনের তলায় গুঁজে দিচ্ছিলো ডগাগুলো। তার রক্তরাঙা চোখ, শরীরের সবল খাঁচা, অবিশ্বাস্য সরু কোমর—সব মিলিয়ে এই মান্দিঙ্গ তি নোয়েলের ওপর এক আশ্চর্য সম্মোহন ছড়িয়েছিলো। লোকে বলতো, নিগ্রো মেয়েদের কাছে তাকে যা অপ্রতিরোধ্য ক'রে তুলেছিলো, সেটা তার গভীর, অস্বচ্ছ কণ্ঠস্বর। আর তার গল্প বলার কলাকৌশল—বিশেষ ক'রে সে যখন মনে করতো সেই কবে তাকে যখন সিয়েরা লেওনের দাসব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি ক'রে দেয়া হয়েছিলো, সে অনেক কাল আগে, তার সেই বন্দীজীবনের অভিযানকাহিনী—ভয়াবহ সব অঙ্গভঙ্গি সমেত সে নিজেই বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় ক'রে দেখাতো—লোককে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখতো। তি নোয়েল যখন তাকে শোনে, সে বোঝে যে, কাবো ফ্রান্সেস—তার ঘণ্টাঘর, পাথরবাড়ি, সামনে লম্বা ঝুলবারান্দা ছড়ানো নর্ম্যান ঘরবাড়ি—সব সমেত গিনির সব নগরের তুলনায় নেহাৎই তুচ্ছ রংচঙে জিনিশ। সেখানে বিশাল সব কেল্লার ওপর উঠে গিয়েছে লাল মাটির বুরুজ গম্বুজ, তীর

ছোড়বার জন্য ঝাঁঝরা লাগানো দেয়ালে ঘেরা ; মরুভূমির সীমা ছাড়িয়েও তার হাটবাজারের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো যদ্দুর অব্দি যাযাবর অধিজাতিরা যায়, ততদূর। সে-সব শহরে মজুররা ধাতু নিয়ে কাজ করায় দক্ষ, তারা এমন-সব অসির ফলা বানায় যারা ক্ষুরের মতো মসৃণ কাটে আর যোদ্ধার হাতে যার ওজন একটা পালকের চেয়ে বেশি ব'লে বোধ হয় না। সেখানে আকাশ অব্দি উঠে গেছে বিশাল সব নদী, মানুষের পা চাটে তারা, আর লবণভূমি থেকে নুন নিয়ে আসার কোনো দরকারই সেখানে ছিলো না। গম, তিল, তিষি, জোয়ার মস্ত সব গুদোমে থরে-থরে সাজানো, রমরমা ব্যবসা চলে এ-রাজ্য থেকে ও-রাজ্যে, এমনকী আন্দালুসিয়ার মাধ্বী আর জলপাইতেলেরও। তালপাতার ছাউনির তলায় ঘুমিয়ে থাকে অতিকায় সব ঢাক, ঢাকের মা-জননীরা, পাগুলো রাঙানো লালে আর মানুষের মুখ শোভায়। বৃষ্টিরা সব প্রজ্ঞাবানেদের নিয়ন্ত্রণে, আর সুন্নতের ভোজে, যখন কিশোররা নাচতো রক্তমাখা পায়ে, সুনাদী শিলার গায়ে দুম-দুম ঘা মেরে এমন সংগীত রচনা করা হ'তো, যা শুনে মনে হ'তো যেন বিশাল সব জলপ্রপাতকে পোষ মানিয়ে নেয়া হয়েছে। দিব্যধাম হুইদায় পুজো করা হতো ফণাধর গোখরো, আর শাশ্বত চক্রাবর্তের অতীন্দ্রিয় প্রতিরূপকে, সেইসঙ্গে স্তুতি করা হ'তো সেই দেবতাদেরও যাঁরা শাসন করেন উদ্ভিদ জগৎ, আর দেখা দেন সিক্ত চকচকে লবণহ্রদের পাড়গুলোর শব্দ-রোধ-করা বিশাল তৃণভূমিতে।

ঘোড়াটা, কিসে হোঁচট খেয়ে, হাঁটু দুমড়ে প'ড়ে গিয়েছিলো। এমন-একটা আর্তভীষণ চীৎকার উঠেছিলো—এত মর্মভেদী আর এত প্রলম্বিত—যে আশপাশের ক্ষেত থামারেও পৌঁছেছিলো তার রেশ, ভয় পাইয়ে দিয়েছিলো পায়রাদের। মাকান্দালের বাঁ-হাতটা আখের সঙ্গে-সঙ্গে বেলনের আচম্বিত টানে আটকা প'ড়ে গেছে, যেটা তার পুরো হাতটাকেই চাকার তলায় হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেছে একেবারে, কাঁধ অব্দি। যে-পিপেটায় আখের রস পড়ছিলো, সেখানে বিস্ফারিত হ'য়ে উঠেছিলো একটি রক্তলোচন। একটা ছুরি তুলে নিয়ে, তি নোয়েল তক্ষুণি কেটে দিয়েছিলো সেই লাগাম, যা কলের কীলকের সঙ্গে আটকে রেখেছিলো ঘোড়াটাকে। চামড়ার কারখানা থেকে ছুটে এসেছিলো ক্রীতদাসেরা, মালিকের পেছন-পেছন, এসেছিলো মাংস শুকিয়ে জারিয়ে রাখে যারা, যারা শুকোয় ক্যাকাও ঘাস। বেলনগুলোকে উলটোদিকে সরিয়ে, এবার মাকান্দাল তার থ্যাঁৎলানো বাহুটা টানছিলো। ডান হাত দিয়ে সে নড়াতে চাচ্ছিলো তার

একটা কনুই একটা বাজু একটা কব্জিকে—যারা তার হুকুম মানছিলো না। তার মুখটা অভিভূত, স্তম্ভিত, যেন কী ঘ'টে গেছে তার কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না। তারা একটা দড়ি দিয়ে পাক-তাগা বাঁধতে শুরু করেছিলো তার বগলের তলায়, রক্ত পড়া আটকাবে ব'লে। মালিক শানপাথরটা আনতে বলেছিলেন, অঙ্গচ্ছেদের জন্য আখ-কাটা যে-মস্ত ছুরিটা ব্যবহার করা হবে, সেটাতে শান দেবার জন্য।

৬

হাতটা কী দেখেছিলো

ভারি কাজের জন্য অক্ষম, মাকান্দালকে দেয়া হ'লো গোরু-মোষ চরাবার ভার। সকাল ফোটবার আগেই সে গোয়াল-আস্তাবল থেকে তাদের বার ক'রে নিয়ে আসে, সোজা তাড়িয়ে নিয়ে যায় পাহাড়ের দিকে ; পাহাড়ের ছায়াসুনিবিড় ঢাল ঘন তৃণাকীর্ণ, সকাল আকাশে উঠে আসার পরেও ঘাসেরা ডগায় ধ'রে রাখে শিশির। সে তখন তাকিয়ে থাকে গোরু-মোষের মন্থর ছড়িয়ে পড়া আর চ'রে চ'রে বেড়ানো, ঘাস খেতে-খেতে, ঘাসের মধ্যে হাঁটুডোবা ; আর সেখানে সে ক্রমে এমন কতগুলো উদ্ভিদ সম্বন্ধে প্রখর আগ্রহ গজিয়ে তুললো, যেগুলোর দিকে কেউ কোনোদিন নজরও করতো না। একটা শুঁটী গাছের ছায়ায় তার সক্ষম হাতটার কনুইতে ভর দিয়ে, পা ছড়িয়ে ব'সে, সে তার একমাত্র হাত দিয়ে চেনা ঘাসের দঙ্গলে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজতো অবজ্ঞায় মাড়িয়ে-যাওয়া আগাছাগুলোকে, আগে যাদের নিয়ে সে কখনো কিছু ভাবেনি। অবাক হ'য়ে সে আবিষ্কার করলো অদ্ভুত-অদ্ভুত সব আগাছার গোপন জীবন, যারা ছদ্মবেশ প'রে বিশৃঙ্খলা বাড়িয়ে দেয়, অন্যবেশ প'রে নিজেদের লুকিয়ে রাখে, খুদে-খুদে বর্মপরা কীটের যারা রক্ষক, সেই যারা পিঁপড়েদের পথ পরিহার ক'রে চলে। তার হাত জড়ো ক'রে আনে অনামা সব বীজ, গন্ধকমাখা উদ্ভট লতা, একবক্তি ধাণী লঙ্কা ; যে-সব লতা পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে জাল বোনে ; একলা সব ঝোপ, পাতাগুলো লোমেভরা, আমিষ, যারা রাত্তিরে ঘামতে শুরু ক'রে দেয় ; স্পর্শাতুর সব উদ্ভিদ—যারা এমনকী মানুষের গলা শোনবামাত্র চুপি চুপি বুজে যায় ; যে-সব বীজপুট ফট ক'রে ফেটে যায় মধ্যদিনে, যেন নখের চাপে ম'রে গেলো

কোনো নীলমাছি; সেই সব লতা যারা আঠালো রসকে জট বাঁধিয়ে বিনুনি পাকিয়ে থাকে রোদ থেকে অনেক দূরে। একজাতের লতা গায়ে ফুশকুড়ি গজিয়ে তোলে, আরেকটার ছায়ায় মাথা রেখে শোবামাত্র মাথা ফুলে ওঠে। কিন্তু, এখন, মাকান্দালকে যেটা সবচেয়ে আকৃষ্ট করলো, তার শ্যাওলা ও শিলীন্ধ্র। এমন ধরনের ছত্রাক আছে যাদের গায়ের গন্ধ যেন পচা কাঠের, কারু-বা গন্ধ কেমন ওষুধ-ওষুধ, ঝাঁঝালো, কারু-বা গায়ে মাটির তলার ভাঁড়ারের গন্ধ, কারু-বা গায়ে কেমনতর অসুখ-অসুখ—ভুঁইফোঁড় সব, মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছে, কেউ দেখতে কানের মতো, কারু চেহারা দেখে মনে হয় যেন ষাঁড়ের জিভ, কেউ দেখতে কোঁচকানো আঁচিলের মতো, ক্ষরণজমা, ক্ষরণছাওয়া, স্যাঁৎসেঁতে ফাটলের মধ্য থেকে খুলে ধরেছে তাদের আতপত্র, ব্যাঙের সব আবাস, যার তলায় তারা ঘুমোয় অথবা চোখ খুলে তাকিয়ে-তাকিয়ে সব ছাখে। মান্দিঙ্গটি একটা ব্যাঙের ছাতার মাংসল কোয়া গুঁড়ো করলো আঙুলের চাপে, আর তার নাকে এসে পৌঁছুলো বিষের একটা ঝাপটা। সে তার হাতটা বাড়িয়ে দিলে একটা গোরুর দিকে, গোরুটি সেটা শুঁকলো একবার, আর মাথাটা সরিয়ে নিয়ে পেছিয়ে গেলো, চোখে ভয়, নাকে ঘোঁৎ শব্দ। মাকান্দাল তুলে আনলো ঐ জাতের আরো ছত্রাক, তার গলার কাছ থেকে যে-কাঁচা চামড়ার ঝোলাটা ঝুলছে, তার মধ্যে সে তাদের রাখলো।

ঘোড়াদের নাওয়াবার ছুতো ক'রে তি নোয়েল ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেনরমঁ দ্য মেজির খামার থেকে কেটে পড়তো, এক হাতওলা লোকটার সঙ্গে এসে যোগ দিতো। তারা দুজনে হেঁটে চ'লে যেতো উপত্যকার কিনারে, যেখানে তরাই গেছে ভেঙে; জমিটা উবড়োখাবড়ো, আর পাহাড়গুলোকে ঘিরে রেখেছে গভীর সব গুহাগহ্বর—মাটি সেখানে যেন ঝাঁঝরা হ'য়ে গেছে ছ্যাদায়। তারা এসে থামলো এক বুড়ির বাড়িতে, বুড়ি একাই থাকে, আর দূর-দূর থেকে লোক আসে তার সঙ্গে দেখা করতে। দেয়ালে ভারি-ভারি দাঁড়ের ওপর লাল সব মিশেল, তারই ফাঁকে-ফাঁকে ঝুলছে কতগুলো তলোয়ার, ঘোড়ার পায়ের নাল, উল্কার শিলাখণ্ড, তারে তৈরি আংটায় ধ'রে-রাখা জং-ধরা চামচে, ক্রুশের আকারে সাজানো, যাতে ব্যারন সামদি, ব্যারন পিকঁ, ব্যারন লা ক্রোয়া প্রভৃতি গোরস্থানের প্রভুরা এ-ধারটা না-মাড়ায়। তার চামড়ার থলে থেকে বার ক'রে সব লতাপাতা, ব্যাঙের ছাতা, ওষধি-উদ্ভিদ মামান লোইকে দেখালো মাকান্দাল। বুড়ি খুব সাবধানে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলো তাদের, কোনো-কোনোটাকে থেঁৎলে

গুঁড়ো ক'রে শুঁকে দেখলো, কোনোটা-বা দেখবামাত্র ছুঁড়ে ফেলে দিলো। মাঝে-মাঝে কথা হ'তো অদ্ভুত সব জানোয়ার নিয়ে যারা মানুষের ছানা জন্ম দিয়েছে। আর কথা হ'তো তাদের নিয়েও, কতগুলো মন্ত্র প'ড়ে যারা জানোয়ার হ'য়ে যেতে পারে। প্রকাণ্ড সব শ্বাপদ ধর্ষণ করেছে স্ত্রীলোকদের, আর, রাত্তিরে, কথার বদলে বিকল্প দিয়েছে গররগর গর্জন। একটা গল্পের চরম পরিণতিতে পৌঁছুবার সময় মামান লোই একবার অদ্ভুতভাবে চুপ ক'রে গিয়েছিলো। কোনো রহস্যময় নির্দেশের উত্তরেই যেন সে চ'লে গিয়েছিলো রান্নাঘরে, ফোটানো তেলের টগবগে কড়াইতে ডুবিয়ে দিয়েছিলো তার দুই হাত। তি নোয়েল লক্ষ করেছিলো যে বুড়ির মুখে নির্বিকার উদাসীনতা ফুটে আছে, আর—যেটা আরো তাজ্জব—যখন সে তেলের কড়া থেকে তার দুই হাত বার ক'রে আনলো, তখন তাতে না-ছিলো কোনো ফোশকা না-ছিলো কোনো পোড়ো দাগ, অথচ এক মুহূর্ত আগেও তি নোয়েল নিজের কানে স্পষ্ট শুনেছিলো কিছু ভাজা হবার ভীষণ ছ্যাক-ছ্যাক শব্দ। মাকান্দাল যখন পুরো ব্যাপারটা এমন শান্তভাবে মেনে নিলে যে কিছুই অস্বাভাবিক নয়, তখন তি নোয়েলও চেষ্টা করলে তার স্তম্ভিত ভাবটা চেপে রাখতে। আর দিব্যি স্থিরভাবেই কথাবার্তা চলতে থাকে দুজনে—মান্দিঙ্গ আর ডাইনির মধ্যে; আর, মাঝে-মাঝে কেমন একটা প্রলম্বিত বিরতি নেমে আসে, যখন দুজনেই দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে অপলকে।

একদিন তারা লেনরমঁ দ্য মেজির কুত্তার দলের একটাকে গরমের মধ্যে পাকড়ালো। তি নোয়েল যখন কুকুরটার ওপর চেপে বসলো, দু-কান ধরে আঁকড়ে মাথাটা চেপে ধ'রে, মাকান্দাল তার ঝোলা মুখটা ঘষলো একটা পাথরের গায়ে, ব্যাঙের ছাতার রস যেটার রং ক'রে দিয়েছিলো হালকা হলুদ। কুকুরটার পেশীগুলো জড়িয়ে-মড়িয়ে কুঁকড়ে গেলো, তার শরীরটা দমকা কাঁপলো প্রচণ্ড বিক্ষেপে, তারপর সে চিৎপাত গড়িয়ে পড়লো—পাগুলো আড়ধরা, দাঁতগুলো বার-করা।

সেদিন বিকেলে তারা যখন খামারে ফিরছে, মাকান্দাল অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলো কলগুলোর দিকে ; কফি আর কাকাও দানা শুকোবার ছাউনিগুলো, নীল বানাবার রান্নাঘর, হাঁপরশালা, নেহাই, চৌবাচ্চা, আর মাংস জারাবার পাটাতনগুলো—এদের দিকে তাকিয়ে থেকে সে বললে, 'সময় হ'লো এতদিনে।'

পরদিন তারা যখন তার নাম ধ'রে হাঁক পাড়লে, সে আর সেখানে নেই।

ব্যাপারটায় তেমন গুরুত্ব না-দিয়ে মালিক কেবল অন্য নিগ্রোগুলোর জন্যই একটা দাসমৃগয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এক হাতওলা এক ক্রীতদাস—সে তো অতিশয় তুচ্ছ জীব। তাছাড়া এ-কথা তো সকলেই জানে যে মান্দিঙ্গ মাত্রেই একেকজন সুপ্ত ও সম্ভাব্য পলাতক। মান্দিঙ্গ কথাটা অবাধ্য একগুঁয়ে জেদী বিদ্রোহী এমনকী শয়তানেরই সমার্থক। সেই জন্যেই মান্দিঙ্গ ক্রীতদাসেরা বাজারে বিকোয় শস্তায়। তারা সবাই সারাক্ষণ স্বপ্ন ছাখে পাহাড়-পর্বতে পালিয়ে যাবার। সে যাই হোক, চারপাশে এত-সব খামার, বিকলাঙ্গটা কদ্দুরই বা যাবে? যখন তাকে পাকড়ে ফিরিয়ে আনা হবে, হিড়-হিড় ক'রে টানতে-টানতে, তখন অন্যদের সামনে তাকে এমন নির্যাতন করা হবে যে সে একটা দৃষ্টান্ত হ'য়ে থাকবে। কোনো একহাতওলা লোক তো একহাতওলা লোকই। ওর জন্যে দুটো ভালো মাস্টিফ হারাবার ঝুঁকিনেয়া—মাকান্দাল হয়তো তার কাটারিটা দিয়েই তাদের ঠাণ্ডা ক'রে দিতো—বেদম বোকামিই হ'তো।

৪

দেনা-পাওনা

মাকান্দাল উধাও হ'য়ে যাওয়ায় খুব দুঃখিত হ'য়ে পড়েছিলো তি নোয়েল। মাকান্দাল যদি ঘুণাক্ষরেও একবার তাকে তার সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করতো, তি নোয়েল সানন্দে মান্দিঙ্গের সেবা করার কাজটা লুফে নিতো। এখন তার মনে হ'লো মাকান্দাল তাকে নিশ্চয়ই নেহাৎই অকর্মণ্য বলে ভেবেছে, তাই তার সঙ্গে পরিকল্পনাটা ভাগ ক'রে নেয়নি। দীর্ঘ রাতগুলোয় যখন এই ভাবনাটা তাকে কুরে খেতো, সে আস্তাবলে যেখানটায় ঘুমোতো সেখান থেকে বেরিয়ে যেতো, আর, কাঁদতে-কাঁদতে, ঐ নর্ম্যান টাট্টুটার গলা জড়িয়ে ধ'রে, তার মুখ গুঁজে দিতো ঘোড়াটার উষ্ণ শুদ্ধগন্ধী বালামচিতে। মাকান্দালের অদৃশ্য হওয়া মানে তার বলা সব কাহিনীতে ফুটে-ওঠা জগৎটারও অদৃশ্য হ'য়ে যাওয়া। তার সঙ্গে-সঙ্গে উধাও হ'য়ে গেছে কাঙ্কান মুজা, আদনহুয়েসো, সত্যি-কার রাজার মতো দলনায়কেরা, আর হুইদার ইন্দ্রধনু। জীবন হারিয়ে ফেলেছে তার রস, তার স্বাদ; আর তি নোয়েল আবিষ্কার করলে যে রোব্বারের নাচগান

তার বিষম অসহ্য লাগে; সবসময় থাকে তার জানোয়ারগুলোর সঙ্গে, তাদের কান আর গুহ্যদ্বার সে এঁটেল পোকার হাত থেকে দারুণ চেষ্টা ক'রে সাফ রাখে। এইভাবে কেটে গেলো আস্ত বর্ষাকালটাই।

নদীরা যখন যে-যার খাতে ফিরে গিয়েছে, সেই সময়ে, একদিন, আস্তাবল-গুলোর ধারে, তি নোয়েলের সঙ্গে পাহাড়ের সেই বুড়ির দেখা হ'য়ে গেলো। সে মাকান্দালের কাছ থেকে তার উদ্দেশে এক বার্তা এনেছে। উত্তরে, ঠিক ভোর ফোটবার সময়, ছোকরা চ'লে গেলো সরুমুখ গুহাটায়, ওপর থেকে চুনাপাথরের জল নেমে এসে জ'মে-জ'মে অদ্ভুত ভাবে ঢেকে দিয়েছে মুখটা; সেটা মুখ ক'রে ছিলো ভেতরের গভীরতর আরেকটা মুখের দিকে, যেখানে পা ওপরে মুণ্ডু তলায় ঝুলে আছে একঝাঁক বাদুড়। মেঝেটায় সমুদ্রপাখির গুয়ের একটা পুরু আস্তর বেছানো, আর তার ওপর প'ড়ে শিলীভূত সব হাড়গোড় আর মাছের কাঁটার জীবাশ্ম। তি নোয়েল লক্ষ্য করলে, মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা মাটির জালা ও কলস; এই স্যাঁৎসেঁতে আঁধারে তা থেকে ঝিমধরা তিতকুটে ভার-ভারি একটা গন্ধ বেরুচ্ছে। ঝাউয়ের পাতার ওপর স্তূপ হ'য়ে প'ড়ে আছে গিরগিটির চামড়া। একটা মস্ত চ্যাপটা পাথরের পাশে প'ড়ে আছে কতগুলো মসৃণ গোল পাথর—কী সব ছেঁচবার জন্য সম্প্রতি তাদের ব্যবহার করা হয়েছে। কাটারি দিয়ে চেঁছে-চেঁছে বাকল-সাফ-করা একটা কাঠের টুকরোর ওপর প'ড়ে আছে খামারের খাতাঞ্চির কাছ থেকে চুরি ক'রে আনা একটা হিশেবখাতা, তার পাতায়-পাতায় কাঠকয়লায় আঁকা বড়ো-বড়ো সব চিহ্ন। তি নোয়েলের মনে প'ড়ে গেলো কাবো-র ওষধিওলার দোকান, তার পেতলে তৈরি মস্ত হামানদিস্তা, তাকে সাজানো ডাক্তারি সব বই, কুচিলা ফল আর হিঙের বোয়ম, দাঁত ব্যথা সারাবার জন্য শেকড়। শুধু যা নেই, তা হ'লো কোহলে চোবানো কিছু বিছে, গোলাপের নির্যাস, আর একটা চৌবাচ্চা ভর্তি জোঁক।

মাকান্দাল লোকটা রোগা পাৎলা, টিংটিঙে। তার পেশীগুলো এখন যেন হাড়ের আস্তরের ওপর ন'ড়ছে, তার কণ্ঠাটা বেরিয়ে আছে উগ্র, বেঢপ। কিন্তু তার মুখ—মোমের আলো তার ওপর জলপাইয়ের রং ফুটিয়ে তুলেছে—প্রকাশ করলো এক শান্ত সমাহিত সুখের ভঙ্গি। সে তার মাথায় জড়িয়েছে লাল এক বান্দানা, তার ওপর কয়েক গোছা পুঁতির মালা। সে যে একে-একে সমতলের সব ক্ষেতখামারেই গিয়েছে, সে-সব খামারে যারা কাজ করে তাদের সঙ্গে যোগা-যোগ ঘটিয়েছে, এটা একটুক্ষণের মধ্যেই টের পাওয়া গেলো; সে-রাতে

পালিয়ে যাবার পর থেকে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে এই মান্দিঙ্গ যে অবিশ্রাম অক্লান্ত-ভাবে পরিশ্রম করেছে, সেটা আবিষ্কার ক'রে তি নোয়েল তাজ্জব হ'য়ে গেলো। সে জানে যে দোন্দোর নীলকুঠিতে সে নির্ভর করতে পারে মালি ওলঁ্যার ওপর, গোলামখানার রাঁধুনি হ্রোম্যাঁর ওপর আর কামা জাঁ-পিয়েরের ওপর ; লেনর্মঁ দ্য মেজ্জির খামারে সে এত্তেলা পাঠিয়েছে তিন পোম্প্ ভাইদের কাছে বাঁকা-পা ফুলাহ্-টির কাছে, নতুন কঙ্গোলিটির কাছে, আর মারিনেৎ-এর কাছে—যে-মুলাটো মেয়েটি এতকাল মালিকের বিছানায় শুতো, কিন্তু এখন যাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ধোবিখানায়—জনৈক মাদমোয়াজেল দ্য লা মার্তিনিয়েরের আগমনে—উপনিবেশের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ার আগে ইনি ল্য হাব্-র-এর কনভেণ্টেই বদলি মারফৎ, আমমোক্তারনামায় সই ক'রে, মালিককে বিয়ে ক'রে বসেছিলেন ; ল্য বনে দ্য লেবেক-এর ওপাশে যারা থাকে, যাদের পাছায় জেব্রার ডোরা—ব্রাণ্ডি চুরি করার জন্যে তপ্ত লাল লোহা দিয়ে ছ্যাকা দেয়া হয়েছিলো যাদের—সেই দুই আঙ্গোলির সঙ্গেও সে যোগাযোগ করেছে। শুধু সে-ই যার পাঠোদ্ধার করতে পারে, এমন লিপিতে মাকান্দাল তার নথি সেরেস্তায় নাম বসিয়েছে মিলো-র বোকো-র আর এমনকী সেইসব পেশাদার পশু লুঠেরাদেরও, পাহাড় পেরুবার কাজে যারা ওস্তাদ—আর্তিবোনিতের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করার কাজে লাগবে তারা।

একহাতওলা লোকটা তার কাছ থেকে কী চায়, তি নোয়েল সেটা সেদিন জানতে পারলে। ঠিক তার পরের রোববারেই, প্রার্থনাসভা থেকে ফিরে মালিক জানতে পেলেন, খামারের দুটি সেরা জাতের দুধেল গাই—রুয়ঁ থেকে আনা, সেই যাদের ল্যাজ ছিলো শাদা—তাদের নাদির স্তূপের মধ্যে মুখ গুঁজড়ে মরছে—তাদের মুখ থেকে অনবরত ফেনা বেরুচ্ছে, বমি বেরুচ্ছে। তি নোয়েল তাঁকে ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালে যে ভিনদেশী জন্তুরা অনেক সময় চিনতে পারে না কোন ঘাস ভালো আর কোন ঘাস রক্ত বিষিয়ে দেয়।

৫

পাতাল থেকে ডাক

গরল হামাগুড়ি দিয়ে এগুলো উত্তরের সমভূমিতে, হামলা করলো যত চারণ-ভূমিতে আর খোঁয়াড়ে আস্তাবলে। কেউ জানে না কেমন ক'রে সে এসে পড়লো তৃণে-পল্লবে, তেকলাপাতার উদ্ভিদপুঞ্জে ; কেমন ক'রেই বা মিশে গেলো খড়ের আঁটিতে, অথবা বেয়ে উঠলো জাবনায় বা বাসনকোশনে। তথ্য এটাই যে, গোরুবাছুর, বলদমোষ, ঘোড়া বা ভেড়ার পাল শয়ে-শয়ে মরছে, সারা গ্রামগঞ্জকে ভ'রে দিয়েছে মরা মাংসের এক নাছোড় দুর্গন্ধে। রাত্তির নামলেই জ্বালানো হয় বিশাল সব আগুনের কুণ্ড, আর শিখা ছড়িয়ে দেয় এক ভারি, চাপা, তৈলাক্ত ধোঁয়া, শিখায় লাল-হ'য়ে-যাওয়া ক্ষুরের রাশির মধ্যে আস্তে-আস্তে নিভে আসে স্তূপ-স্তূপ মিশকালো করোটি, পোড়া অস্থিপঞ্জর। কাবো-তে লতা-পাতার গুণ জানে যে-সব ওঝা ও গুণিন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ওস্তাদরা মিথ্যেই খুঁজে বেড়ালো, লতাপাতা, রজন, গাছ কাটার পর বেরিয়ে আসা দুধ—এদের মধ্যে কোনটা ব'য়ে বেড়াচ্ছে মড়ক। জানোয়ারগুলো অনবরত থুবড়ে পড়ছে, একের পর এক, উদরগুলো স্ফীত, ভনভন ক'রে তাদের ঘিরে উড়ে বেড়াচ্ছে নীলমাছি। গাছের ডাল, ছাতের কাঠ সজীব হ'য়ে উঠেছে বিশাল সব কালো-কালো নির্লোম পাখিতে, ওঁৎ পেতে আছে কখন শিকার পড়ে থুবড়ে, কখন ফেটে যায় চামড়া ; টান-টান, প্রায় ফেটে যাচ্ছে, এমন চামড়া তারা ছিঁড়ে দেয় তাদের ধারালো চঞ্চু দিয়ে, নতুন পচা গন্ধের ঢাকা খুলে দেয়।

অচিরেই বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়লো সকলের মধ্যে, জানা গেলো যে গরল হানা দিয়েছে বাড়িঘরের অন্দরেও। একদিন সন্ধেয়, তাঁর বৈকালীন ভোজনের পর, কক-সাঁং খামারের মালিক আচমকা থুবড়ে পড়লেন প্রাণহীন, আগে কখনো শরীর খারাপ বলেননি, যে-ঘড়িটায় দম দিচ্ছিলেন, পড়বার সময় সেটাও তাঁর হ্যাঁচকা টানে প'ড়ে গিয়েছিলো মেঝেয়। আশপাশের খামারে খবরটা পৌঁছুবার আগেই, অন্য মালিকরাও পর-পর পড়লেন বিষের প্রকোপে—বিষ যেন ওঁৎ পেতে আছে, যেন এক্ষুণি লাফিয়ে পড়বে শিকারের ওপর, বিষ আছে রাতচৌকির পাশের গেলাশে, শুরুয়ার বাটিতে, ওষুধের শিশিতে, রুটির মধ্যে,

মদে, ফলমূলে, ঘুনে। সারাক্ষণ শোনা যাচ্ছে কফিনের গায়ে পেরেক ঠোকার অলুক্ষুণে আওয়াজ। রাস্তার মোড়ে-মোড়ে চোখে পড়ছে অন্ত্যেষ্টি মিছিল। কাবো-র গির্জেগুলোয় সারাক্ষণ যা শোনা যায় তা অন্ত্যেষ্টির মন্ত্র আর বিলাপ, আর শেষকৃত্য সবসময়েই পৌঁছোয় দেরি হ'য়ে যাবার পর, যখন দূরে দূরে ঘণ্টার ঢং ঢং ঘোষণা ক'রে দেয় নতুন মৃত্যু। যাজকদের হ্রস্ব ও সংক্ষিপ্ত ক'রে দিতে হ'লো সৎকারবিধি, যাতে ক'রে সমস্ত শোকবিহ্বল পরিবারেরই যত্ন নেয়া যায়। সারা সমভূমি জুড়ে ওঠে একই শোকাচ্ছন্ন প্রার্থনাগীত, এখন তা রূপান্তরিত হয়েছে বিভীষিকার আরতিতে। কারণ আতঙ্ক শুকিয়ে ফেলেছে মুখচ্ছবি, দম আটকে ফেলছে গলায়। রাস্তায়-রাস্তায় ওঠা-নামা করছে রুপোর ক্রুশপ্রতীক, আর তার ছায়ায়, সবুজ বিষ, হলুদ বিষ, অথবা এমন বিষ যার কোন রংই নেই, বুকে হেঁটে এগুচ্ছে, নেমে আসছে, রান্নাঘরের চিমনি বেয়ে, পিছলে ঢুকে যাচ্ছে বদ্ধ ঘরের ফাটল দিয়ে, যেন কোনো অপ্রতিরোধ্য লতা ছড়িয়ে যেতে চাচ্ছে ছায়ায়, চাচ্ছে কায়াকে ছায়ায় বদ্‌লে দিতে।

—রুদাইদের টানা বিলাপ চলেছে তো চলেইছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, যেন কোনো অলুক্ষুণে যমল গীতের ডুকরানি।

ভয়ে মরায়া হতাশ, মদে বেহেড মাতাল—কারণ কুয়োর জল খাবারও আর সাহস নেই কারু—ঔপনিবেশিকরা চাবকাচ্ছে তাদের ক্রীতদাসদের, নির্যাতন করছে, হাড়ে বেড়াচ্ছে কোনো-একটা ব্যাখ্যা। কিন্তু গরল পরিবারগুলোকে হ্রাস ক'রে চললো, বয়স্ক বা শিশু—কারু রেহাই নেই—সবাইকেই সে মুছে দিচ্ছে। জ্বরতপ, ডাক্তারবদ্যি, ব্রত-মানৎ, সন্তদের দোহাই, কিংবা কোনো ব্রিটন খালাশির বেফায়দা মন্তর-তন্তর, ওঝা ভান গুণিন—কেউই মৃত্যুর গোপন অগ্রসর ঠেকাতে পারলো না। গোরস্থানের শেষ কবরটাকে দখল ক'রে নেবার অনিচ্ছুক তাড়ায় মাদাম লেনরুঁ ছ মেজি মারা গেলেন বুধবারে, একটা বিশেষ লোভনীয় সুস্বাদু কমলা চেখে দেখার পর, চির-অন্তর্গত কোনো-একটা হাত যেটা রেখেছিলো তাঁর নাগালের মধ্যে। সমভূমিতে যেন ঘোষিত হয়েছে জরুরি অবস্থা। সূর্যাস্তের পর যদি কাউকে দেখা যায় মাঠে ঘাটে অথবা বাড়িঘরের আশপাশে হাঁটতে, তবে সাবধান না-ক'রেই তাকে গুলি ক'রে মারা হচ্ছে। কাবো-র গড় থেকে সেনাবাহিনী এসে রাস্তায়-রাস্তায় কুচকাওয়াজ ক'রে বেড়াচ্ছে, হাস্যকরভাবে স্পর্শাতীত শত্রুকে শাসাচ্ছে বীভৎস মরণ। কিন্তু গরল, অতীব অপ্রত্যাশিত সব পথ ধ'রে, মুখ অব্দি উঠে আসছে। একদিন ছ্য পেরিন্‌ই পরিবারের আটজনে

তাকে পেলে আপেলের রসের একটা পিপেয়, সদ্য জেটিতে ভেড়া একটা জাহাজের খোল থেকে যেটাকে তারা নিজের হাতে নামিয়ে এনেছিলো। শটন আর পচন দখল ক'রে বসেছে সারা তল্লাট।

একদিন বিকেলে তারা যখন হুকম দিলে যে তার পাছায় তারা একতাল গাদাবন্দুকের গুলি ঠুশে দেবে, বাঁকা-পা ফুলাহ্‌টি শেষ অব্দি সব কথা ফাঁস ক'রে দিলে। মাকান্দাল, সেই যার একটা হাত নেই, সেই স্লো কিনা এখন হ'য়ে উঠেছে রাদাদের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের এক 'বুনগান', এখন তার মধ্যে সুদে খাটছে পরামানুষিক সব শক্তি ও ক্ষমতা, কেননা বেশ কিছুবার তার মধ্যে ভর করেছিলেন বড়ো-বড়ো সব দেবতারা, আর তাই এখন সে নিজেই হ'য়ে উঠেছে গরলদেব। অপর তীরের শাসকদের চরম কর্তৃত্বে ভরপুর, সে ঘোষণা করেছে উচ্ছেদের জিহাদ, শাদাদের একেবারে নির্মূল ক'রে দেবার জন্য এখন সে নির্বাচিত, সে-ই এখন আদিষ্ট হয়েছে সান্তো দোমিঙ্গোতে স্বাধীন নিগ্রোদের এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য। হাজার-হাজার ক্রীতদাস তাকে অক্ষের মতো মানে। বিষের অগ্রগতি রোধ করার সাধ্যি কারু নেই।

এই উদ্‌ঘাটন খামারের মধ্যে কশাঘাতের ঘূর্ণিঝড় লেলিয়ে দিলে। আর, গনগনে রোষে ছোঁড়া গাদাবন্দুকের জমকালো গুলি যখন কালো খোচরটির নাড়িভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিলে, এল্ কাবো-র উদ্দেশে এক দূত পাঠানো হ'লো। চারপাশে যত পুরুষ পাওয়া গেলো, সেই বিকেলেই সবাইকে জড়ো করা হ'লো মাকান্দালকে খুঁজে বার করতে। সবুজ মাংস, পোড়া ক্ষুর, কৃমি-কীটের দুর্গন্ধে ভরা সমভূমি প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠলো ডালকুত্তোর ঘেউ-ঘেউ আর প্রচণ্ড দেবনিন্দা ও খিস্তিতে।

রূপান্তরগুলো

কয়েক হপ্তা ধ'রে এল্ কাবো-র গড়ের সেনাবাহিনী আর খামারমালিকদের তল্লাশি দল, দেওয়ান, খাতাঞ্চি আর উপদর্শকেরা পুরো তল্লাটটা একেবারে চ'ষে ফেললো—প্রতিটি গাছ, সব নয়ানজুলি, সমস্ত আখের ক্ষেত তন্নতন্ন ক'রে তারা খুঁজে দেখলো : মাকান্দালের কোনো হদিশ নেই কোথাও। তার ওপর, এখন,

যেহেতু সবাই জানে বিষের উৎস কী, বিষ তার আক্রমণ স্থগিত রাখলো—বিষ ফিরে গেলো কোনো বোয়মে, ঐ একহাতের মানুষটি হয়তো তাকে পুঁতে ফেলেছে কোথাও, মাটির তলার আঁধার নিশীথিনীতে হয়তো এখন টগবগ ক'রে ফুটছে সে, গত কিছুদিন ধ'রে যে হ'য়ে উঠেছিলো কত-কত জীবিতের মৃৎরাত্রি। সন্ধেবেলায় পাহাড় থেকে ফিরে আসে ডালকুত্তো আর মানুষের দল, দেহের প্রতিটি রোমকূপ থেকে অবসাদ আর হতাশার ঘাম ঝরাতে-ঝরাতে। এখন যেহেতু মৃত্যু আবার তার স্বাভাবিক ছন্দ খুঁজে পেয়েছে—তার লয় এমনিতে দ্রুত হয় শুধু তখনই যখন মাঘের কোনো দগদগে হিম হাওয়া ব'য়ে যায়, অথবা হুখোড় বর্ষা নিয়ে আসে তুমুল জর; সেনাবাহিনীর সঙ্গে যে বাধ্য হ'য়ে আঁতাৎ করতে হয়েছে তাতে হতাশ্বাস হ'য়ে খামারমালিকরা নিজেদের সঁপে দিলে পানোল্লাসে ও প্রমারায়। অশ্লীল গান, তাশের বাজিতে জোচ্চুরি, নিগ্রো মেয়েরা যখন ধোয়া গেলাশ নিয়ে আসে তখন তাদের স্তনমর্দন—এই সবেরই ফাঁকে-ফাঁকে তারা তাদের বাপ-ঠাকুর্দার বীরমহিমার কাহিনী আওড়ায়, একদিন যারা কার্তেজেনার লুঠতরাজে অংশ নিয়েছিলো অথবা পকেটে পুরেছিলো স্পেনের রাজার সম্পত্তি, যখন কাঠের পা ঠকঠক করতে করতে পিয়েৎ হেইন চমৎকার বানিয়ে তুলেছিলো সেই দুর্ধর্ষ উৎকাঙ্ক্ষা দুশো বছর ধ'রে পূর্বপুরুষেরা যার স্বপ্ন দেখে আসছিলো। মদের দাগে ভরা টেবিলে পাশার খেপের ফাঁকে-ফাঁকে তারা পান করলে লে'সূনমব্র্যাক, বের্এঁ হুজুর', আর দ্যু হ্রোসে-র উদ্দেশে আর—সেইসব রামশবুক পুরুষদেরও উদ্দেশে যারা নিজেদেরই উদ্যোগে একদিন পত্তন করেছিলো এই উপনিবেশ, যাদের কাছে নিজেদের অভিলাষই ছিলো আইন, শেষ কথা, যারা পারী-র অনুশাসন অথবা 'কৃষ্ণ সংহিতা'র মোলায়েম তিরস্কারে কখনোই কোনো পাত্তা দেয়নি। আর চৌকি বা বেঞ্চির তলায়, কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুমোনো কুকুরগুলো উপভোগ করছিলো চোখা-চোখা ফলাওলা বকলশ না পরার স্বাধীনতা।

সিয়েস্তার আলস্য আর গাছের ছায়ায় পানভোজন—মাকান্দালের তল্লাশিতে ঢিলে পড়ে গেলো। কয়েক মাস কেটে গেলো, তার কোনো সাড়া নেই। কেউ ভাবলে সে বুঝি দূরে কোথাও দুর্গম ভেতরটায় চ'লে গিয়েছে, বিশাল-সব শিখর-দেশের মেঘমেদুর উচ্চতায়, সেই যেখানে নিগ্রোরা নাচে কান্দাঙ্গো কাস্তানেৎ-এর তালে-তালে। অন্যরা বললে 'বুন্গান' নিশ্চয়ই কোনো পালতোলা জাহাজে চেপে সটকেছে, এখন হয়তো জাকমেল এলাকায় গিয়ে কারবার ফেঁদেছে,

যতদিন তাদের মুন চেখে দেখে আটকে রাখা যায়, ততদিন যেখানে জমি চাষ করে মরা মানুষরা। অথচ তবু ক্রীতদাসগুলোর হাবেভাবে দেখা গেলো উদ্ধত এক খোশমেজাজ। যাদের কাজ ছিলো গম পেষাই বা আখ মাড়াইয়ের ছন্দ বানানো তারা এমন ক্ষিপ্র হাতে আগে কখনও ঢাক পেটায়নি। রাত্তিরে তাদের ছাউনি আর কুঠুরি থেকে নিগ্রোরা একে আরের সঙ্গে তথ্য চালাচালি করে, সঙ্গে থাকে প্রবল উল্লাস, আর অদ্ভুত যত খবর: একটা সবুজ গিরগিটি নাকি তামাক পাতার গোলার ছাতে পিঠ গরম ক'রে শুয়েছিলো; কেউ সেদিন দিনে-দুপুরে দেখেছে এক পেল্লায় নিশিপোকা উড়ে বেড়াচ্ছে হাওয়ায়; এক তাগড়াই কুকুর—তার সব লোম কাঁটা দিয়ে উঠেছে—বাড়ির মধ্য থেকে হুড়মুড় ছুটে বেরিয়ে এসেছিলো, মুখে ছিলো হরিণের মাংসের মস্ত এক রাং; এক গাংচিল—সমুদ্র থেকে এত দূরে! তাজ্জব!—পেছনের বারান্দায় লতাপাতার ওপর ডানা থেকে উকুন ঝেড়ে ফেলে চ'লে গিয়েছে।

সবাই তারা জানতো যে সবুজ গিরগিটি, নিশিপোকা, অদ্ভুত কুকুর বা অবিশ্বাস্য গাংচিল আসলে নানারকম ছদ্মবেশ ছাড়া আর কিছু নয়। আর মাকান্দাল যেহেতু নানারকম চেহারা নিতে পারে—ক্ষুরওলা জন্তু, পাখি, মাছ অথবা পোকামাকড়ের—অতএব সে রোজরাতে আসে সমভূমির খামারে, তার বিশ্বাসী অনুচরদের ওপর নজর রাখতে, আর এটাও জেনে নিতে যে, সে যে একদিন ফিরে আসবে, এ-বিষয়ে এখনও তাদের পুরোপুরি আস্থা আছে কি না। এই ঐ রূপান্তর, যাতেই হোক না কেন, এই একহাতের মানুষটি আছে সাবধানে—বিশেষত এখন যখন তার জীবজন্তুর ছদ্মবেশ পরার অতিলৌকিক ক্ষমতা আছে। একদিন ডানা নেড়ে, অন্যদিন খুরে ঠকাঠক তুলে, কদম-কদম বা বুকে হেঁটে, সে এবার প্রভু হ'য়ে উঠেছে পাতালের সব স্রোতগুলোর, আর এইভাবেই সে এখন শাসন করে সারা দ্বীপ। অসীম তার ক্ষমতা। সে যেমন অনায়াসেই পারে কোনো মাদী ঘোড়ার সঙ্গে সংগম করতে, তেমনি পারে কোনো চৌবাচ্চার ঠাণ্ডায় বিশ্রাম করতে; যেমন দুলতে পারে কোনো দোদুল ডাল থেকে তেমনি গ'লে যেতে পারে কোনো চাবির ফোকর দিয়ে; কুকুররা তাকে দেখে ঘেউ-ঘেউ করে না; ইচ্ছেমতো সে বদলে ফেলতে পারে তার ছায়া। এই-যে এক নিগ্রো মেয়ে এমন-এক ছেলের জন্ম দিলে মুখটা যার বুনো বরার, সে তো তারই জন্য। রাত্তিরে সে দেখা দেয় রাস্তাঘাটে, গায়ে কোনো ছাগলের চামড়া, মাথায় দাউ-দাউ আগুনের শিং। একদিন সে নিশ্চয়ই দেবে মহাবিদ্রোহের সংকেত, আর ঐ

দূর অতীতের প্রভুরা—যাঁদের পুরোভাগে আছেন পথের দেবতা দম্বোলা আর তলোয়ারের দেবতা ওগুন—তাঁরা নিয়ে আসবেন বজ্র আর বিদ্যুৎ আর লাগাম ছিঁড়ে বার ক'রে দেবেন ঘূর্ণিঝড় যা মানুষের হাতের সব কাজ চুকিয়ে দেবে। সেই মহান লগ্নে—তি নোয়েল বললে—শাদাদের রক্ত ব'য়ে ঝরনা দিয়ে, আর লোয়ারা —আনন্দে উচ্ছল—সেই ঝরনায় গুঁজে দেবে তাদের মুখ, আর যতক্ষণ না ফুশফুশ ভ'রে যাবে কানায়-কানায়, পান ক'রেই চলবে একটানা।

উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা চার বছর টিকে ছিলো, আর উদ্‌গ্রীব কানগুলো কখনো বিশাল শঙ্খধ্বনি শুনবে না ভেবে হতাশ হয়নি, যে-কোনো মুহূর্তে পাহাড় থেকে পাহাড়ে শঙ্খ নির্ঘোষে সবাইকে জানানো হবে যে অবশেষে মাকান্দাল তার রূপান্তরের বৃত্ত পুরোপুরি সম্পূর্ণ করেছে, আর উদ্যত, সে দাঁড়িয়েছে আবার, কঠিন, পেশল, কাঙরায় টান-টান, শিলাখণ্ডের মতো অণ্ডকোষ, তার মানুষী পায়ের ওপর।

৭

মানুষী বেশ

ধোবানি মারিনেৎকে আবার দিন কয়েকের জন্য শোবার ঘরে পুনর্বাহাল করবার পর, মঁসিয়ে লেনরুঁ ছ মেজি, লিমোনাদ-এর পল্লীযাজকের ঘটকালি মারফৎ আবার বিয়ে করেছেন—এক ধনী বিধবাকে, খোঁড়া আর পতিপ্রাণা। ফলে, সেবারকার ডিসেম্বরে যখন প্রথম উত্তুরে হাওয়ারা ঝাপটা দিতে লাগলো, বাড়ির দাসদাসীরা, নতুন মালকিনের ছড়ির নির্দেশনায়, প্রভঁসের সন্তদের পর-পর সাজাতে শুরু করলো, কাগজের মণ্ডে তৈরি একটা সুড়ঙ্গের মুখে—তার গায়ে তখনও গরম-গরম আঠার গন্ধ—বড়োদিনের ছুটির সময় বাইরের ছাঁইচের ওপর যেগুলোকে আলো দিয়ে সাজানো হবে। সিন্দুকনির্মাতা তুস্যাঁ কাঠের গায়ে কুঁদে-কুঁদে বানিয়েছে ত্রিপ্রজ্ঞাবান, কিন্তু জিশুর জন্মোৎসবের তুলনায় তারা মাপে বড্ড বড়ো হ'লো ব'লে শেষটায় তাদের আর দাঁড় করানো হ'লো না—প্রধানত বালথাসারের চোখের ভয়াবহ শাদার জন্যই—সেটা বিশেষ যত্ন নিয়ে রং করা হয়েছিলো, আর সেটা দর্শকদের ওপর এমন একটা ছাপ ফেলতো যেন সে

জলেডোবা মানুষের ভয়াবহ তিরস্কার নিয়ে আবলুশ কালো রাত্তির থেকে উঠে এসেছে। তি নোয়েল, এবং বাড়ির অন্য ক্রীতদাসেরা, জিশুর জন্মকাহিনীর অগ্রগতি লক্ষ করলো; মনে-মনে জানে যে উপহারের দিন আর মাঝরাতের সমবেত প্রার্থনার লগ্ন আসন্নপ্রায়, যে-সময় অতিথবিতিথের আনাগোনায় আর উৎসবের হৈ-হুল্লোড়ে মালিকদের কড়া শৃঙ্খলা একটু ঢিলে হ'য়ে যায়, যার ফলে রশুইখানায় ঝলশানো শুওরের কান হাতিয়ে নেয়া কঠিন হয় না, অথবা পিপের ছিপি খুলে এক চুমুক মদ টানতেও অসুবিধে হয় না, কিংবা রাত্তিরে ছুট ক'রে ঢুকে পড়া যায় নতুন-কেনা আঙ্গোলিনীর আস্তানায়, ছুটির পরে মালিক যাকে খ্রীস্টান প্রথামতোই বলাৎকার করবেন। কিন্তু তি নোয়েল তো জানে যে এ-সময়ে যখন মোমগুলো জালানো হবে এবং সুড়ঙ্গের সোনা যখন ঝিলিক ছিটোবে, তখন তিনি আশপাশে থাকবেন না। তিনি সে-রাতে থাকবেন অনেক দূরে, ছ্যা ফ্রেনেদের খামারের মচ্ছবটায়, প্রতিজনে এক গেলাস ক'রে ইস্পানি ব্র্যাণ্ডি দিয়ে মালিকের বাড়ির প্রথম মরদের জন্ম উদ্‌যাপন করার জন্য।

Roulé, roulé, congoa roulé!
Roulé, roulé, congoa roulé!
A fort ti fille ya danse congo ya-ya-ro!

ঢু-ঘণ্টারও ওপর ঢাকগুলো বুম-বুম ক'রে চলেছে মশালের আলোয়, মেয়েদের কাঁধ তালে-তালে এমনভাবে নেচেছে যেন তার কাপড় ধোবার জন্য আছড়াচ্ছিলো এতক্ষণ, এমন সময় মুহূর্তের কাঁপন জেগে উঠলো গায়কদের গলায়। জননী ঢাকটার আড়াল থেকে উঠে দাঁড়ালো মাকান্দালের মানুষী মূর্তি। সেই মান্দিঙ্গ, মাকান্দাল। মানুষ মাকান্দাল। এক হাতওলা মানুষ। পুনরুত্থিত। রূপান্তরিত। পুনর্নব। কেউ তার সঙ্গে কথা বললো না, কিন্তু তার দৃষ্টি মিললো সকলের দৃষ্টির সঙ্গে। আর, ব্র্যাণ্ডির গেলাশগুলো হাতে-হাতে চ'লে এলো তার ঐ সবেধন হাতটির দিকে, যে জেনেছে দীর্ঘ, অন্তহীন এক পিপাসা। তার ঐ রূপান্তরগুলোর পর এই প্রথম তাকে চোখে দেখলো তি নোয়েল। রহস্যময় সব আস্তানায় ঘাপটি মেরে থাকায় কী একটা চিহ্ন যেন লেপ্টে আছে তার গায়ে, তার এই পর-পর আঁশ, কাঁটা, লোম, ক্ষুরের বেশ প'রে নেবার চিহ্ন। তার চিবুক নিয়ে নিয়েছে এক শ্বাপদ তীক্ষ্ণতা, তার চোখগুলো যেন একটু বাঁকা হ'য়ে গেছে কপালের ওপর দিকে, ঠিক সেই পাখিগুলোর মতো যাদের বেশ সে ধরেছিলো: মেয়েরা তার সামনে দিয়ে গেলো একবার, আবার গেলো, তাদের

দেহ হিল্লোলিত হ'য়ে উঠেছে নাচের ছন্দে। কিন্তু হাওয়া প্রশ্নের পর প্রশ্নে এমনই আকীর্ণ হ'য়ে ছিলো যে, আচমকা, আগে থেকে কিছু ঠিক না-করা সত্ত্বেও, সকলের গলা ঢাকের আওয়াজ ছাপিয়ে যোগ দিলে এক গম্ভীর ডুকরানিতে—'ইয়েনভালো'য়। চার বছর অপেক্ষার পর, মন্ত্র হ'য়ে উঠেছে অপরিসীম দুঃখ বেদনার এক প্রবল আবৃত্তি:

Yenvaló moin Papa!
Moin pas mangé q'm bambo
Yenvaló, Papa, yenvaló moin!
Ou vlai moin lavé chandier,
Yenvaló moin?

'আমাকে কি পিপেগুলো ধুয়ে যেতেই হবে? আমাকে কি বাঁশগুলো খেয়ে যেতেই হবে?' যেন তাদের আঁৎ থেকে পেঁচিয়ে টেনে বেরিয়ে এসে প্রশ্নগুলো একটা আরেকটাকে হুড়মুড় ক'রে মাড়িয়ে যাচ্ছে—সমস্বরে ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে বন্দী মানুষদের সেই চরম দুমড়ে যাওয়া হতাশা, যাদের দিয়ে গ'ড়ে তোলা হয়েছে পিরামিড, মিনার বা অন্তহীন সব প্রাচীর। 'হায় তাত, তাত আমার, কত দীর্ঘ এই রাস্তা! হায় তাত, তাত আমার, কত দীর্ঘ এই দুঃখযন্ত্রণা!' এত বিলাপের মধ্যে তি নোয়েল ভুলেই গিয়েছিলো যে শাদাদেরও কান আছে। সেইজন্যেই, দ্য ক্রেনেদের বিশাল বাড়িটার বারান্দায় সব গাদাবন্দুক, সেকেলে একনলা, আর পিস্তলে ঠাশা হ'লো বারুদের বল, এইমাত্র যাদের নামিয়ে আনা হয়েছে দেয়ালে তাদের খোপ থেকে। আর সবরকম বেকায়দার মোকাবিলা করার জন্য রেখে যাওয়া হ'লো ছুরি, কাটারি, বল্লম, মুগুরের এক বিশাল সরবরাহ, যে মেয়েরা এর মধ্যেই আওড়াতে শুরু করেছে প্রার্থনা, আর মান্দিঙ্গের গ্রেফতারের জন্য ঈশ্বরের কাছে কাকুতিমিনতি।

৮

মহা উড়াল

জানুয়ারির এক সকালবেলায়, দিন ফোটবার একটু আগে থেকেই, উত্তরের সমভূমির সব খামারের ক্রীতদাসেরা এল্ কাবো-য় প্রবেশ করতে শুরু করলো। ঘোড়ার পিঠে তাদের তদারক ক'রে নিয়ে এসেছে তাদের মালিক আর উপদর্শকেরা, সঙ্গে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত প্রহরীর দল, ক্রীতদাসেরা কালো ক'রে তুলতে শুরু করেছে নগরীর চৌকো চত্বর, আর সামরিক কাড়ানাকাড়া থেকে উঠছে গম্ভীর আওয়াজ। কিছু সৈন্য একটা কেব্রাচো গাছের খুঁটির নিচে জড়ো করছে শুকনো ডালপালা, অন্যরা একটা পেতলের গামলায় এনে ফেলছে জ্বালানি। বড়ো গির্জেটার সামনের থামগুলোর মধ্যে, ধনুর্বন্ধনী দিয়ে টান ক'রে টাঙানো অন্ত্যেষ্টি চাঁদোয়ার ছায়ায় লম্বা-লম্বা আরামকেদারায় রাজ্যপালের পাশে ব'সে আছেন সব বিচারক ও রাজপ্রতিনিধির দল এবং ধর্মসভার উঁচু থেকে নিচু মাতব্বরেরা পর-পর। ঝুলবারান্দাগুলোয় ন'ড়ে যাচ্ছে ঝলমলে সব আতপত্র, যেন জানলার টবে সাজানো ফুলগুলোরই উৎফুল্ল হিল্লোল। যেন কোনো এক বিশাল প্রেক্ষাগৃহে এসে মেয়েরা এই খোপ থেকে ঐ খোপের কাউকে লক্ষ ক'রে বলছে, তাদের দস্তানা ঢাকা হাতে পাখা, সশব্দে কিচিরমিচির করছে সবাই, গলাগুলো উপভোগ্যভাবে উত্তেজিত। যাদের বাড়ির জানলা চত্বরের একেবারে মুখোমুখি, তারা অতিথিদের জন্য তৈরি করেছে লেমোনেড আর পেস্তাবাদাম দেয়া সরবৎ। নিচে, ঠাশাঠাশি দাঁড়িয়ে, প্রতিক্ষণে ঘেমে-নেয়ে অস্থির, নিগ্রোরা অপেক্ষা করছে প্রদর্শনীটার, তাদেরই জন্য তো এই উৎসব, এই জমকালো অনুষ্ঠান—যার জাঁকজমকের জন্য অকাতর অর্থব্যয়ে একফোঁটাও কার্পণ্য করা হয়নি। কারণ এবার শিক্ষাটা ঠুঁসে দিতে হবে এদের হাড়ে-মজ্জায়,—আগুন দিয়ে, রক্ত দিয়ে নয়, আর মনে রাখবার জন্য জ্বালানো কোনো-কোনো দেয়ালি তো বেশ ব্যয়সাপেক্ষই।

একটা নির্দিষ্ট সময়ে সব পাখা একসঙ্গে সশব্দে মুড়ে গেলো। সামরিক কাড়ানাকাড়ার আড়ালে এক বিশাল স্তব্ধতা। মাকান্দাল, তার কোমর জড়িয়ে আছে ডোরাকাটা পাৎলুন, দড়িতে আর গিঁটে শক্ত ক'রে বাঁধা, সাম্প্রতিক ক্ষতগুলোর দরুন চকচক করছে তার চামড়া, এগিয়ে এসেছে চত্বরের ঠিক

মাঝখানে। মালিকদের চোখ জিজ্ঞাসায় হাৎড়ালো ক্রীতদাসদের মুখ। কিন্তু নিগ্রোরা দেখালো এক বিদ্বেষভরা ঔদাসীন্য। নিগ্রোদের ব্যাপার-স্যাপার কী জানে, কতটা জানে শাদারা? তার রূপান্তরগুলোর আবর্তনে, মাকান্দাল মাঝে-মাঝেই ঢুকেছিলো কীটপতঙ্গের রহস্যময় জগতে, তার মানুষী হাতের অভাব সে পূরণ করেছিলো অনেকগুলো পায়ে, চারটে ডানায় অথবা লম্বা-লম্বা শুঁড়ে। সে হ'য়ে উঠেছিলো মাছি, প্রজাপতি, কেন্নো, পিঁপড়ে, টারাণ্টুলা, কাচপোকা, এমনকী ফসফরের সবুজ আলো ছড়িয়ে জোনাকি। যখন লগ্ন আসবে, খ'শে পড়বে মান্দিঙ্গের সব বন্ধন : খুঁটির গা বেয়ে হড়কে পড়ার আগে, হাওয়ার মধ্যে কোনো মানুষমূর্তির আকার হাৎড়াতে-হাৎড়াতে, বন্ধনগুলো দেখবে দখলে রাখবার জন্য কোনো শরীর নেই আর। আর, মাকান্দাল,—এক ভনভনে মশায় রূপান্তরিত—শাদাদের হতাশাকে টিটকিরি দিয়ে নেমে পড়বে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের ত্রিচূড় টুপিটায়। এই কথাটাই জানে না মালিকরা; এইজন্যেই এই অবান্তর অপ্রয়োজনীয় প্রদর্শনীটার আয়োজন ক'রে, এত টাকা অপব্যয় ক'রে, শাদারা হাতে-নাতে টের পাবে যে মহান লোয়াস যার গায়ে পবিত্র তেল মাখিয়ে দিয়েছেন, তার কাছে তারা কেমন সর্বাঙ্গীনভাবে অসহায়।

এবার মাকান্দালকে ঠেশে আটকানো হয়েছে খুঁটির গায়ে। জল্লাদ সাঁড়াশি দিয়ে তুলে ধরেছে এক জ্বলন্ত অঙ্গার। আগের দিন সন্ধ্যায় আয়নার সামনে মহড়া দিয়ে-দিয়ে রাজ্যপাল যে-ভঙ্গিটা নিখুঁত করেছিলেন, সেই ভঙ্গিতে রাজ্যপাল কোষ থেকে খুললেন তাঁর পোশাকি অসিটা, আর দণ্ডাজ্ঞা পালনের আদেশ দিলেন। আগুন জেগে উঠতে শুরু করলো মান্দিঙ্গের দিকে, তার পা চেটে-চেটে। সেই মুহূর্তে মাকান্দাল এক ভয়াবহ মুদ্রায় নাড়ালে তার কাটা হাতের গুঁড়িটা, সেটা তারা দড়ি দিয়ে বাঁধতে পারেনি, আংশিক হওয়া সত্ত্বেও ভঙ্গিটা ভয়াবহ; অজানা সব মন্ত্র ডুকরে উঠলো সে, প্রচণ্ডভাবে সামনে চেতিয়ে ধরলো তার ধড়। বাঁধনগুলো খ'শে প'ড়ে গেলো, নিগ্রোটির শরীর উড়ে গেলো শূন্যে, আর মাথার ওপর দিয়ে উড়াল দিলে সে কিছুক্ষণ, তারপরেই ঝাঁপিয়ে পড়লো ক্রীতদাসদের সমুদ্রের কালো ঢেউয়ের মধ্যে। একটা ধ্বনি পরিয়ে দিলো ভহর :

'মাকান্দাল বেঁচে গিয়েছে!'

হুলুস্থুল প'ড়ে গেলো তারপর। প্রহরীরা বন্দুকের কুঁদো বাড়িয়ে পড়লো ডুকরে-ওঠা ক্রীতদাসদের মধ্যে—তারা এখন রাস্তা ভাসিয়ে যাচ্ছে, উঠে পড়ছে এমনকী জানলা অব্দি। আর শোরগোল আর চীৎকার আর হৈ-রৈ এমনই

হ'লো যে খুব কম লোকেই দেখতে পেলো যে মাকান্দাল—তাকে পাকড়ে ধ'রে রেখেছিলো দশ-দশজন সৈন্য—প্রথমে আগুনে ঠুসে ঢোকানো হয়েছে তার মাথা, আর তার চুল চেটে খেয়ে লেলিহান শিখা ডুবিয়ে দিয়েছে তার শেষ আর্ত চীৎকার। ক্রীতদাসদের মধ্যে যখন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হ'লো, তখন আগুন জ্বলছে স্বাভাবিক, যেমন জ্বলে আগুন, ভালো কাঠ খেতে পেলে, আর সমুদ্র থেকে বওয়া হাওয়া তুলে নিয়ে যাচ্ছে ধোঁয়া জানলাগুলোর দিকে, যেখানে একাধিক মহিলা তখন মূর্চ্ছা থেকে ফিরে আসছেন চেতনায়। আর কিছুই কোথাও আর দেখবার নেই।

সেদিন বিকেলে ক্রীতদাসেরা সারা রাস্তা হাসতে-হাসতে ফিরে এলো খামারগুলোয়। মাকান্দাল তার কথা রেখেছে, এই মর্তের রাজত্বেই সে থেকে গেছে। আরো-একবার শাদাদের ভেলকি দেখিয়ে দিয়েছে অন্য তীরের বিশাল শক্তিরা। আর যখন মঁসিয় লেনর্মঁ দ্য মেজি তাঁর রাতটুপিতে কান ঢেকে তাঁর পতিপ্রাণা স্ত্রীকে বললেন, নিজেদের জাতের কাউকে পুড়িয়ে মারতে দেখেও নিগ্রোদের কোনো অনুভূতি হয়নি—তা থেকে মানবজাতির বৈষম্য ও অসাম্য সম্বন্ধে কতগুলো দার্শনিক তত্ত্বও খাড়া করলেন তিনি, যা লাতিন বুলির মাখন মাখিয়ে জম্পেশ ক'রে তৈরি করেছেন—ঠিক তখন, তি নোয়েল রশুইঘরের ছুকরিদের একটাকে যমজ বাচ্চা উপহার দিলে, আস্তাবলের মস্ত জাবনাটার ওপর মেয়েটিকে ফেলে সে পর-পর তিনবার রেতঃপাত করেছিলো।

দ্বিতীয়

…আমি তাঁকে বললুম যে ওখানে তিনি রানী হবেন; যে তিনি ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন পাল্কিতে; যে তাঁর ক্ষুদ্রতম ভঙ্গি দেখেই কোনো ক্রীতদাস তাঁর সব অভিলাষ পূরণ ক'রে দেবে; যে তিনি হেঁটে বেড়াবেন মুকুল ধরা কমলালেবুর বনে; যে সাপখোপের কোনো ভয় নেই তাঁর—আন্তিইয়েতে কোনো সাপ নেই; যে জংলীদের ভয় পাবার কিছু নেই; যে ওখানে লোকজনকে শূলে বিঁধিয়ে ঝলশানো হয় না; শেষটায় আমি আমার কথা এই ব'লে শেষ করলুম যে ক্রেয়োলদের মতো সাজলে তাঁকে খুবই রূপসী দেখাবে।

—মাদাম দ্য ব্রাঁতেস

১

মিনোস আর পাসিফাঙ্গয়ের দুহিতা

মঁসিয় লেনর্ম দ্য মেজির দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যুর খুব বেশি পরে নয়, তি নোয়েলকে যেতে হয়েছিলো এল্ কাবোতে: সরকারি উৎসব উপলক্ষে ব্যবহার করার জন্য পারী থেকে কিছু জিন ও লাগাম সরাসরি আনতে হুকুম করা হয়েছিলো—সেগুলো আনবার জন্য। এ-ক-বছরের মধ্যেই দারুণ উন্নতি হয়েছে শহরের, প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি। প্রায় সব বাড়িঘরই দোতলা—বিশাল ছাইচওলা অলিন্দ আর উঁচু ধনুকের মতো খিলানে বসানো দরজা, চকচকে ছিমছাম খিল আর পাল্লা, আর মাথার ওপর দিকটা তেফলা পাতার মতো। আরো কত দরজি, টুপিওলা, পালককর্মী, কেশ প্রসাধক: একটা দোকানে আবার ভেওলা আর আড়বাঁশিও বেচে, সেই সঙ্গে কঁৎব্রদাস আর সোনাটার স্বরলিপি। বই-

বিক্রেতারা সাজিয়ে রেখেছে সান্তো দোমিঙ্গো গেজেটের সর্বশেষ সংখ্যা—পাংলা কাগজে ছাপা, চারপাশে লতাপাতার সীমারেখা, আর ফাঁক-ফাঁক ক'রে সাজানো খবর। আর, বিলাস ব্যসনের আরো এক দফা, রু ভঁদ্রেইয়ে খোলা হয়েছে নাটক আর অপেরার জন্য এক নাটমঞ্চ। রু দে এস্পানিওলের জন্য এই সমৃদ্ধি বিশেষ সৌভাগ্যসূচক—ওস্তাদ বাবুর্চি অঁরি ক্রিস্তফ তার পুরোনো মালকিন মাদমোয়াজেল মঁজঁএর কাছ থেকে সস্তা কিনে নিয়েছে ওবের্জ্ দ্য লা কুরন্, সেখানে সবচেয়ে বড়োলোক অতিথিরা আস্তানা পাড়ে। নিগ্রোর রান্নার খ্যাতি দারুণ; পারী থেকে সদ্য-আগত কোনো অতিথির মনোরঞ্জনের জন্য সে যেমন চমৎকার মশলা ফোড়ন দেয় রান্নায়, তেমনি, দ্বীপের অন্য তীর থেকে যখন কোনো বুভুক্ষু ইস্পানি আসে, আগেকার দিনের বোস্টেটেদের মতো সাজপোশাক গায়ে, তার রান্নায় তখন থাকে মালমশলার ঝাঁজানো প্রাচুর্য। তাছাড়া, উঁচু শাদা টুপি-পরা, অঁরি ক্রিস্তফ, ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার রসুইঘরে, কেমন যেন জাদু জানে, যখন সে রাঁধে কচ্ছপের ভলো-ভঁ অথবা বনপায়রা। আর যখন সে নিজে হাত দেয় মেশাই-বাটিতে, তার ফোটানো মশলার খুশবু ছড়িয়ে যায় এমনকী রু দে ত্রোয়া ভিসাজ অব্দি।

আরো-একবার শোকাহত, মঁসিয় লেনর্ম দ্য মেজি, প্রিয় বিয়োগের স্মৃতিতে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা না দেখিয়েই, এল্ কাবো-র নাটমঞ্চের এক অক্লান্ত দর্শক হ'য়ে উঠলেন; সেখানে পারীর নটীরা গান করে জাঁ জাক রুশোর আরিয়া অথবা পর্বার্ধের মাঝখানে থেমে, কপাল থেকে ঘাম মুছতে-মুছতে, উঁচু গলায় শোনায় আচ্ছন্ন বিধুর আলেক্সান্দ্রাইন ছন্দ। কারু-একটা বেনামি মানহানির কবিতা-কোনো-কোনো বিপত্নীকের ছ্যাঁকছোঁক ভাবকে বিকার দিয়ে, জগতের কাছে উন্মোচিত করলে এই তথ্য যে, সমভূমির জনৈক থামারমালিক নিত্যই নৈশ সান্ত্বনা লাভ করছেন মাদমোয়াজেল ফ্লরিদরের রসালো শাঁসালো ফ্লেমিস সৌন্দর্যের মধ্যে—যে কিনা কোনো শ্রীছন্দ ছাড়াই বিশ্বস্ত সহচারীর ভূমিকায় অভিনয় ক'রে যায়, যার নাম সব সময় দেখা দেয় ভূমিকালিপির সবচেয়ে শেষে, কিন্তু রতি-শিল্পে যার প্রতিভা নাকি তুলনাহীন। তারই প্ররোচনায় মালিক অপ্রত্যাশিত-ভাবে একদিন, পালাগানের মরশুম শেষ হ'তেই, পারী চ'লে গেলেন, থামারের তদারকির ভার দিয়ে গেলেন এক আত্মীয়ের হাতে। কিন্তু, অদ্ভুত কিছু-একটা ঘটেছিলো নিশ্চয়ই তাঁর। কয়েকমাস পরেই, রোদ, খোলামেলা জমি, প্রাচুর্য, আদেশ-অনুজ্ঞা, আখের খেতের ধারে পেড়ে-ফেলা নিগ্রো মাগিরা—এ-সবের

জন্য কামনা বেড়েই চললো, তাঁকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলো যে, এত বছর ধ'রে উদ্‌গ্রীবভাবে যা তিনি মনে মনে পুষছিলেন, সেই 'ফ্রান্সে-ফিরে-আসা', তাঁর কাছে আদৌ আর সুখের চাবি নয়। উপনিবেশকে এত শাপশাপান্ত করার পর, এর আবহাওয়াকে এত গালাগাল দেবার পর, আর হঠাৎ-নবাব উপনিবেশওলাদের স্থূলতাকে এত অবজ্ঞা ও ঘৃণা করার পর, তিনি শেষটায় থামারেই ফিরে এলেন, সঙ্গে নিয়ে এলেন অভিনেত্রীটিকে, পারীর নাটুকে দলগুলো তাঁকে দলে রাখতে অস্বীকার করেছে, তাঁর অভিনয় ক্ষমতার সুপ্রকাশ অভাবের জন্য। আর তাই, রোববারগুলোয়, দুটো চমৎকার ঘোড়ার গাড়ি, চাপরাশ-আঁটা কোচোয়ান সমেত, গির্জেয় যাবার ছলে আবার সমভূমির পথঘাট সুশোভিত ক'রে তুললো। মাদমোয়াজেল ফ্লরিদরের সুবিধের জন্য—তিনি আবার মঞ্চের নামটি ব্যবহার করতেই বাধ্য করতেন—দশটি মুলাটো যুবতী কুঁকড়ে-মুকড়ে ব'সে থাকতো পেছনের আসনে, অবিশ্রাম কিচিরমিচির ক'রে কী সব কথা বলতো, আর তাদের নীল পেটিকোট উড়তো হাওয়ায়।

এ-সবের মধ্যেই কেটে গেছে কুড়িটি বছর। এক রাঁধুনির গর্ভে তি নোয়েল পয়দা করেছে বারোটি ছেলেমেয়ে। আগের চেয়েও অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে খামার, তার রাস্তাগুলোর ধারে-ধারে বসানো হয়েছে ইপিকাক, আর তার লতাপাতার রস থেকে এর মধ্যেই বানানো হচ্ছে টক-টক এক সুরা। তবু, বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছিট বেড়েছে মঁসিয় লেনরমঁ দ্য মেজির, বড্ড বেশি মদ খান। এক অনন্ত রতিকামনায় ভোগেন তিনি, ক্রীতদাসগুলির ডাঁশা ছুঁড়িগুলোর পেছনে সারাক্ষণ হাঁসফাঁস করেন, তাদের গায়ের গন্ধ তাঁকে পাগল ক'রে দেয়। পুরুষদের ওপর দৈহিক শাস্তি ও লাঞ্ছনার পরিমাণ তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন অনেক গুণ, বিশেষ ক'রে যারা বিবাহের বাইরে সংগম করে। এদিকে অভিনেত্রী, ম্যালেরিয়ার কামড়ে বিলীয়মানা, তাঁর অভিনয়কলার ব্যর্থতার শোধ তোলেন সেই নিগ্রো মেয়েদের ওপর যারা তাঁকে স্নান করায়, চুল আঁচড়ে পরিপাটি করে বেঁধে দেয়, একটু ছুতো পেলেই যাদের তিনি চাবকাতে হুকুম করেন। কোনো-কোনো রাতে বোতল আঁকড়ে ধরেন তিনি। সে-সময় তাঁর পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক হ'তো না সব ক্রীতদাসকে বেরিয়ে আসতে বলতে—পূর্ণিমার চাঁদের তলায়, আঙুরের কড়া মদের হেঁচকির ফাঁকে-ফাঁকে, তাঁর বন্দী শ্রোতাদের সামনে সেই বিখ্যাত ভূমিকাগুলো তিনি অভিনয় ক'রে দেখান, যেগুলো তাঁকে কখনও করতে দেয়া হয়নি। সহচরীর ওড়নায় ঢাকা, ছোটো-ছোটো ভূমিকার ভীরু অভিনেত্রী

কাঁপা-কাঁপা চড়া গলায় আক্রমণ ক'রে বসে চেনাশোনা সব কারদানি দেখাবার নাট্যাংশ :

Mes crimes de´sormais ont comble´ la mesure
Je respire a` lafois l'inciste et l'imposture
Mes homicides mains, promptes a` me venger,
Dans le sang innocent brulent de se plonger.
[রাশি-রাশি পাপাচার উপচে পড়ে চারপাশে এখনি।
ওতপ্রোত ভ'রে আছে ভণ্ডামি ও অজাচারে। শুধু দিন গণি,
লাঞ্ছনার শোধ নেবে—এই ভেবে তাপিত, অধীর
জিঘাংসু এ-দুই হাত কবে ছানবে নির্দোষ রুধির।]

তাজ্জব হ'য়ে, হা ক'রে, এ-সব যে কী, কিছুই বুঝতে না-পেরে, কিন্তু দু-একটা টুকরো-টাকরা কথা থেকে, যা ক্রেয়োলেও বোঝায় কিছু-কিছু কুকাজ, যার শাস্তি হয় কশাঘাত থেকে মুণ্ডচ্ছেদ অব্দি সবকিছুই, নিগ্রোরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলো যে মহিলা অতীতে নিশ্চয়ই অজস্র পাপ করেছিলেন, আর এখন যে উপনিবেশে এসেছেন তা নিশ্চয়ই কেবল পারীর কোতোয়ালির নাগাল এড়াবার জন্যই, এল্ কাবো-র অনেক বেশ্যার মতোই, রাজধানীর সঙ্গে যাদের দেনাপাওনার হিশেবপত্র পুরোপুরি ঢোকেনি। দ্বীপের পাতোয়াতে 'পাপ' কথাটা একই ; সবাই জানে ফরাশি ভাষায় বিচারককে কী বলে ; আর নরক বা লাল শয়তানরা—তাদের তো চাক্ষুষ ভাবেই বর্ণনা ক'রে দেখিয়েছিলেন মঁসিয় লেনরমঁ দ্য মেজি-র দ্বিতীয়া পত্নী, শরীরের সব লালসা ও পাপাচারের তিনি ছিলেন দারুণ কড়া এক নিন্দুক। এক শাদা ঢোলা জামা গায়ে—মশালের আলোয় যেটা পুরোপুরি স্বচ্ছ—এই স্ত্রীলোকটি যে স্বীকারোক্তি দিচ্ছে তার কিছুই খুব আধ্যাত্মিক উন্নতিসূচক নয় :

Minos, juge aux enfers tous les pales humains,
Alv, combien fremira son ombre e´pouvante´e,
Lorsqu'il verra sa fille a` ses yeux pre´sente´e,
Contrainte d'avouer tant de forfaits divers,
Et des crimes peut-etre inconnus aux enfers !
[মিনোস বিচার করে মানুষের আত্মাকে, পাতালে।
হায়, তার প্রেতচ্ছায়া শিউরে ওঠে নির্নিমেষ চোখে
সমুখে তাকিয়ে দ্যাখে যবে তার লাঞ্ছিত শিশুকে—

নরকও জানেনি কভু অভিশপ্ত যে-ক্রিয়াকলাপ,
বহুবিধ যে কলুষ হীন কাজ, হীনতর পাপ,
সব দেখে, প্রতিশোধে বদ্ধপরিকর···]

এমন অধর্মাচরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, লেনর্‌মঁ দ্য মেজির ক্রীতদাসেরা মাকান্দালের প্রতি শ্রদ্ধায় নিষ্ঠায় অবিচল থেকে গেলো। তি নোয়েল মান্দিঙ্গর কাহিনী হস্তান্তরিত ক'রে দিলে তার ছেলেমেয়েদের কাছে, তাদের শিখিয়ে দিলে সরল সব ছোটো-ছোটো গীতি ও গাথা, মাকান্দালের সম্মানে সে-সব গান বেঁধেছে সে নিজেই, আস্তাবলে ঘোড়াদের বালামচি আঁচড়াতে-আঁচড়াতে। তাছাড়া, একহাতওলা ঐ মানুষটার স্মৃতি সবুজ ও সতেজ রাখা ভালো কাজ, কারণ যদিও সে এখন জরুরি কাজে দূরে কোথাও ব্যস্ত হ'য়ে আছে, এই দেশে সে ফিরবেই একদিন—আচমকা—যখন লোকে তার প্রত্যাশা করবে সবচেয়ে কম।

২

সুগম্ভীর চুক্তি

মোর্‌ণ রুজের শৈলশিরায় বরফ গড়িয়ে পড়ার মতো বজ্রের করতালি প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো আর তারপর আস্তে-আস্তে ম'রে যাচ্ছিলো নয়ানজুলিগুলোর গভীরে, যখন উত্তরের সমভূমির বিভিন্ন খামারের প্রতিনিধিরা—তাদের কোমর অব্দি কাদায় মাখামাখি—ভিজে লেপটে যাওয়া জামা গায়ে, ঠাণ্ডায় কাঁপতে-কাঁপতে, পৌঁছুলো বোয়া কাইমঁ-র একেবারে হৃৎপিণ্ডে। ব্যাপারটাকে আরো অধম করবার জন্য অগস্টের বৃষ্টি—কখনো তা পড়ে উষ্ণ, কখনো-বা ঠাণ্ডা হিম, হাওয়া যেমন যেমন বদলে যায়—ক্রীতদাসদের জন্য সান্ধ্য নিষেধাজ্ঞা বাজবার পর থেকেই ক্রমবর্ধমান প্রকোপের সঙ্গে মুষলধারে পড়তে শুরু করেছে। তার পাৎলুন কুঁচকিতে লেপটানো, তি নোয়েল চেষ্টা করছিলো কেম্বিস কাপড়ের একটা বস্তাকে কানঢাকা টুপির মতো মাথায় জড়িয়ে নিয়ে মাথাটা বাঁচাতে। অন্ধকার সত্ত্বেও, কোনো খোচর এসে যে জমায়েতে ভিড়ে পড়বে, এমন সম্ভাবনা আদৌ নেই। যাদের বিশ্বাস করা যায়, চারপাশে শুধু তাদেরই কাছে বার্তা পৌঁছেছে—

একেবারে শেষ মুহূর্তে। যদিও গলার স্বর অনেকটাই নামানো, তবু কথাবার্তার গুঞ্জন জঙ্গলকে ভ'রে দিয়েছিলো—কম্পমান পাতার ওপর বৃষ্টি পড়ার সবছাপানো একটানা আওয়াজের সঙ্গে তা মিলে-মিশে যাচ্ছিলো।

ছায়ামূর্তিদের সেই অধিবেশনে হঠাৎ সবাইকে ছাপিয়ে উঠলো কার প্রবল গলা—মাঝখানের স্তরপরম্পরা ছাড়াই এ-কণ্ঠস্বর চ'লে যেতে পারে কড়ি থেকে কোমলে, কথার মধ্যে অদ্ভুত ঝোঁক দেবার জন্য খাদ থেকে চ'লে এসে স্বর উড়ে যায় রিনরিনে পর্দায়। ছিলো অনেক মন্ত্রঃপূত নিয়তি, এবং ভাষণের জাদু ছি অনেকটাই ক্রুদ্ধ উচ্চারণ আর চীৎকারে ভরা। কথা যে বলছে, সে বুকমান, জ্যামেকার লোক। যদিও বাজের আওয়াজ ডুবিয়ে দিচ্ছে আস্ত-আস্ত বাক্যাংশ, তি নোয়েল তবু অন্তত এটা বুঝতে পারলে যে কিছু-একটা ঘটেছে ফ্রান্সে, এবং খুবই প্রবল প্রতাপশালী কোনো মহোদয় ঘোষণা করেছেন যে নিগ্রোদের তাদের স্বাধীনতা দিতে হবে, কিন্তু এল্ কাবো-র ধনী জমিমালিকেরা, তারা সবাই রাজতন্ত্রের কুত্তিদের বাচ্চা, সেই হুকুম মানতে অস্বীকার করছে। এইখানে এসে বুকমান কয়েক মুহূর্ত বৃষ্টি প'ড়ে যেতে দিলে গাছপালার ওপর, যেন সে অপেক্ষা ক'রে আছে সেই বিদ্যুতের জন্য যা শেলাই ক'রে দেবে সমুদ্রের ফাঁক। তারপর যখন বজ্র গেলো মিলিয়ে, সে বললে যে, আফ্রিকার মহান লোয়াদের সঙ্গে একটা চুক্তি হয়েছে—জলের এপারে যারা আছে দীক্ষিত তাদের সঙ্গে—লক্ষণ শুভ দেখতে পেলেই যুদ্ধ শুরু ক'রে দেবার জন্য। আর তার চারপাশে যে হর্ষধ্বনি ও সম্বর্ধনা উঠলো, তারই মধ্য থেকে এলো এই চূড়ান্ত ভর্ৎসনা :

'গোরাদের ভগবান হুকুম করেছে দুষ্কৃতি। আমাদের দেবতারা আমাদের কাছে চান প্রতিশোধ। দেবতারাই পরিচালিত করবেন আমাদের বাহু, আমাদের দেবেন সাহায্য। গোরাদের দেবতার মূর্তি ধ্বংস ক'রে ফ্যালো—আমাদের অশ্রুর জন্যই সে পিপাসু ; এসো, আমাদের নিজেদের গভীরে আমরা কান পেতে শুনি স্বাধীনতার আবেদন।'

প্রতিনিধিরা ভুলেই গেছে যে বৃষ্টি পড়ছে টপটপ, চিবুক থেকে উদরে কোমরবন্ধের চামড়ায় আড় ধরিয়ে দিচ্ছে। ঝড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো এক ডুকরে-ওঠা ধ্বনি। বুকমানের পাশে দাঁড়িয়ে এক কৃশতনু দীর্ঘাঙ্গী নিগ্রোরমণী নেড়ে যাচ্ছিলো পার্বণী কাটারি :

Fai Ogoun, Fai Ogoun, Fai Ogoun, O !
Damballah m'ap tiré canon,

Fai Ogoun, Fai Ogoun, Fai Ogoun, O !

Damballah m'ap tire canon !

লৌহ-আকরের ওগুন, বীর যোদ্ধা ওগুন, নেহাইয়ের ওগুন, ওগুন—সর্বাধিনায়ক, ভল্লবীর ওগুন, ওগুন-চাঙ্গো, ওগুন কাঙ্কানিকান, ওগুন বাতালা, ওগুন-পানামা, ওগুন বাকুলে—সবাইকে এখন স্মরণ করলো, মিনতি করলো রাদা-র এই স্ত্রীপুরোহিত :

Ogoun Badagri
Général Sanglant,
Saizi Z'orage
Ou Scell'orage

Ou fait Kataoun z'éclai !

কাটারিটা হঠাৎ ব'সে গেলো একটা কালো শুওরের পেটে, তিনটে আর্তনাদ ক'রে সে বার ক'রে দিলো তার নাড়িভুঁড়ি আর কলজে আর ফুশফুশ। তারপর, এক-এক ক'রে প্রতিনিধিদের ডাকা হ'লো তাদের মালিকদের নাম ধ'রে—কেননা তাদের তো অন্যকোনো নামই আর নেই; প্রতিনিধিরা এগিয়ে এলো পর-পর, শুওরের সেই ফেনিল রক্তে ঠোঁট ভিজিয়ে নেবার জন্য—একটা কাঠের ডেকচিতে রক্ত ধ'রে রাখা হয়েছিলো। তারপর তারা উপুড় হ'য়ে পড়লো ভিজে মাটির ওপর। তি নোয়েলও, অন্যদের মতো, চিরকাল বুকমানকে মেনে চলবে ব'লে শপথ করলে। জ্যামেকার মানুষটি তখন তার বাহুতে জড়িয়ে ধরলো জঁা-ফ্রঁাসোয়া, বিয়াসু আর জ্যানোকে—তারা আজ রাতে আর খামারে ফিরবে না। অভ্যুত্থানের সাধারণ কর্মপরিষদের নাম ঘোষণা করা হ'লো। সংকেত দেয়া হবে আটদিন পরে। দ্বীপের অন্য প্রান্ত থেকে, ইস্পানি ঔপনিবেশিকদের কাছ থেকে সাহায্য আসার সম্ভাবনা আছে, তারা ফরাশিদের জিগরি দুশমন। আর এই তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, একটা ঘোষণা ও সনদ রচনা করা জরুরি—অথচ কেউই জানে না কেমন ক'রে কিছু লেখে, এমন সময় কার যেন মনে প'ড়ে গেলো আবে দ্য লা অঙ্গকে, দোন্দোর তিনি ধর্মযাজক, তিনি ভলতেয়ারের ভক্ত, যেদিন তিনি পড়েছেন মানবাধিকারের ঘোষণা, সেদিন থেকেই তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে নিগ্রোদের উদ্দেশে সহানুভূতি জানিয়ে এসেছেন—এবং, তাঁর একটি হাঁসের পালকের কলম আছে।

বৃষ্টি যেহেতু স্ফীত ক'রে দিয়েছে নদীর প্রবাহ, তি নোয়েলকে, তাই, সেই

আঠালো জলের ঝরনা সাঁৎরে পেরুতে হ'লো—যাতে উপদর্শকদের ঘুম ভাঙবার আগেই আস্তাবলে পৌঁছুতে পারে। উষার ঘণ্টাধ্বনি দেখতে পেলো, সে গান গাইছে, ব'সে আছে ক্ষেতে, টাটকা এস্পার্তো ঘাসের স্তূপে কোমর গোঁজা, যে ঘাসের গায়ে রৌদ্রের গন্ধ মাখা।

৩

শঙ্খনির্ঘোষ

এল্ কাবোতে শেষ যে-বার গিয়েছিলেন, সেই থেকেই মঁসিয় লেনরমঁ দ্য মেজির মেজাজ একেবারে তিরিক্ষি হ'য়ে আছে। রাজ্যপাল ব্লাঁশলঁ—তিনি তাঁরই মতো রাজতন্ত্রী—সব ধৈর্যের সীমা পেরিয়ে গেছেন; পারীর ঐ সব কল্পরাজ্যভক্ত খাশিগুলোর বাষ্পোচ্ছল কথায় নিগ্রো ক্রীতদাসদের প্রেমে তাদের বুক থেকে যেন রক্ত ঝরে। প্যালে রয়্যালের তোরণের তলায় অথবা কাফে দ্য লা রেজেঁসের তাশের বাজির ফাঁকে-ফাঁকে মানবজাতির সাম্য সম্বন্ধে স্বপ্নদেখা কত সহজ। দিগ্‌দর্শকচিরকুট হাওয়ায় ফোলানো গালের ট্রাইটন-শোভিত আমেরিকার বন্দরগুলোর দৃশ্যপরম্পরা; উচ্ছল বুকফোলানো ডবকা মুলাটো কিশোরী আর ন্যাংটো ধোবানিদের ছবি দেখে, অথবা আব্রাহাম ব্রুনিয়াসের আঁকা কলাবাগানের ছায়ায় সিয়েস্তা—ফ্রান্সে যার প্রদর্শনী হয়েছিলো দ্য পার্নির কবিতা আর 'Professi m of Faith of the savogard vicar' ('স্যাভয়-এর পল্লিযাজকের বিশ্বাসের জীবিকা')-এর সঙ্গে—এইসব থেকে মনশ্চক্ষুতে দেখা নেয়া ভারি সহজ যে সান্তো দোমিঙ্গো হ'লো 'পৌলবর্জিনী'র সেই পত্রশোভিত ভূস্বর্গ, যেখানে তরমুজগুলো যে গাছের ডাল থেকে ঝোলে না তার কারণ একটাই, কারণ এত উঁচু থেকে মাথায় পড়লে পথচারীদের তা মেরেই ফেলতো। ভলতেয়ারের বিশ্বকোষের তত্ত্বকথায় ভরপুর উদারনৈতিকদের দিয়ে ঠাশা নির্বাচিত পরিষদ যে মাসে ভোট দিয়েছে যে নিগ্রোরা, মুক্ত ক্রীতদাসদের ছেলেরা, রাজনৈতিক অধিকার পাবে। আর এখন, খামারমালিকদের ভয়দেখানো গৃহযুদ্ধের প্রেতচ্ছায়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, এই পরাদৃষ্টিবাজেরা, ফ্রেইম্‌ফেনের স্তানিস্লাউসের

কেতায়, উত্তর দিয়েছে : 'আদর্শের চাইতে বরং উপনিবেশের ধ্বংসই শ্রেয়তর'।

তখন নিশ্চয়ই রাত দশটা হবে, যখন মঁসিয় লেনর্মঁ দ্য মেজি, তাঁর তিতকুটে সব ভাবনাচিন্তার জাবর কেটে-কেটে অবসন্ন, বেরিয়ে গেলেন তামাকপাতার আড়তে, বলাৎকারের জন্য কোনো-একটা ছুঁড়িকে যদি জোটানো যায়, বাবা যাতে চিবোতে পারে এই জন্যে যে এতরাতে কয়েকটা পাতা চুরি করতে এসেছে। অনেক দূর থেকে ভেসে এলো এক শঙ্খের নির্ঘোষ। যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য, সেই মন্থর বিলম্বিত ধ্বনির উত্তরে পাহাড়-জঙ্গল থেকে আরো শঙ্খের আওয়াজ উঠলো। আর, তারপর, আরো ধ্বনি ভেসে এলো দূর-দূরান্ত থেকে, সমুদ্রতীর থেকে, মিলো-র খামারের দিক থেকে। যেন উপকূলের সব শঙ্খ, সব ইণ্ডিয়ান লাম্বি, সব রক্তিম শঙ্খ—যা বাড়ির সামনের সিঁড়ির ধাপের রেলিঙে লাগানো, সব শাঁখ—যা প'ড়ে আছে একা-একা, শিলীভূত, পাহাড়ের চূড়ায়-শিখরে, সব একসঙ্গে, সমস্বরে, গান গাইতে শুরু ক'রে দিয়েছে। হঠাৎ, আ.রকটা শঙ্খ খামারের প্রধান বস্তি থেকে তুলে ধরলো তার ধ্বনি। অন্যরা, আরো উঁচু পর্দায়, উত্তর দিলে নীলকুঠি থেকে, তামাকের আড়ত থেকে, আস্তাবল থেকে। মঁসিয় লেনর্মঁ দ্য মেজি, ভয় পেয়ে, বুগানভিলিয়ার একটা ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন।

বস্তির সব দরজা একসঙ্গে দড়াম ক'রে খুলে গেলো, ভেতর থেকে খিল ভেঙেই। লাঠিশোঁটা হাতে ক্রীতদাসেরা ঘিরে ধরলো উপদর্শকদের বাড়িগুলো, কেড়ে নিলো সব হাতিয়ার। খাতাঞ্চি—সে বেরিয়ে এসোছিলো পিস্তল হাতে —সে-ই পড়লো প্রথম, তার গলাটা রাজমিস্ত্রির কর্ণিকে লম্বালম্বি এফাঁড়-ওফোঁড়। গোরার রক্তে হাত রাঙিয়ে নিগ্রোরা ছুটে এলো বড়ো বাড়িটার দিকে, তারা মৃত্যু চ্যাচাচ্ছে মালিকের, রাজ্যপালের, ঈশ্বরের, জগতের সব ফরাশির। কিন্তু, কতকালের পিপাসার প্রবল তাড়ায়, তাদের বেশির ভাগই ছুটে গেছে মাটির তলার ভাঁড়ারে—মদের খোঁজে। শাবলের ঘা নোনামাছের পেটিগুলো সাবাড় ক'রে দিলো। কাঠ মুচড়ে তোলা, পিপেগুলো ফিনকি দিয়ে ছোটালো মদের ধারা, মেয়েদের ঘাঘরার আঁচল রাঙিয়ে দিলো। ঠেলাঠেলি আর চ্যাচামেচির মধ্যে ছিনিয়ে নেয়া, সরুগলা ব্র্যাণ্ডির বোতল অথবা পেটমোটা খড়েমোড়া রামের বোতল দেয়ালে ঘা দিয়ে ভাঙা হ'লো। হেসে, ধাক্কাধাক্কি ক'রে, নিগ্রোরা পা হড়কে পড়লো টোম্যাটোর চাটনি, গন্ধ চা, হেরিঙের ডিম, মশলার পাতার ওপর—একটা চামড়ার ভিস্তি থেকে পচা তেলের স্রোত বেরিয়ে প'ড়ে আঠালো

মাটির মেঝেকে পিছল ক'রে গেছে। উলঙ্গ এক নিগ্রো রসিকতা ক'রে লাফিয়ে পড়লো একটা চর্বির গামলায়। একটা মাটির বাসন নিয়ে দুই বুড়ি ঝগড়া করছে কঞ্জেলিতে। কড়িকাঠ থেকে ঝোলানো হ্যাম আর কডমাছের শুঁটকি হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে আনা হ'লো। ভিড়ের পাশ কাটিয়ে, তি নোয়েল তার মুখ রাখলো ইস্পানি মদের একটা পিপের ছিপিখোলা মুখটায়, আর অনেকক্ষণ ধ'রে উঠলো আর নামলো তার কণ্ঠা। তারপর তার বড়ো ছেলেদের পেছনে নিয়ে সে গেলো বাড়ির দোতলায়। সে যে কতদিন ধ'রে সে মাদমোয়াজেল ফ্লরিদরকে ধর্ষণ করার স্বপ্ন দেখেছে। সেইসব রাত্তিরে, যখন তিনি শোকবিহ্বল সব সংলাপ আওড়াতেন, গ্রীকচাবির আঁচল লাগানো ঢোলা জামার তলায় মাদমোয়াজেল ফ্লরিদর এমন দুটি স্তন দেখিয়েছিলেন যা বছরগুলোর সুনিশ্চিত দৌরাত্ম্য সত্ত্বেও ছিলো অটুট ও আঁটো।

৪

বজরার ভেতরে ডাগোদ

একটা শুকনো কুয়োর তলায় দু-দিন ধ'রে লুকিয়ে থাকার পর—কুয়োটা অগভীর হ'লেও আঁধারঘেরা ছিলো—খিদেয় আর ভয়ে শুকিয়ে-যাওয়া মঁসিয় লেনর্মঁ দ্য মেজি আস্তে-আস্তে কূপের মুখের কাছে তাঁর মাথা তুললেন। সব চুপচাপ। বর্বরদল হানা দিতে গেছে এল্ কাবোতে, পেছনে ফেলে রেখে গেছে কতগুলো আগুনের কুণ্ড, কিসের আগুন তা বোঝা যায় যখন পৈচিয়ে-ওঠা ধোঁয়ার স্তম্ভের তলায় এসে কেউ খোঁজ করে। ল্য কারেফুা দে পের্-এর কাছে এইমাত্র একটা ছোটো বারুদশালা উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। খাতাঞ্চির প'চে ফুলে-ওঠা মৃতদেহটার পাশ কাটিয়ে মালিক বাড়ির দিকে এগুলেন। পোড়া কুত্তার আখড়াটা থেকে একটা তীব্র দুর্গন্ধ আসছে—ভয়াবহ গন্ধ। সেখানে নিগ্রোরা একটা অনেক দিনের দেনাপাওনার হিশেবনিকেশ করেছে—দরজাগুলোর গায়ে এমনভাবে আলকাৎরা লেপেছে, কোনো কুত্তাই যাতে বেরিয়ে আসতে না-পারে, এ-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। মঁসিয় লেনর্মঁ দ্য মেজি শোবার ঘরের দিকে

তাঁর পা চালালেন। মাদমোয়াজেল ফ্লরিদর প'ড়ে আছেন ফরাশের ওপর, দু-ঠ্যাং ছড়ানো, একটা কাস্তে বিঁধে আছে নাড়িভুঁড়ির মধ্যে। তাঁর মরা হাতটা এখনও শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে আছে খাটের একটা পায়া, ভঙ্গিটা এমন যে নিষ্ঠুরভাবে দেয়ালে টাঙানো 'স্বপ্ন' নামের কামচেতানো খোদাই ছবির ঘুমন্ত তরুণীটিকে মনে করিয়ে দেয়। গুমরোনো কান্নায় ফুলে-ফুলে উঠলেন মঁসিয় লেনরুঁ দ্য মেজি, ব'সে পড়লেন তাঁর পাশে, তারপর তিনি হ্যাঁচকা টানে তুলে নিলেন এক জপমালা, যত প্রার্থনা জানেন সব ব'লে গেলেন পর-পর, এমনকী সেটা শুদ্ধ, ছেলেবেলার সেই প্রার্থনাটা, হাত-পায়ের হাজা সারাবার জন্য যেটা জপ করা হ'তো। এইভাবেই তিনি কাটিয়ে দিলেন কয়েকটি দিন, ভীত, সন্ত্রস্ত, আতঙ্কিত, বাড়ির বাইরে পা বাড়াতে সাহস নেই একফোঁটা, বাইরে খোলা-মেলায় দাঁড়িয়ে সব যে দেখবেন, নিজের সম্পত্তির ধ্বংসস্তূপ, তারও সাহস নেই; শেষটায় একদিন ঘোড়ায় চেপে এলো এক দূত, এমন দ্রুত ঝাঁকুনি দিয়ে সে পেছনের বারান্দার কাছে থামালো তার ঘোড়া যে সেটা গিয়ে চুঁশ লাগালো একটা জানলায়, পাথর থেকে ফুলকি তুলে দিলো। তার খবর—গাঁক-গাঁক ক'রে তড়বড় বলা—মঁসিয়ে লেনরুঁ দ্য মেজিকে তাঁর অভিভূত দশা থেকে টেনে তুললো। বর্বরদল হেরে গিয়েছে। জ্যামেকার বুকমানের ছিন্ন মুণ্ড - সবুজ আর হা করা—এর মধ্যেই কিলবিলে পোকার খোরাক হ'য়ে গেছে—ঠিক যেখানে একদিন দুর্গন্ধ তোলা ছাইতে পরিণত হয়েছিলো মাকান্দালের শরীর। নিগ্রোদের সবাইকে মেরে ফেলবার হুকুম দেয়া হয়েছে, তবে কয়েকটি সশস্ত্র দল এখনও দূর-দূরের বসতিতে লুঠতরাজ চালাচ্ছে। স্ত্রীকে কবর দেয়ার তরটুকু না দিয়ে মঁসিয় লেনরুঁ দ্য মেজি দূতের পেছনে লাফিয়ে উঠলেন ঘোড়ায়, সে অমনি জোর কদমে এল্ কাবোর উদ্দেশে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। দূর থেকে ভেসে এলো বন্দুকের আওয়াজ। ঘোড়ার পাঁজরে সজোরে গোড়ালি চেপে ধরলো দূত।

সেনাবাহিনীর ছাউনির উঠোনে ঠিক যখন তি নোয়েল এবং তাঁর খামারের লোহাদাগা আরও ক-জন ক্রীতদাসের মুণ্ড উড়িয়ে দেবার উদ্যোগ চলছে, ঠিক তখন এসে পৌঁছলেন মালিক। সেখানে পিঠোপিঠি দুজন ক'রে বাঁধা নিগ্রোদের শিরশ্ছেদ হচ্ছে—বন্দুকের গুলি বাঁচাবার জন্য। এই ক-জন ক্রীতদাসই মোটে র'য়ে গেছে তাঁর—এই সবগুলো হাবানার বাজারে অন্তত সাড়ে ছ-হাজার ইস্পানি পেসো আনবে। মঁসিয়ে লেনরুঁ দ্য মেজি অনুনয় ক'রে বললেন, এদের যত খুশি দৈহিক সাজা দেয়া হোক, কিন্তু শিরশ্ছেদটা আপাতত মুলতুবি থাক—

অন্তত রাজ্যপালের সঙ্গে একবার আলোচনা না-করা অব্দি। স্নায়ুর পীড়া, অনিদ্রা, আর বড্ড বেশি কফির প্রকোপে কাঁপতে-কাঁপতে মঁসিয় ব্লাঁশল্ তাঁর আপিশে পায়চারি করছিলেন—আপিশের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে একটা ছবি —তাতে আছেন ষোড়শ লুই, মারী আঁতোনায়েৎ আর দোফাঁ। তাঁর তেড়াবেঁকা বিকৃত একক ভাষণটির কোনো মর্মোদ্ধার করাই মুশকিল; এই তিনি দার্শনিকদের মা-বাপ তুলে খিস্তি করছেন, পরক্ষণেই, একান্তরভাবে, ব'লে উঠছেন তাঁর ভাবী কথকোচিত সাবধানবাক্যের কথা—পারীতে তিনি যথাসময়ে খবর পাঠিয়েছিলেন, অথচ এখনো অব্দি যার কোনো উত্তরই আসেনি। নৈরাজ্য জিতে নিচ্ছে জগৎটাকে। উপনিবেশ দাঁড়িয়ে আছে ধ্বংসের মুখে। সমভূমির প্রায় সমস্ত অভিজাত তরুণীদেরই দর্ষণ করেছে নিগ্রোরা। এত-সব লেস ছিঁড়ে নেবার পর, এত-সব লিনেনের চাদরের ওপর গড়াগড়ি যাবার পর, এত-সব উপদর্শকের গলাকাটার পর, তাদের আর কিছুতেই দাবিয়ে রাখা যাবে না। মঁসিয় ব্লাঁশল্ ক্রীতদাসদের সম্পূর্ণ, চূড়ান্ত, ব্যত্যয়হীন উচ্ছেদের পক্ষে—এমনকী স্বাধীন নিগ্রো বা মুলাটোদেরও যেন রেহাই দেয়া না-হয়। যারই দমনীতে একফোঁটাও আফ্রিকার রক্ত আছে—দো-আঁশলা, তে-আঁশলা, চৌ-আঁশলা, সাকাত্রা, গ্রিফ্—পরিমাণ যা-ই হোক না কেন, তাতেই মারা উচিত। বড়োদিনের উৎসবে জিশুর জন্মোৎসবের মোম জ্বালাবার সময় কাফ্রিগুলোর শঙ্খধ্বনিতে ভোলাটাই বোকামি হয়েছে। পাদ্রি লাবাৎই জানতেন দ্বীপে প্রথম পা দিয়েই তিনি কী বলছেন: নিগ্রোরা সব কাফিরদের মতো, বিধর্মীদের মতো, ফিলিস্তিনদের মতো এরা পুজো করে বজরার ভেতরকার ডাগোনকে—সেই অর্ধেক মাছ অর্ধেক মানুষ পুতুলের তারা স্তুতিগায়ক। রাজ্যপাল অতঃপর এমন একটা শব্দ উচ্চারণ করলেন, মঁসিয় লেনরুঁ দ্য মেজির সে-কথাটা কখনও মাথায়ও আসেনি: ভুডু। এখন তাঁর মনে প'ড়ে গেলো, কেমন ক'রে, অনেক বছর আগে, এল্ কাবো-র গোলগাল, লালমুখো, ফুর্তিশিকারি উকিল মরো দ্য সাঁ মারী পাহাড়-পর্বতের ডাইনি পুরুতদের বর্বর প্রথাটথা সম্বন্ধে বিস্তর তথ্য জড়ো করেছিলো। তা থেকে এই তথ্যটাও বেরিয়ে এসেছিলো যে কিছু-কিছু নিগ্রো সর্পপূজারী। এখন যখন তাঁর এ-কথা মনে প'ড়ে গেলো, কথাটা তাঁকে কেমন অস্বস্তিতে ভরিয়ে দিলো, তাঁকে বোঝালো যে, কিছু-কিছু ক্ষেত্রে, ঢাক হয়তো-বা ফাঁপা কাঠের ওপর টান-টান ক'রে বেছানো ছাগলের চামড়ার চাইতেও বেশি কিছু। ক্রীতদাসদের, স্পষ্টই, একটা গোপন ধর্ম আছে, যেটা তাদের সব বিদ্রোহের সময় তাদের ধ'রে

রাখে, একতাবদ্ধ ক'রে দেয়। হয়তো বছরের পর বছর ধ'রে ঠিক তাঁর নাকের ডগাতেই তারা এই ধর্মের প্রথাপার্বণ পালন করেছে, তাঁর অগোচরে তাঁর সব সন্দেহের পরপারে উৎসবের ঢাকের আওয়াজে কথা চালাচালি করেছে পরস্পরের সঙ্গে। কিন্তু কোনো সভ্য মানুষ কি কখনো সেই তাদের বর্বর বিশ্বাস নিয়ে সত্যি মাথা ঘামাতে পারে, যারা কিনা পুজো করে একটা সাপকে?

রাজাপালের বিদঘুটে হতাশায় বিষম কাতর হ'য়ে ম'সিয় লেনর্‌ম' দ্য মেজি রাত অব্দি, লক্ষ্যহারা, উদ্দেশ্যহীন, শহরের রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেন। বুকমানের মুণ্ডুটা দেখে চক্ষুর তৃপ্তি হ'লো একটু, থুতুর সঙ্গে অবিশ্রাম তাকে লক্ষ্য ক'রে ছিটিয়ে গেলেন খিস্তি, যতক্ষণ-না একই খেউড় আউড়ে-আউড়ে তিনি ক্লান্ত হ'য়ে পড়লেন। একটা নাদুশনুদুশ পৃথুল লুইসোঁ মাগির বাড়িতে কাটালেন তিনি কিছুক্ষণ, যার মেয়েগুলো আঁটসাঁট শাদা মসলিন প'রে ঝুলবারান্দার টবের পাতাবাহার গাছগুলোর মধ্যে ব'সে চুচি খুলে হাওয়া করছিলো। কিন্তু সবখানেই হালচাল কেমন অপ্রীতিকর। কাজেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন রু দে এস্পানিওনের দিকে—ওবের্জ্ দ্য লা কুরন্ন-এ গিয়ে এক পাত্তর মাল টানবার জন্য। কিন্তু বন্ধ দরজাগুলো দেখে তাঁর মনে প'ড়ে গেলো, সরাইটার রাঁধুনি আঁরি ক্রিস্তফ এই কিছুদিন আগেই ব্যাবসা ছেড়ে দিয়ে উপনিবেশের গোলন্দাজ বাহিনীর উর্দি গায়ে চাপিয়েছে। এতদিন ধ'রে যে-টিনের মুকুটটা সরাইখানাটার প্রতীক ছিলো, সেটা নামিয়ে নেবার পর কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে এল্ কাবোতে ভদ্রভাবে খাওয়া-দাওয়া করারই কোনো জো নেই। একটা কাউন্টারে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই এক গেলাশ রাম খাবার পর খানিকটা মেজাজ শরীফ হ'লো তাঁর, ম'সির লেনর্‌ম' দ্য মেজি এক কয়লার নৌকোর মালিকের সঙ্গে ব্যবস্থা করলেন—মেরামতির জন্য দু-মাস ধ'রে কয়লা জাহাজটা জেটিতে প'ড়ে ছিলো—ফাঁক-ফোকরগুলো বুজিয়ে নিয়েই সেটা এবার রওনা হবে সান্‌তিয়াগো দে কুবার উদ্দেশে।

৫

সান্‌তিয়াগো দে কুবা

এল্ কাবো অন্তরীপের মুখটার পাশ কাটিয়েছে কয়লা জাহাজ। পেছনে প'ড়ে আছে শহর, নিগ্রোদের অবিরাম দৌরাত্ম্য আর ভীতির তলায়, নিগ্রোরা জানে যে তারা ইস্পানিদের প্রস্তাবিত অস্ত্রশস্ত্রের ওপর নির্ভর করতে পারে, আর কিছু-কিছু মানবতাবাদী জাকোবাঁও তো সোৎসাহে তাদের পক্ষ সমর্থন করতে শুরু করেছে। তি নোয়েল আর তার সঙ্গীরা যখন খোলের মধ্যে কয়লার বস্তার ওপর ঘেমে নেয়ে একাকার, প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা, জাহাজের পেছনের পাটাতনের ওপর জড়ো হ'য়ে, স্ট্রেইট অব উইণ্ডস থেকে ব'য়ে-যাওয়া মৃদুমন্দ হাওয়ায় গভীর শ্বাস নিচ্ছিলো। এল্ কাবোর নতুন একটা দলের একজন গায়ক ছিলো: অভ্যুত্থানের রাতে তার হোটেল পুড়িয়ে ফেলা হয়, তার একমাত্র পোশাক ছিলো পরিত্যক্ত দিদোর বেশভূষা; সে আলসাসের লোক, সংগীতজ্ঞ, কেমন ক'রে যেন তার ক্লাভিকর্ডটা সে বাঁচাতে পেরেছে—অবশ্য নোনা হাওয়া সেটাকে বিচ্ছিরি বেসুরো ক'রে দিয়েছে; সে যখন মাঝে-মাঝে য়োহান ফ্রিডরিখ এডেলমানের সোনাটার এক-আধটা টুকরো বাজায়, তখন কোনো উড়ুক্কু মাছ একরাশ হলদে শামুক-গুগলির ওপর যদি লাফিয়ে যায়, তো সে বাজনা থামিয়ে তাকিয়ে থাকে। এক রাজতন্ত্রী মার্কি, দু-জন গণপ্রজাতন্ত্রী উঁচু কর্মচারী, একজন লেসনির্মাতা আর জনৈক ইতালীয় যাজক—সে তার গির্জের সোনার বাটিটা নিয়ে চলেছে—এরাই যাত্রীতালিকা সম্পূর্ণ করেছে।

সান্‌তিয়াগোতে পৌঁছুবার রাত্রেই, ম'সিয় লেনর্‌ম' দ্য মেজি সোজা ছুটেছিলেন টিভোলির দিকে: তালপাতার ছাউনি দেয়া নাটমঞ্চটা সদ্য-সদ্য প্রতিষ্ঠিত করেছে প্রথম ফরাশি উদ্বাস্তুরা—কারণ কুবার সব সরাইখানার সামনে মাছিমারা বেটালো লাঠি ভাড়া করা গাধা দাঁড় করানো দেখেই তাদের বমি পাচ্ছিলো। এত উদ্বেগ, এত আতঙ্ক, এত বদলের পর, কাফে শাঁতাং-এর আবহাওয়ায় একটু সান্ত্বনা পেলেন ম'সিয় লেনর্‌ম' দ্য মেজি। সেরা টেবিলগুলো জুড়ে ব'সে আছে তাঁরই পুরোনো ইয়ারদোস্তরা, জমিমালিকরা, যারা তাঁরই মতো এখোগুড়ের গায়ে শান-দেয়া কাটারিগুলো থেকে পালিয়ে বেঁচেছেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এটাই যে

পুরোনো ঔপনিবেশিকেরা নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার কাঁদুনি না-গেয়ে বরং যেন নতুন ইজারা নিয়েছে জীবনের—যদিও তাদের সকলেরই ধনসম্পত্তি উধাও, সর্বস্বান্তই শুধু নয়—পরিবারের আদ্ধেক লোকেরই কোনো পাত্তা নেই, আর তাদের দুহিতারা নিগ্রো-ধর্ষণের পর রোগশয্যায় সেরে উঠছে—সেটাও কোনো ফালনা ব্যাপার নয়। এদের চেয়ে যাদের দূরদৃষ্টি বেশি, তারা যখন সান্তো দোমিঙ্গো থেকে টাকাকড়ি পাচার করেছিলো, এবং নিউ অর্লিন্সে চ'লে গিয়েছিলো অথবা কুবায় নতুন-নতুন কফির ক্ষেত বানাতে শুরু করেছিলো, তাদের তুলনায়, ধ্বংসস্তূপ থেকে যারা কিছুই বাঁচাতে পারেনি, তারা দিন এনে দিন খাওয়া, সব দায়দায়িত্ব থেকে নিস্তার, শুধু এই মুহূর্তটারই তত্ত্বতালাশ, এইসব থেকে তারা চুষে খাচ্ছিলো সুখ, নিংড়ে নিচ্ছিলো আমোদ আর ফুর্তি। বিপত্নীক আবিষ্কার করলে একা থাকার সুখ-সুবিধে; অভিজাত ঘরের বউ প্রায় কোনো আবিষ্কারকের উৎসাহে নিজেকে লেলিয়ে দিলে ব্যভিচারে; সৈন্যরা সব আনন্দে আত্মহারা—প্রত্যূষে আর ঘুম ভাঙার সংকেত নেই; প্রটেস্টাণ্ট তরুণীরা জানতে পেলে মঞ্চমায়ার স্তবস্তুতির মোহ, গালে সৌন্দর্যবিন্দু লাগিয়ে সাজগোজ ক'রে লোকের সামনে হাজির হবার মজা। সমস্ত বুর্জোয়া রীতিনীতি ধ্ব'সে পড়েছে। এখন শুধু যা জরুরি, তা শিঙা বাজানো, একটা মিনুয়েৎ ত্রিয়োর ঝকঝকে অনুষ্ঠান, অথবা টিভোলি অর্কেস্ট্রার গরীয়ান লহিমার জন্য তেকোণা ঢাকে একটা জবরদস্ত তাল বাজানো! লেখাপ্রমাণকেরা এখন মাঝে-মাঝে স্বরলিপি টোকে; প্রাক্তন রাজস্ব সংগ্রাহকেরা বারো ফুট পর্দায় আঁকে কুড়িটা সুলেমানী স্তম্ভ। মহড়ার সময়, যখন সারা সান্তিয়াগো কর্পুস ক্রিস্টি তিথির বিকট ধূলিধূসর মূর্তিগুলোর সঙ্গে, কাঠের খড়খড়ি আর পেরেক আঁটা দরজার আড়ালে সিয়েস্তায় আচ্ছন্ন, এটা শোনা মোটেই অস্বাভাবিক নয় যে কোনো বাড়িউলি মাসি—এককালে যাঁর খ্যাতি ছিলো দারুণ ধর্মপ্রাণা ব'লে—অলস সুরে টেনে-টেনে গান গাইছেন :

নিতুই চাহে প্রীতি, .যেহেতু রীতি তা-ই,
আমরা যেন পাই সুখ নিরন্তর।

পারীতে কবেই যে-দস্তুরটা বাতিল হ'য়ে গেছে, সেই রকমই একটা মস্ত রাখালিয়া বলনাচের আসরের পরিকল্পনা করা হচ্ছিলো—আর নিগ্রো বিক্ষোভের পর যত তোরঙ্গ বাঁচানো গিয়েছিলো, পোশাক আশাকের জন্য, সেগুলো সব এক জায়গায় জড়ো করা হ'লো। তালপাতার বাগলোয় তৈরি সাজঘরগুলো এখন উপভোগ্য

ও সুমধুর সাক্ষাৎকারের দৃশ্যপট, যখন হয়তো কোনো ব্যারিটোন স্বামী তার ভূমিকায় মশগুল হ'য়ে মঞ্চের ওপর মন্‌সিনিইর 'ল্য দেসের্‌তার'-এর ফুর্তিবাজ চটপটে আরিয়ায় অভিভূত হ'য়ে আছে। এই প্রথম সান্‌তিয়াগো দে কুবা শুনতে পেলো 'পাসপি' আর 'কোঁৎরদান্স'-এর সুর। ঔপনিবেশিকদের দুহিতারা যা মাথায় দিতো, শতাব্দীর সেই শেষ পাউডার লাগানো পরচুলগুলো ভাল্‌জের অগ্রদূত ক্ষিপ্রচপল মিনুয়েতের তালে-তালে দোল খেতে লাগলো। শহরটায় যেন ঝেঁটিয়ে ব'য়ে গেছে সবচল ফ্যাণ্টাসি আর বিশৃঙ্খলার হাওয়া। তরুণ কুবানারা দেশান্তরীদের সাজগোজ নকল করতে শুরু ক'রে দিলে, চিরকালই বেতারিখের যে ইস্পানি বেশভূষা তারা পরতো সে-সব রেখে দিলে শুধু নগরপরিষদের সদস্যদের জন্য। তাঁদের স্বীকারোক্তি-শোনা ধর্মযাজকদের অজানিতেই কুবার মহিলারা ফরাশি আদব-কায়দায় পাঠ নিলেন, তাঁদের চপ্পলের সৌষ্ঠব দেখাবার ছলে পা দেখাবার কলাকৌশল রপ্ত করার তালিম নিতে লাগলেন। রাত্তিরে, লেনর্‌ম‍ঁ দ্য মেজি যখন কোমরবন্ধের তলায় বেশকিছু সুরা পাচার ক'রে অভিনয় দেখতে যান, সকলের সঙ্গে সঙ্গে শেষ অনুষ্ঠানটির পর তিনিও উঠে দাঁড়ান,—উদ্বাস্তুরা নিজেরাই চালু করেছিলো প্রথাটা,—আর গান করেন 'সঁ লুইসের স্তব' আর 'লা মার্সাঈ'।

অলস, কোনো কারবারেই মন বসাতে অক্ষম, ম'সিয় লেনর্‌ম‍ঁ দ্য মেজি তাঁর সময় ভাগাভাগি ক'রে নিলেন তাশের টেবিল আর প্রার্থনার মধ্যে। জুয়োর আখড়াগুলোয় তাশের বাজি খেলবার জন্য এক-এক ক'রে ক্রীতদাসদের তিনি বিক্রি ক'রে দিলেন, টিভোলিতেও দেনা চোকানো জরুরি—কিংবা হয়তো জাহাজঘাটার রাস্তায় ঘুরঘুর-করা, কোঁকড়া চুলে সেই যে পরতো শ্বেতনলিনী, সেই নিগ্রো মাগিটাকে ঘরে নিয়ে যেতে হবে, তারও পয়সা চাই। কিন্তু, সেই সঙ্গে, আয়নায় যখন ছাখেন এককেটা সপ্তাহ কাটবার সঙ্গে-সঙ্গে কতটা ক'রে বয়েসের ছাপ প'ড়ে যাচ্ছে, তিনি ঈশ্বরের আসন্ন শমনের ভয়ে কাবু হ'য়ে যান। একদা ছিলেন উড়োনচণ্ডী, এখন তিনি ত্রিভুজকেই অস্বীকার করতে শুরু ক'রে দিয়েছেন। আর তাই, তি নোয়েলের সমভিব্যাহারে, তিনি সান্‌তিয়াগো ক্যাথেড্রালে দীর্ঘক্ষণ ধ'রে হেঁড়ে গলায় কাৎরে আর কাকুতিমিনতি ক'রে কাটিয়ে দেন। অবস্থা যখন এমনি চলেছে, নিগ্রো তখন ঢুলতো কোনো যাজকের ছবির তলায় অথবা ব'সে-ব'সে দেখতো বড়োদিনের 'কান্‌তাতা'র মহড়া, দোন এস্তেবান সালাস নামে এক চিমশে, শুকনো, হেঁড়েগলার কালো লোক সেটা পরিচালনা করতেন। সবসত্ত্বেও এই সংগীত পরিচালককে সবাই শ্রদ্ধা করতো

ব'লেই মনে হয়, যদিও সত্যি-সত্যি বোঝাই দায় ছিলো কেন তিনি পণ ক'রে বসেছিলেন যে গায়করা সবাই সমস্বর গানে যোগ দেবে একজনের পর আরেকজন,—অন্যরা আগেই যা গেয়ে ফেলেছে নতুন-কেউ আবার সেই অংশটা গাইবে—আর তারপর তিনি কণ্ঠস্বরের এমন এক জটিল তালগোলপাকানো বিশৃঙ্খলা শুরু ক'রে দিতেন যে তাতে সবাই পুরোদস্তুর বেহাল হ'য়ে পড়লেও বলার কিছু থাকতো না। কিন্তু যাজকের আশাসৌটাধারীর কাছে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বেশ উপভোগ্যই ঠেকতো, তার ওপর তি নোয়েল চাপিয়ে দিয়েছিলো যাজকবিদ্যার বিপুল কর্তৃত্ব পুরোটাই, যেহেতু সে চলতো সশস্ত্র আর অন্যদের মতো পাৎলুন পরতো। কাঠের বাঁশি, রামশিঙা, ও তারায় গলাচড়ানো বালকসহযোগে সমৃদ্ধ-করা এই বেসুরো ধ্বনিসংযোগ সত্ত্বেও দোন এস্তেবান সালাসের এই কান্‌তাতা নিগ্রো-ইস্পানি গির্জেয় পেলো এক ধরনের ভুডু উষ্ণতা তি নোয়েল যেটা কোনোদিনও এল্ কাবোর সাঁ সুলপিসের গির্জেয় পায়নি। বারোক সোনার কাজ, জিশুর মানুষী কেশপাশ, স্বীকারোক্তিকুঠুরির কাঠের গায়ের বিপুল আঁকজোক, ডমিনিক সাধুদের প্রহরী-করা সন্তদের পায়ের তলায় চুরমার ড্রাগন, সান্ আন্তোমিওর শুওর, সান্তো বেনিতোর সন্দেহজনক রং, কালো কুমারীগণ, ফরাশি বিয়োগান্ত নাটকের অভিনেতাদের মতো দেহত্রাণ আর হাঁটুঢাকা জুতো-পরা সান হোর্হেগা—সব মিলিয়ে বড়োদিনের আগের সন্ধেয় বাজানো বাদ্যযন্ত্রগুলোর এক ধরণের আকর্ষণ ছিলো—উপস্থিতি, প্রতীক, আরোপণের মধ্যে ভোজবাজি ছিলো যেন এক ধরনের, যার ফলে তাকে মনে হ'তো সর্পদেবতা দাম্বালার প্রতি উৎসৃষ্ট চিহ্ন-প্রতীকে ভরা বেদীই যেন। তাছাড়া সান্ তিয়াগো হ'লো ওগুন ফাই, ঝড়ের সেনাপতি, যার মায়াতেই সেদিন জেগে উঠেছিলো বুকমানের অনুবর্তীরা। সেই জন্যেই তি নোয়েল, প্রার্থনা হিশেবে, প্রায়ই আপন মনে গুনগুন করতো একটা পুরোনো গান, যেটা সে শিখেছিলো মাকান্দালের কাছে :

সান্ তিয়াগো, হে, আমি যুদ্ধের ছেলে :
সান্ তিয়াগো, হে,
তুমি কি বোঝো না আমি যুদ্ধেরই ছেলে ?

৬

কুকুরদের জাহাজ

একদিন সকালে সান্‌তিয়াগো বন্দর ভ'রে গেলো ঘেউ-ঘেউতে। একটার সঙ্গে আরেকটা শেকল দিয়ে জোড়া, মুখসাজের আড়ালে লালা ঝরাচ্ছে গরগর ক'রে খেঁকিয়ে উঠছে, পাহারাকে বা একে অন্যকে খাঁক ক'রে কামড়ে দেবার চেষ্টা করছে, গরাদের ওপাশে যারা তাদের দিকে তাকিয়ে আছে বা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে—শয়ে-শয়ে কুকুর, চাবকে তাদের সজুত ক'রে ঢোকানো হচ্ছে একটা সমুদ্রগামী জাহাজের খোলে। আরো কুকুর এসে পড়লো, তারপর আরো, আরো—উঁচু হাঁটুমোড়া জুতো-পরা শিকারি, চাষী ও খামারের উপদর্শকদের তত্ত্বাবধানে। তি নোয়েল, সে সবেমাত্র তার মালিকের জন্য মাছ কিনেছে, এই অদ্ভুত জাহাজের কাছে এসে দাঁড়ালো—তখনও তারা তার মধ্যে ডজন-ডজন মাস্টিফ ঢোকাচ্ছে, আর এক ফরাশি কর্মচারী একটা গণকযন্ত্রের পুঁতি নেড়ে-নেড়ে, আওয়াজ ক'রে, চটপট গুনে যাচ্ছে।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এদের ?' বিষম শোরগোলের মধ্যেই তি নোয়েল চেঁচিয়ে একজন মুলাটো খালাশিকে জিগেশ করলে—ঘুলঘুলির ওপর টান ক'রে মেলে দেবে ব'লে সে তখন একটা গোটানো জাল খুলছিলো।

'নিগারগুলোকে খেতে !' গাঁকগাঁক ক'রে হেসে বললে অন্যজন।

ক্রেয়োলে বলা এই উত্তরটা তি নোয়েলের কাছে সব পুরোপুরি খুলে বুঝিয়ে দিলে। সে তক্ষুনি জোর কদমে রাস্তা দিয়ে ছুটলো, ক্যাথেড্রালের উদ্দেশে ; সেখানে অন্যসব ফরাশি নিগ্রোর সঙ্গে মোলাকাৎ করাটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে—মালিকরা কখন প্রার্থনা থেকে বেরোয় তারই জন্য তারা অপেক্ষা ক'রে থাকে। দ্যু ফ্রেনে পরিবার, জমিজিরেত বাঁচাবার সব আশা হারিয়ে, অবশেষে, তিন দিন আগে এসে পৌঁছেছে সান্‌তিয়াগোয়, তারা ফেলে এসেছে তাদের খামার, মাকান্দালকে ওখানে পাকড়ানো হয়েছিলো ব'লে জায়গাটা বিখ্যাত হ'য়ে আছে। দ্যু ফ্রেনে নিগ্রোরা এল্ কাবো থেকে এক মস্ত খবর নিয়ে এসেছে।

যে-মুহূর্তে অস্তিইয়েগামী সৈন্যবোঝাই ছিমছাম ছোট্ট রণতরীটায় পা দিয়েছে —বিশাল, বন্ধুর ঢেউয়ের আঘাতে যার হালমাস্তুল সারাক্ষণ মড়মড় ক'রে উঠছে—তখন থেকেই নিজেকে একটু রানী-রানী লাগছে পাউলিনার। তার প্রেমিক অভিনেতা লাফঁকে তার বিনোদনের জন্য নামজাদা সব নাটকের সবচেয়ে রাজসিক শ্লোকগুলো আওড়াতে শুনে-শুনে পাউলিনা রানীর ভূমিকা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হ'য়ে উঠেছিলো। স্মরণশক্তির কৃপা তার কখনোই তেমন ছিলো না, পাউলিনার আবছাভাবে মনে পড়ে, 'আমাদের দাঁড়ের তলায় ধবল হ'য়ে যায় হেলেস্‌পণ্ট', যেটা চমৎকার খাপ খেয়ে যায় জাহাজের পেছন-গলুইয়ের গা থেকে ওঠা ফেনার সঙ্গে, পাল টাঙিয়ে, পৎপৎ ক'রে সংকেত-নিশেন উড়িয়ে, 'লোসেয়' জাহাজ যে-ফেনা পেছনে রেখে চলেছে। কিন্তু এখন হাওয়ার প্রতিটি দিকবদল উড়িয়ে নিয়ে যায় বেশকিছু আলেক্সান্দ্রাইন। একটা গোটা বাহিনীর যাত্রা আটকে রেখেছিলো সে, একটা ডুলিতে ক'রে পারী থেকে যাবে ব'লে একটা ছেলেমানুষি খেয়ালে। এখন সে তার মন বসিয়েছে আরো-সব অধিকতর জরুরি বিষয়ে। সীলমোহর করা ঝুড়ি ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে মরিশাস দ্বীপ থেকে কেনা সব রুমাল, রাখালমেয়েদের পরার খাটো ঘাঘরা, ডোরা-কাটা মশলিনের ঘাঘরা—যেটা সে ঠিক ক'রে রেখেছে প্রথম গরম দিনটায় পরবে। এ-সব বিষয়ে তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছেন অব্রাঁতেস-এর ডাচেস। বাঁচোয়া যে যাত্রাটা খুব একটা একঘেয়ে বা বিরক্তিকর হ'য়ে ওঠেনি। বিস্কে উপসাগরের তুলকালাম ঝড় জল থেকে বেরিয়ে আসবার পর সামনের গলুইয়ের কাছে ধর্মযাজক যে প্রথম সমবেত প্রার্থনা জপিয়েছিলেন, তাতে সব উঁচু অফিসারেরা এসেছিলো পোশাকি উর্দি গায়ে, আর সকলের পুরোভাগে ছিলেন ল্যাক্লের্ক, তার স্বামী। বেশ রূপবান সব নমুনা ছিলো তাদের মধ্যে, আর পাউলিনা—যে তার কচি বয়েস সত্ত্বেও ছিলো পুরুষ শরীরের সুরসিক সমঝদার—বেশ তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করেছিলো, যখন সব অভিবাদন আর গোড়ালির সশব্দ ঠোকাঠুকি এবং মিনতি উৎকণ্ঠা আগ্রহের আড়ালে তাকে দেখে এদের কামনার তাড়া বেড়ে যাচ্ছিলো। সে জানে যে মাস্তুলে যখন লণ্ঠনগুলো দোল খায় আরো জলজলে সব তারায় ভরা রাতে, শয়ে-শয়ে পুরুষ তাদের রাজশয্যায় গলুইয়ে খোলে শুয়ে-শুয়ে তারই স্বপ্ন দেখছে। সেইজন্যেই রোজ সকালে সামনের পালটার কাছে দাঁড়িয়ে সে ভাবুক-ভাবুক উদাস ভঙ্গি করে, হাওয়া এলোমেলো ক'রে দিয়ে যায় তার চুল আর খেলা করে তার জামাকাপড় নিয়ে, আর উন্মোচিত ক'রে দেয় তার স্তনের সুঠাম সৌষ্ঠব

আর শ্রী।

আজোরেস প্রণালী দিয়ে চ'লে আসার কয়েক দিন পরে, দূরের পোর্তুগিস গাঁগুলোর ছোটো-ছোটো শাদা-শাদা গির্জের চূড়োগুলো উদাসভাবে দেখতে-দেখতে পাউলিনা খেয়াল করেছিলো সমুদ্র যেন নতুন জীবন পাচ্ছে। যেন মালা পরেছে জল, হলদে সব আঙুরের থোলো ভেসে যাচ্ছে পুব দিকে; সবুজ কাচের মতো নল মাছ, নীল পোটকার মতো জেলি মাছ, পেছন-পেছন টেনে নিয়ে আসছে লম্বা লাল আঁশ, ঘিনঘিনে, দস্তিল তারা মাছ, বান মাছ, আর স্কুইড—সেগুলো আবার যেন জড়াজড়ি ক'রে থাকে নববধূর ফিনফিনে ওড়নার স্বচ্ছতায়। ল্যাক্লের্কের দেখানো দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে ঝকঝকে সব অফিসারেরা খুলতে শুরু করে তাদের কোট, খোলা উর্দির তলায় জামার ফাঁক দিয়ে দেখায় তাদের বুক। একটা ভীষণ গরম ভাঁপশা রাতে, পাউলিনা তার রাতকাপড়েই বেরিয়ে এলো হাত-পা এলিয়ে শুয়ে পড়লো মাস্তুলের কাছের ওপরের পাটাতনটায়, যেখানে সে সাধারণত তার দীর্ঘ সিয়েস্তাগুলো সারতো! ফসফরের অদ্ভুত আলোয় সমুদ্র ছিটোচ্ছে সবুজ আলো। আকাশের তারাদের মধ্য থেকে যেন নেমে এসেছে মৃদু হিম, রোজ একটু-একটু ক'রে বড়ো দেখায় তারাগুলোকে। সকালবেলায় সাগ্রহ বিস্ময়ের সঙ্গে সন্ধানী-পাহারা আবিষ্কার করলে যে একটা গোটানো পালের ওপর ঘুমিয়ে আছে এক নগ্নিকামূর্তি—নিচু মাস্তুলটার তেকোণো পালের ছায়ায়। কোনো পরিচারিকা হবে বুঝি, এই ভেবে সে একটা দড়ি বেয়ে তার কাছে যাবে, এমন সময় নিদ্রিতার ভঙ্গি দেখে বোঝা গেলো সে জেগে উঠছে, এবং শুধু তা-ই নয়, যে-শরীর দেখে তার চক্ষুর ভূরিভোজ হচ্ছিলো সেটা আর কারু নয়, পাউলিনা বোনাপার্ৎ-এর। পাউলিনা তার চোখ রগড়ালো, ঠিক একটা বাচ্চার মতো খিলখিল হেসে উঠলো, সকালের খোলা হাওয়ায় তার চুল উড়ছে এলোমেলো, সে ভেবেছে নিচের পাটাতন থেকে সে বুঝি কেম্বিস কাপড়ের ঢাকায় সুরক্ষিত, সে চট্ ক'রে কয়েক বালতি টাটকা জল ফেললো কাঁধে। সেই রাত থেকেই সে শোয় খোলামেলায়, আর তার বদান্য ঔদাসীন্য এতই চাউর হ'য়ে গেলো যে এমনকী কাষ্ঠমূর্তিবৎ মঁসিয় দেস্‌মেনার—তিনি চলেছেন অভ্যুত্থান কী ক'রে দমানো হয় তারই তদারক করতে—আবিষ্কার করলেন দু-চোখ খুলেই তিনি এই প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন ছাখেন, যেটা তাঁর মনে করিয়ে দিয়েছে গ্রীকদের গালতেয়ার কথা।

আখের ক্ষেত থেকে পেঁচিয়ে-ওঠা ফিনফিনে কুয়াশায় ঝাপশা হ'য়ে যাওয়া

পাহাড়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে এল্ কাবো আর উত্তরের সমভূমির দৃশ্য পাউলিনাকে খুশি ক'রে তুললো: সে পড়েছে 'পৌলবর্জিনী', সে শুনেছে 'লে স্ব্লেয়ার'—একটা মনমাতানো ক্রেয়োল কোঁৎরদাঁস-এর বাজনা, যার ছন্দটা অদ্ভুত আর ভিনদেশী, রু দ্য সোমঁয় পারীতে তা প্রকাশিত হয়েছিলো। তার উড়াল দেয়া মশলিনের ঘাগরায় নিজেকে তার মনে হ'লো যেন খানিকটা অন্যরকম আর খানিকটা সে আবিষ্কার করলে সুকোমল ঝাউপাতার সূক্ষ্ম সৌকুমার্য, মেভলার পাতার বাদামি রসাপ্লুতি, এমন সব পাতা যারা এত বড়ো যে পাখার মতো ভাঁজ ক'রে নেয়া যায়। রাত্তিরে ল্যক্লেক ভুরু কুঁচকে বলেন ক্রীতদাসদের অভ্যুত্থানের কথা, রাজতন্ত্রী খামারমালিকদের সঙ্গে ঝুটঝামেলার কথা, যত রাজ্যের বিপদ-আপদের কথা। আরো বড়ো বিপদের আশঙ্কায় তিনি স্থির করেছেন ইল দ্য লা তোর্তুতে একটা বাড়ি কেনার। কিন্তু পাউলিনা তাঁর কথাবার্তাকে খুব একটা পাত্তা দেয়নি। জোসেফ লাভাল্লের অশ্রুসজল উপন্যাস *Un Négre comme il y peu des blancs* প'ড়ে সে এখনও বেশ আন্দোলিত, তাছাড়া তার চারপাশ ঘিরে যে বিলাসবৈভব ছড়ানো যে প্রাচুর্য ছড়ানো, তাকে সে কায়মনে উপভোগ করছিলো। তার ছেলেবেলা কেটেছে শুকনো ডুমুর, ছাগলের দুধের পনির, আর আধপচা জলপাই খেয়ে—সব কী গরিব, কী সাধারণ—ছেলেবেলায় সে এমন বৈভব স্বপ্নেও দ্যাখেইনি কখনো। একটা ছায়ানিবিড় বিতান ঘেরা বিশাল অট্টালিকার মধ্যে আছে সে, প্রধান গির্জেটা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। ছড়ানো তেঁতুল-গাছগুলোর তলায় সে হুকুম করলে একটা সাঁতারের চৌবাচ্চা খুঁড়তে, নীল কাচ মর্মর পাথরে মোড়া। সেখানে সে স্নান করতো নগ্ন। গোড়ার দিকে সে তার ফরাশি দাসীদের দিয়ে নিজের অঙ্গসংবাহন করাতো; কিন্তু একদিন তার মাথায় এলো যে পুরুষের হাত হবে আরো সবল ও উদ্দীপক, আর অমনি সে হামামের প্রাক্তন পরিচারক সলিমানের সেবা নিয়োগ করলে—সলিমান তার শরীরের যত্ন নেয়া ছাড়া তার গায়ে মালিশ করে কাগজিবাদামের ক্ষীর, তার গায়ের রোমগুলো কামিয়ে দেয়, পায়ের আঙুলের নখে বুলিয়ে দেয় রং। যখন সে তাকে স্নান করায়, পাউলিনা একটা অসুস্থ আনন্দ পেতো জলের তলায় তার নিজের শরীর দিয়ে সলিমানের উরুর দু-পাশে ঘ'ষে যেতে, সলিমান যে অবিশ্রাম কামের তাড়ায় থর্থর করে সেটা তার জানা, সে যে সবসময়েই তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে থাকে চাবুক দিয়ে ভালো ক'রে শেখানো কুকুরের মতো মিথ্যে নম্রতায়, তাও সে জানে। একটা হালকা সবুজ লতা দিয়ে তাকে ব্যথা না দিয়েই

মোলায়েমভাবে চাবকাতো পাউলিনা, শুধু সলিমান যে মিথ্যে ব্যথা পাবার মুখ-ভঙ্গিটা করবে সেটাকে দেখবার জন্য। সত্যি-বলতে, সলিমান যে তার রূপের এত যত্ন নেয়, সেজন্যে তার প্রতি কৃতজ্ঞই বোধ করে সে।—কোনো-একটা কাজ চট ক'রে সেরে ফেললে বা ভক্তিভরে উপাসনা করলে, পুরস্কার হিশেবে এইজন্যেই সে সময়-সময় নিগ্রোটিকে অনুমতি দিতো তার সামনে নতজানু হ'য়ে ব'সে তার পায়ে চুমো খেতে, এমন ভঙ্গিতে যেটা দেখে 'পৌলবর্জিনী'-প্রণেতা বের্নার্দা দ্য সাঁ-পিয়ের হয়তো ভাবতেন এ হ'লো আলোকপ্রাপ্তির বদান্য শিক্ষাদীক্ষার সংস্পর্শে আসার দরুন কোনো সরল মিঠে প্রাণের সগৌরব কৃতজ্ঞতার প্রতীক।

এই ভাবেই পাউলিনা তার সময় কাটাচ্ছিলো সিয়েস্তা আর জাগরণের মধ্যে—সময়-সময় ল্যক্লের্ক যখন দক্ষিণে গেছেন, সে কোনো রূপবাণ অফিসারের তরুণ উৎসাহে সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া স্বত্ত্বেও, নিজেকে তার মনে হ'তো অংশত বর্জিনী, অংশত আতালা। কিন্তু একদিন বিকেলে যে ফরাশি কেশবিলাসিনী চারজন নিগ্রো সহকারীর সহায়তায় তার কেশসজ্জা করছিলো, সে থুবড়ে পড়লো দুর্গন্ধে-ভরা চাপ-চাপ রক্তবমির মধ্যে। এক রুপোলি ফুট-ফুট ছোপের খাটো ঘাগরা প'রে এক ভয়ানক আনন্দঘাতক এসে হাজির হয়েছে ভনভনে গুঞ্জন তুলে—পাউলিনা বোনাপার্তের উষ্ণ মণ্ডলের স্বপ্নকে চুরমার ক'রে দিতে।

৭

সান্ ত্রাস্তোর্নো

পরদিন সকালে, ল্যক্লের্ক-এর নাছোড় উপরোধে—তিনি প্লেনে ছারখার গ্রাম-গুলো পেরিয়ে সদ্য ফিরেছিলেন—পাউলিনা পালিয়ে গেলো ইল দ্য লা তোর্তুতে, সঙ্গে গেলো নিগ্রো সলিমান আর পুলিন্দা বোঝাই দাসীরা। প্রথম দিনগুলো সে কাটিয়ে দিলে এক বালুকাময় খাঁড়ির জলে স্নান ক'রে আর শল্যচিকিৎসক আলেহান্দ্রো ওলিভিয়ের এস্কেমেলিঙের স্মৃতিকথার পাতা উলটে, আমেরিকার সব বোম্বেটে হার্মাদদের হালচাল আর বদমায়েশির সেটা প্রত্যক্ষদর্শীর লেখা তথ্য-ভাঁড়ার: দ্বীপে তাদের তুলকালাম অস্থির জীবনের স্মারক হিশেবে তারা

ফেলে রেখে গেছে এক কুৎসিত কেল্লার ধ্বংসাবশেষ। তার শোবার ঘরের আয়না যখন তার সারা গা খুলে দেখালো পাউলিনা খুশিতে হেসে উঠলো ; তার গায়ের রং এখন চমৎকার এক মুলাটোর মতো, রোদে-পোড়া হালকা খয়েরি। কিন্তু এই বিক্ষুব্ধকের আয়ু হ'লো তাৎক্ষণিক। একদিন বিকেলে ল্যক্লের্ক পদার্পণ করলেন ইল দ্য লা তোর্‌তুতে, ভয়াবহ ঠাণ্ডায় তার শরীর কাঁপছে, চোখ দুটো কেমন হলদে। তাঁর সঙ্গে সামরিক বাহিনীর যে-চিকিৎসক গিয়েছিলেন তিনি তাঁকে কড়া মাত্রায় রেউচিনির জোলাপ খাওয়ালেন।

পাউলিনা ভ'রে গিয়েছিলো আতঙ্কে। তার মনে ঝাপশাভাবে আহাকসিওর কলেরার মহামারীর স্মৃতি জেগে উঠেছে : কালো পোশাক পরা লোকদের কাঁধে ক'রে বাড়িঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে কালো-কালো কফিন ; কালো ওড়নায় মুখ ঢাকা বিধবারা ডুমুর গাছের তলায় বিনিয়ে-বিনিয়ে বিলাপ করছে ; কালো বেশ পরা দুহিতারা নিজেদের ছুঁড়ে ফেলতে চাচ্ছে মা-বাবার কবরে আর তাদের হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গোরস্থান থেকে। হঠাৎ তাকে হামলা করলো সেই দম-আটকানো ভাবটা, ছেলেবেলায় প্রায়ই যেটা তাকে নাজেহাল করতো। ইল্ দ্য লা তোর্‌তু আর তার শুকনো পোড়া মাটি, তার লালচে উপকূলের পাহাড়, ফণিমনসা আর পঙ্গপালে ছাওয়া তার পোড়ো জমি, তার চিরবর্তমান সমুদ্র—এখন মনে হচ্ছে এ বুঝি তারই শৈশবের দ্বীপ, যেখান থেকে পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। দরজার আড়ালে যে-লোকটা খাবি খাচ্ছে সে এতটাই অবিবেচক যে সে কিংখাবের ফিতের তলায় লুকিয়ে নিয়ে এসেছে সাক্ষাৎ মরণ। চিকিৎসকেরা যে কিছুই করতে পারবে না, এ-বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হ'য়ে পাউলিনা সলিমানের পরামর্শে কান পাতলো। সলিমান ব্যবস্থাপত্র দিলো যে ধূপধুনা, নীল আর লেবুর খোশা পুড়িয়ে ধোঁয়া দিয়ে ঘর সাফ করতে, মহাবিচারক সান্ হোর্‌হে আর সান আন্তোর্নোর উদ্দেশে অসাধারণ কোনো ফলপ্রসূ প্রার্থনার আয়োজন করতে। সে তামাকপাতা, গন্ধলতা, পাতাবাহারের পাতা দিয়ে বাড়ির দরজাগুলো ঘ'ষে মেজে মসৃণ করালো, একটা কালো কাঠের ক্রুশচিহ্নের তলায় জমকালো ভঙ্গি ক'রে বসলো নতজানু খানিকটা চাষীদের ভক্তির আধিক্য যেমন থাকে ; নিগ্রোটির সঙ্গে প্রতিটি প্রার্থনামন্ত্রের শেষে চেচিয়ে বলতে লাগলো : মাতো, প্রেস্তো, পাস্তো, এক্‌কাসিও, আমেন। তাছাড়া ঐ সব তুকতাক—ঐ যে একটা লেবুগাছের ডালে পেরেক ঠুকে ক্রুশ বানানো,—সে সব তার মধ্যে আলোড়ন তুলে জাগিয়ে দিলো পুরোনো কর্সিকান রক্তের তলানিটুকু, যেটা

আসলে ফ্রান্সের বিপ্লবী পরিষদের নির্দেশ বইয়ের অলীক মিথ্যাগুলির চেয়েও নিগ্রোটির সজীব সৃষ্টিরহস্যতত্ত্বের অধিক আত্মীয়, অথচ যাকে অবিশ্বাস ক'রে সে বড়ো হ'য়ে উঠেছে। কেন যুগের হিড়িকে গা ভাসিয়ে দিয়ে এ-সব পবিত্র জিনিশকে সে ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছে সে নিয়ে এখন সে অনুতাপ করলে। ল্যক্লের্ক-এর অসহ্য যন্ত্রণা তার আতঙ্ককে আরো উদগ্র ক'রে তুললো, তাকে তাড়িয়ে নিয়ে এলো সলিমানের মন্ত্র আর ঝাড়ফুঁকে জাগিয়ে-তোলা শক্তিগুলোর জগতের আরো কাছে, সলিমানই এখন দ্বীপের সত্যিকারে প্রভু, অন্য তীর থেকে ধাবমান প্লেগমড়কের সম্ভাব্য রক্ষক, অর্থহীন ব্যবস্থাপত্র লেখকদের মধ্যে একমাত্র চিকিৎসক। জল পেরিয়ে যাতে অলুক্ষুণে সব পচা কুটো বা গন্ধ না-আসে, নিগ্রোটি সেই জন্যে ভাসিয়ে দিলো নারকোলের খোলে তৈরি ছোটো-ছোটো ডিবের নৌকো, পাউলিনার শেলাই বাক্স থেকে বার-করা ফিতে দিয়ে সাজানো সে-সব, আসলে এগুলো হ'লো সমুদ্রের আগুয়াস্থর কাছে পাঠানো নৈবেদ্য ও ভেট। একদিন সকালে ল্যক্লের্কের বাক্সপ্যাটরার মধ্যে পাউলিনা আবিষ্কার করলো একটা মানোয়ারি জাহাজের খুদে নমুনা। সে দৌড়ে চ'লে এলো বেলাভূমিতে, যাতে সলিমান এই শিল্পসামগ্রীটাকেও তার নৈবেদ্যের মধ্যে জুড়ে দিতে পারে। রোগের বিরুদ্ধে সব প্রতিরোধ ব্যবস্থাকেই কাজে লাগানো চাই : ব্রত, মানৎ, উপবাস, চুল কেটে বানানো জামা, প্রায়শ্চিত্ত, যিনি কর্ণপাত করবেন তাঁরই উদ্দেশে স্তবস্তুতি, এমনকী সময়-সময় তা যদি হয় তার শৈশবের মিথ্যাবাদী শত্রুর লোমশ কর্ণকুরে, তাও সই। হঠাৎ, পাউলিনা বাড়ির মধ্যে হেঁটে বেড়াতে শুরু করলো অদ্ভুত ভঙ্গিতে, যে-ক'রেই হোক টালির জোড়গুলো থেকে পা ফেলা এড়ানো চাই—ঐ জোড়গুলো, সব্বাই তো জানে, কাফেরদের অধার্মিক প্ররোচনা ও উশকানিতে চৌকো-চৌকো বর্গ ক'রে বসানো, যারা চায় যে লোকে সারা দিন ক্রুশের ওপর পা ফেলে হাঁটুক। এখন তার স্তনের ওপর সলিমান যে-জল ঢালে তা মোটেই সুগন্ধি আতর মেশানো ঠাণ্ডা পুদিনা জল নয়—বরং গুঁড়ো-করা বিচি, তেলতেলে ফলের রস, পাখির রক্ত আর ব্রাণ্ডি মেশানো মলম। একদিন সকালে আতঙ্কিতা ফরাশি দাসীরা হঠাৎ দেখতে পেলে, পাউলিনাকে ঘিরে-ঘিরে নিগ্রোটি একটি অদ্ভুত নাচ নাচছে, আর সে ব'সে আছে মেঝেয় নতজানু খোলাচুল আলুথালু। সলিমান প'রে আছে শুধু একটা কোমরবন্ধ, যা থেকে ঝুলছে একটা রুমাল, নেংটির মতো, তার পুরুষাঙ্গ ঢাকা তাইতে, তার গলায় শোভা পাচ্ছে লাল-নীল পুঁতি, একটা জংধরা কাটারি

উঁচিয়ে সে পাখির মতো ছোটো-ছোটো লাফ দিয়ে চলেছে। দুজনেই গভীর গোঙাচ্ছে, যেন ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে বেরিয়ে আসছে আওয়াজ, যেন পূর্ণিমার ভরা চাঁদের রাতে ডুকরে উঠছে কুকুর। একটা গলাকাটা মোরগ ঘরময় ছড়ানো গমের দানার মধ্যে তখনও দমকা ঝাপটাচ্ছে। নিগ্রোটি যখন দেখলো যে একটি দাসী দৃশ্যটা তাকিয়ে দেখছে সে রেগে লাথি মেরে দরজার পাল্লা বন্ধ ক'রে দিলো। সেইদিন বিকেলে দেখা গেলো কয়েকজন সন্তের মূর্তি ঝুলছে কড়িকাঠ থেকে—পা ওপরে, মুণ্ডু তলায়। সলিমান—সে এখন আর মুহূর্তের জন্যও পাউলিনার কাছ থেকে নড়ে না—রাতে সে তার ঘরেই একটা লাল ফরাশের ওপর শোয়।

ল্যাক্লের্কের মৃত্যু এলো হলদি জ্বরে, আর পাউলিনাকে তা একেবারে পাগলামির শেষ সীমায় নিয়ে এলো। এখন উষ্ণ মণ্ডলকে তার মনে হয় অসহ্য আর জঘন্য, বাড়ির ভেতরে কেউ যন্ত্রণায় কালঘাম ছোটাচ্ছে আর প্রখর নাছোড় শকুন হা ক'রে ব'সে আছে বাড়ির ছাদে। সিডারের তৈরি একটা কফিনে পোশাকি উর্দি সরিয়ে তার স্বামীর দেহ শোয়াবার পর, পাউলিনা প্রায় চক্ষের পলকে উঠে পড়লো 'সার্ফশিওর' জাহাজে, রোগা, কোটরে বসা চোখ, স্তন দুটি সন্ন্যাসিনীদের পোশাকের পট্টি দিয়ে বাঁধা। কিন্তু বেশিক্ষণ লাগলো না, পুবালি হাওয়া যেই নারীকে ক্রমে গলুইয়ের কাছে এনে ফেললো আর নোনা হাওয়া কফিনের অংটাগুলোয় জং ধরিয়ে দিলো, তরুণী বিধবাটি তার রুক্ষ বসন মোচন করতে শুরু করলে। আর একদিন বিকেলে যখন শুভ্রশীর্ষ সমুদ্র পাটাতনের কাঠে মড়মড় শব্দ তুললো, তার শোকবিধুর ওড়নার আঁচল এক তরুণ অফিসারের সোনার নালের গায়ে তালগোল পাকিয়ে জড়িয়ে গেলো, জেনারেল ল্যাক্লের্কের মরদেহের তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব ছিলো তার। যে-বেতের ঝুড়িটায় তার দলাপাকানো ক্রেয়োল ছদ্মবেশগুলো ছিলো, তাতে ভ্রমণ করছিলো পিতা লেগবার এক মন্ত্রপূত কবচ, সলিমানের বানানো, যেটা পাউলিনা বোনাপার্তের জন্য রোমের রাস্তা খুলে দেবে ব'লেই ছিলো নিয়তিনির্দিষ্ট।

উপনিবেশে তখনও যেটুকু কাণ্ডজ্ঞান অবশিষ্ট ছিলো, পাউলিনার বিদায় নেবার ঘটনা তারও অবসান সূচিত করলে। রশ্মিপুর সরকারের আমলে, সমভূমির বাকি সব জমিমালিকরা—প্রাক্তন সমৃদ্ধি ফিরে পাবার সব আশা হারিয়ে—এক বিশাল ইন্দ্রিয়বিলাসের তালমানছেঁড়া আসরে অকাতরে, নির্বাধে, নিজেদের ছেড়ে দিলো। ঘড়ির দিকে আর কেউ দৃক্‌পাতও করে না, উষাও

আর সূচিত করে না, রাত্রির অবসান। সংকেতবাক্য হ'লো, সর্বনাশ সব সুখ কপাৎ ক'রে গিলে ফেলার আগে যা পারো পান ভোজন ফুর্তি ক'রে নাও। মেয়েছেলের বিনিময়ে কৃপা বিলোন রাজ্যপাল। এল্ কাবোর মহিলারা ল্যাক্লের্কের ঘোষণাকে টিটকিরি দেয়, যিনি বারফট্টাই ক'রে বলেছিলেন, 'পদমর্যাদা যা-ই হোক না কেন, যে শ্বেতাঙ্গিনী নিগ্রোদের মধ্যে বেশ্যাবৃত্তি করবে তাকে ফ্রান্সে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়া হবে।' অনেক স্ত্রীলোকই হ'য়ে গেলো সমকামিনী, নাচের আসরে তারা হাজির হয় মুলাটো তরুণীদের সঙ্গে, যাদের তারা বলে নষ্ট মেয়ে। বাচ্চা বয়েসেই ধর্ষণ করা হ'লো ক্রীতদাসদের মেয়েদের। এইই হ'লো বিভীষিকার দিকে সরাসরি ধাবমান রাস্তাটা। ছুটির দিনে রশ্মিপুর নিগ্রোদের ছুঁড়ে দেন কুত্তার পালের কাছে, আর জানোয়ারগুলো যদি এত দর্শকের সামনে ঝকমকে চমৎকার সাজা হিশেবে কোনো নিগ্রোর গায়ে দাঁত বসাতে ইতস্তত করে, বলিকে খোঁচানো হয় তলোয়ারের ডগায়, যাতে রক্ত ঝ'রে পড়ে লোভনীয়, তাতিয়ে তোলে। এতে নিগ্রোরা যথাস্থানে থাকবে, এই পূর্বানুমান ক'রে রাজ্যপাল কুবায় শয়ে-শয়ে মাস্টিফ চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন : 'ওরা নিগার বমি করবে!'

তি নোয়েল যে-জাহাজটাকে দেখেছিলো, সেটাকে যেদিন দেখা গেলো এল্‌কাবোয় ঢুকতে, সেটার সঙ্গে বাঁধা ছিলো মার্তিনিক থেকে আসা আরেকটা তিনমাস্তুল জাহাজ, তাতে ছিলো বিষধর সব সাপ ; জেনারেল ফন্দি এঁটেছিলেন তাদের তিনি সমভূমিতে ছেড়ে দেবেন, যাতে তারা দূরে-দূরে কুঠুরিগুলোয় গিয়ে চাষীদের ছোবলায়—হতভাগারা পাহাড়ে-পর্বতে পালিয়ে-যাওয়া ক্রীতদাসের সাহায্য করে। কিন্তু সাপেরা—তারা দাম্বালার জীব—ডিম না-পেড়েই মারা গেলো—প্রাচীন সরকারের শেষ উপনিবেশিকদের সঙ্গে-সঙ্গে তারাও উধাও হ'য়ে গেলো। এখন মহান লোয়া হাত্ত ছড়ালেন নিগ্রোদের বাহুতে। জয় তাদেরই হ'লো যাদের ছিলো স্তুতি করার মতো রণদেবতা। ওগুন-বাদাগ্রি পরিচালনা করলেন ঠাণ্ডা ইস্পাতের ফলাগুলোর হামলা—যুক্তির দেবীর শেষ কেল্লাটির বিরুদ্ধে। আর, যেমন হয় স্মরণযোগ্য সব দ্বৈরথেই—কেননা কেউ একজন সূর্যকে থমকে দিয়েছিলো নিশ্চল অথবা শিঙার একফুঁয়ে নামিয়ে ফেলেছিলো দেয়াল—তখনকার দিনে এমন পুরুষ ছিলো যারা তাদের খোলা বুক দিয়ে ঢেকে দিতো শত্রুর কামানের মুখ, যারা তাদের শরীর থেকে শিশের গুলিকেও অন্যদিকে পিছলে ফেলবার ক্ষমতা রাখতো। এই সেই সময় যখন গ্রামেগঞ্জে দেখা দিতে লাগলো নিগ্রো যাজকেরা মস্তকমুণ্ডন না-ক'রেই, বিদ্যাভ্যাস না-ক'রেই, যাদের

বলা হ'তো সাভান্নার পাদ্রি। মুমূর্ষুর তৃণশয্যার পাশে যখন লাতিনে প্রার্থনা করার সময় আসতো, তারা ছিলো ফরাশি পাদ্রিদের মতোই সমান জ্ঞানী। কিন্তু তারা আগের চেয়ে ভালো ক'রে বোঝাতে পারলো নিজেদের, কারণ যখন তারা আবৃত্তি করতো প্রভুর স্তব অথবা মারিয়ার বন্দনা, তারা কথাগুলোয় এমন ঝোঁক, এমন স্বরাঘাত দিতো, যাতে সে-সব শোনাতো সকলেরই চেনাজানা স্তবস্তুতির মতো। অবশেষে অন্তত জীবনমরণের কিছু-কিছু সমস্যার দেখাশুনো করা যাচ্ছে পরিবারের গণ্ডিতেই।

তৃতীয়

যে-কোনোখানেই দেখা যেতো সোনার রাজমুকুট—কোনো-কোনোটা এত ভারি যে তুলতে গেলেও কষ্ট হ'তো।

—কার্ল রিটার

(সান সুসির লুঠতরাজের অন্যতম সাক্ষী)

১

অলক্ষণ

একজন নিগ্রো, বুড়ো, তার কড়া-পড়া বুড়ো আঙুলের হাড়ের কাছে মাংস বেরিয়ে এসেছে, অথচ তবু সেই পায়ের ওপর অটল খাড়া, তিন-মাস্তুল জাহাজটা থেকে নেমে এলো—এইমাত্র জাহাজটা কে স্যাঁ মার্ক-এ নোঙর ফেলেছে। দূরে, উত্তরে, এক শৈলশিরা ভূদৃশ্যের নীল সীমারেখা এঁকে দিয়ে গেছে, আকাশের নীলের চেয়ে তা গাঢ় নয় মোটেই। সময় নষ্ট না-ক'রে, তি নোয়েল, তার হাতে একটা শক্ত লিগনুম ভাইতের লাঠি, শহর থেকে বেরিয়ে পড়লো। সেই যেদিন সান্তিয়াগো দে কুবার এক খামারমালিক তাকে মঁসিয় লেনর্‌মঁ দ্য মেজির কাছ থেকে তাশের জুয়োয় জিতে নিয়েছিলো, তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। তার একটু পরেই মঁসিয় লেনর্‌মঁ দ্য মেজি মারা গেছেন দুঃসহ দারিদ্রের মধ্যে। কুবার মালিকের কাছে, তি নোয়েলের বেঁচে-থাকাটা উত্তরের সমভূমির ফরাশিদের চেয়ে তুলনায় সহজতর ছিলো, সহ্য করা যেতো। বছরের পর বছর তার বড়োদিনের বখশিশ জমিয়ে, সে শেষটায় একটা জেলে-নৌকোয় ক'রে আসার ভাড়া জোগাড় করেছে, ঘুমিয়েছে জাহাজের খোলা পাটাতনেই। যদিও তাকে দু-দু-বার লোহাদাগা

হয়েছিলো, তি নোয়েল এখন স্বাধীন। সে এখন এমন-এক দেশের মাটিতে প' দিয়েছে, যেখানে চিরকালের মতো ক্রীতদাস প্রথা বাতিল হ'য়ে গেছে।

তার প্রথমদিনের পথচলা তাকে নদীর তীরে নিয়ে এলো; সেখানে একটা গাছতলাতেই সে রাতটা কাটিয়ে দিলে। পরদিন সকালেই সে আবার বেরিয়ে পড়লো, এবার রাস্তাটা গেছে বুনো আঙুরের ক্ষেত আর বাঁশঝাড়ের মধ্য দিয়ে। ঘোড়াদের যারা স্নান করাচ্ছিলো, তারা তাকে দেখে কী সব কথা বললে হেঁকে, সে তা তেমন ভালো বুঝতে পারেনি, তবে সে নিজের মতো ক'রেই যা-হোক একটা উত্তর দিয়েছে। তাছাড়া, তি নোয়েল যখন একা থাকে, তখনও কখনো একা থাকে না। অনেক দিন ধ'রেই সে আয়ত্ত করেছে চেয়ারটেবিল, বাসন-কোশন, এমন কী গোরুবাছুর অথবা তার নিজেরই ছায়ার সঙ্গে কথা বলার বিদ্যে। এই লোকগুলো সব বেশ হাসিখুশি। কিন্তু রাস্তার একটা মোড় ঘুরতেই মনে হ'লো গাছপালা লতাপাতা সব শুকিয়ে আছে, মাটি আর আগের মতো লাল চকচকে দেখাচ্ছে না, বরং কোনো মণিকোঠার ধুলোর আস্তরের মতো হ'য়ে আছে—আর গাছপালাগুলো সব যেন গাছপালার কঙ্কাল। নেই কোনো ঝলমলে গোরস্থান, শাদা পলেস্তারা বোলানো ছোটো-ছোটো সমাধিগুলো আর নেই, সেগুলোকে দ্রুপদী মন্দিরের মতো দেখাতো, বরং জায়গাটা এখন যেন কুকুরের আস্তানার মতো হ'য়ে আছে। এখানে মৃতেরা সমাহিত হয় রাস্তার পাশে, এক অগম্ভীর মন খারাপ চুপচাপ সমতল জমিতে—যেখানে এখন হামলা করেছে কণিমনসা আর কাঁটাঝোপ। মাঝে-মাঝে চারটে থামের ওপর দাঁড় করানো পরিত্যক্ত ছাদগুলো ব'লে দেয় দূষিত মহামারীর সংক্রাম থেকে তার বাসিন্দাদের পলায়নের কাহিনী। এখানে যা-কিছু গজায় তারই আছে ধারালো কিনার, কাঁটা বার করা বনগোলাপের ঝোপ, অলুক্ষণে সব শুকনো-শুকনো গর্ত। যে অল্প ক-জন লোকের সঙ্গে তি নোয়েলের দেখা হ'লো তারা তার সম্ভাষণের উত্তরও দিলে না, কুকুরের ঝোলা চোয়ালের মতো চোখ নামিয়ে তারা যেন মাটির ওপর দৃষ্টি দিয়েই থপথপ ক'রে চলেছে। হঠাৎ নিগ্রোটি থেমে গেলো, দম আটকে গেলো তার। একটা কাঁটাগাছ থেকে ঝুলছে ফাঁসি দেয়া একটা ছাগল। জমিটা চিহ্নপ্রতীকে ভরা: তিনটে পাথর এমনভাবে সাজানো যেন একটা অর্ধবৃত্ত, একটা ভাঙা ডাল যেন দরজার ওপর চৌখা কোণতোলা খিলেন। আরো এগিয়ে দেখা গেলো, একটা আঠালো ডাল থেকে কয়েকটা কালো মোরগ ঝুলছে, মুণ্ডু নিচে। চিহ্নগুলো অবশেষে যেখানে শেষ হ'য়ে গেলো, সেখানে একটা বেজায়

অলুক্ষণে গাছ দাঁড়িয়ে: তার ডালগুলো যেন কালো-কালো কাঁটার রোঁয়া ফুলিয়ে আছে, আশপাশে প'ড়ে আছে নৈবেদ্য। পথের দেবতা লেগবার যষ্টির মতো তার শেকড়-বাকড়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে দোমড়ানো তেড়াবেঁকা গ্রন্থিল ডালপালা।

তি নোয়েল প'ড়ে গেলো নতজানু, আবার তাকে গরীয়ান সনদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ধন্যবাদ দিলো আকাশকে। কারণ সে তো জানে—সান্‌তিয়াগো দে কুবার সব ফরাশি নিগ্রোই যেমন জানে—যে জয় শুধু এক বিশাল সম্মেলনের ফল, যে-চুক্তির মধ্যে যোগ দিয়েছে লোকো, পেত্রো, ওগুন-ফেরাই, ব্রিস-পিম্বা, কাপলাউ-পিম্বা, মারিনেং বোয়া-শেশ এবং আগুন ও বারুদের আরো সব দেবতা, যে-মৈত্রীটা চিহ্নিত হ'য়ে আছে এমনই ভয়াবহ কতগুলো আক্ষোভের পরম্পরায় যে কিছু লোক মন্ত্রবলে ভোজবাজির মতো উৎক্ষিপ্ত হয়েছে শূন্যে অথবা নিক্ষিপ্ত হয়েছে মাটিতে। তারপর রক্ত, বারুদ, গম আর কফির গুঁড়ো মিশিয়ে এমন একটা ঠাশবুনুনি ভেলা পাকানো হয়েছে যেটা মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে পূর্বপুরুষের দিকে, যখন দপদপ ক'রে উঠেছিলো পবিত্র সব ঢাক, আর এক লেলিহান অগ্নিশিখার ওপর দীক্ষিতের অসির ফলা গায়ে-গায়ে ঠোকাঠুকি লাগিয়েছিলো। যখন দিব্যোল্লাস পৌঁছেছিলো জরাতুর তীব্রতায়, অধিরুঢ় মানুষ লাফিয়ে উঠেছিলো দু-জন পুরুষের কাঁধে—সেই দুই পুরুষ হেষাধ্বনি করছিলো—আর তারপর সবাই জুড়ে গিয়েছিলো থাবাওলা সেন্টরের এক পার্শ্বচিত্রে—যে কদমে-কদমে নেমে গিয়েছিলো সমুদ্রে, রাত্রি পেরিয়ে, অনেক অনেক রাত্রিরও দূরে, যে সমুদ্রের জল আছড়ে পড়ছিলো প্রবল শক্তিধরদের জগতের তীরে।

২

সান্ সুসি

কয়েকদিন একটানা পথচলার পর, তি নোয়েল কোনো-কোনো জায়গা চিনতে শুরু করলো। জলের স্বাদ তাকে ব'লে দিলো যে এই জলে সে এককালে স্নান করেছে, তবে আরো ভাটির দিকে, যেখানে ঝরনা ঘুরে ঘুরে নেমে গেছে উপকূলের

উদ্দেশে। যে-গুহাটায় এককালে মাকান্দাল তার বিষ জ্বাল দিতো, তার কাছ দিয়ে সে চ'লে গেলো। উত্তরের সমভূমিতে নেমে আসার জন্য ক্রমবর্ধমান অধীরতার সঙ্গে সে নেমে এলো দোন্দোর সরু উপত্যকার ঢাল। তারপর, সমুদ্রতীর ধ'রে, সে চললো ম'সিয় লেনর্ম' দ্য মেজির পুরোনো খামারের উদ্দেশে।

যে-তিনটে সোনাঝুরি রেশমগাছ একটা ত্রিভুজ তৈরি ক'রে দিয়েছে, তাদের দেখে সে বুঝতে পারলো যে সে পৌঁছে গেছে। কিন্তু কিছুই আর প'ড়ে নেই সেখানে—না আছে নীলকুঠি, অথবা তামাকের আড়ত, না আছে গোলাবাড়ি অথবা মাংস জারাবার-ও শুকোবার পাটাতন। শুধু যা প'ড়ে আছে বাড়িটার, সেটা ইটে তৈরি একটা ধোঁয়া ওগরাবার নল, এককালে ছাওয়া ছিলো আইভি লতায়, ছায়া নেই ব'লে এখন যা হুতাশে শুকিয়ে গেছে; শুধু কাদায় ডোবা কয়েকটা শানপাথর ব'লে দিলে কোথায় দাঁড়িয়েছিলো গুদোমঘরগুলো; গির্জেটার যা অবশিষ্ট প'ড়ে আছে, সেটা হাওয়ামোরগের লোহার কঙ্কাল; এখানে-সেখানে প'ড়ে আছে দেয়ালের টুকরোটাকরা—যাদের দেখাচ্ছে কোনো বর্ণমালার মোটা-মোটা ভাঙাচোরা অক্ষরের মতো। সরল গাছের ঝাড়, আঙুর ক্ষেত, ইওরোপের গাছগুলো সব উধাও হয়েছে, বাগানটাও তাই—যেখানে অতীতে শতমূলীরা তুলে দিয়েছিলো তাদের বিবর্ণ ডাঁটি আর মোটা-মোটা পাতার আড়ালে হাতিচোকেরা লুকিয়ে রেখেছিলো তাদের হৃদয়, পুদিনা আর ধনেপাতার গন্ধের মধ্যে। খামারটা যেন কোনো পোড়ো জমি, যার মধ্য দিয়ে গেছে রাস্তা। তি নোয়েল পুরোনো ইমারতটার এক কোণার একটা পাথরের ওপর ধপ ক'রে ব'সে পড়লো—যাদের মনে নেই তাদের কাছে এই পাথরটা অন্য যে-কোনো পাথরের মতোই দেখাবে। পিঁপড়েদের সঙ্গে কথা বলছিলো সে, হঠাৎ একটা আকস্মিক শব্দ শুনে মাথা ঘুরিয়ে তাকালো। জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে চ'লে আসছে চকচকে উর্দি-গায়ে এক ঘোড়সোয়ার, লম্বা নীল কুর্তা, ছিমছাম কোর্ত আর ফাঁস জড়ানো, চুনটকরা সূচিকর্মেভরা গলবন্ধ, পুরু আঁচললাগানো কিংখাবের ফিতে, পালক-লাগানো টুপি, আর নাল লাগানো ঘোড়সোয়ারের বুটজুতো। শাদাসিধে ইস্পানি ঔপনিবেশিক উর্দির সঙ্গে পরিচিত, তি নোয়েল হঠাৎ অবাক হ'য়ে আবিষ্কার করলে নাপোলিয়ঁর শৌখিন পোশাকের জাঁকজমক, এ-পোশাক তার জাতির লোককে এমন এক সমারোহ দিয়েছে, কর্সিকার সেই সেনাপতি যা স্বপ্নেও ভাবেননি। ঘোড়সোয়ারেরা তার পাশ কাটিয়ে চ'লে গেলো

মিলো-র দিকে, যেন সোনালি ধুলোর মেঘে ঢাকা প'ড়ে মিলিয়ে গেলো। বুড়ো এই দৃশ্য দেখে সম্মোহিত; সে ধুলোর মধ্যে তাদের ঘোড়ার রাস্তা অনুসরণ করলে।

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেই তার মনে হ'লো সে যেন এক ঐশ্বর্যেভরা সুখবিতানে এসে হাজির হয়েছে। মিলো গ্রামটার চারপাশে সব জমি যেন বাগানের মতো যত্ন নিয়ে সাজানো; জ্যামিতিক নকশার মতো বসানো সেচের খাল, আর কচি অঙ্কুর আর ঘন দূর্বায় শ্যামল কুসুমশয্যা। বিস্তর লোক কাজ করছে মাঠগুলোয়, চাবুক হাতে সৈন্যদের সজাগ তত্ত্বাবধানে, যারা মাঠে-মাঠে নিরুদ্যম পেছিয়ে-পড়া লোকদের ত্যাগ ক'রে ঢিল ছুঁড়ছে। 'বন্দী সব', নিজের মনেই ভাবলে তি নোয়েল, আর তাকিয়ে দেখলে যে প্রহরীরা সবাই নিগ্রো, কিন্তু মজুররাও তাই; সান্তিয়াগো দে কুবায় কোনো-কোনো রাতে ফরাশি নিগ্রোদের উৎসবমুখর জমায়েতে গিয়ে সে যে-ধারণা করেছিলো, এ-দৃশ্য তার বিরোধী। তবু বুড়ো তার পথে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো: তার দীর্ঘজীবনের সবচেয়ে অভিভূত করা দৃশ্য এটা। গভীর সব নয়ানজুলির মধ্যে থেকে বেগনি-ডোরা-কাটা গিরিমালাকে পশ্চাৎপটে রেখে উঠেছে গোলাপি এক প্রাসাদ, সূক্ষাগ্র ধনুকাকৃতি খিলান দেয়া জানলা তার, তার পাথরে তৈরি উঁচু সোপানশ্রেণীর জন্য তাকে প্রায় শূন্যচারী দেখাচ্ছে, প্রায় বায়বীয়। একপাশে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘ ছাতের ছাউনি—সেগুলো সম্ভবত কারখানা, আস্তাবল আর শিবির। অন্যপাশে দাঁড়িয়ে আছে এক সুগোল ইমারত, শাদা-শাদা স্তম্ভের ওপর তার গম্বুজটা যেন মুকুটের মতো পরানো; সেখান থেকে ঢোলা আলখাল্লা পরা ধর্মযাজকেরা আসছে যাচ্ছে। যত কাছে এগিয়ে এলো, তি নোয়েল ক্রমে-ক্রমে তত দেখতে পেলো অলিন্দ, মূর্তি, তোরণশোভিত পথ, উদ্যান, লতায় ছাওয়া বীথিকা, কৃত্রিম ঝরনা আর চিরহরিৎ গাছপালার জটিল গোলকধাঁধা। ভারি-ভারি স্তম্ভের তলায়—কালো কাঠের এক বিশাল সবিতায়ে ধ'রে আছে সেই স্তম্ভগুলো ছটি—ব্রন্জে তৈরি সিংহ পাহারা দিচ্ছে। প্রধান এসপ্লানাদের ওপাশে শাদা উর্দিপরা সামরিক কর্মীরা ব্যস্তভাবে যাতায়াত করছে, দ্বিচূড় টুপি পরা তরুণ কাপ্তেন, ঝিকিয়ে দিচ্ছে রোদের ফলাগুলো, উরুর পাশে ঝনঝন করছে অসি। একটা খোলা জানলা দিয়ে ভেসে এলো নাচের অর্কেস্ট্রার আওয়াজ—তালিম চলেছে পুরো দমে। প্রাসাদের বাতায়নে দেখা যাচ্ছে মহিলাদের, মাথায় পালক বসানো টুপি, তাদের ভরা বুক তাদের শৌখিন ঘাঘরার আঁটো কোমরবন্ধের জন্য

আরো উত্তুঙ্গ হ'য়ে উঠেছে। একটা বাহির উঠোনে দুই কোচোয়ান একটা সোনায়মোড়া মস্ত ঘোড়ার গাড়ি ধুচ্ছে—গাড়ির ওপর পেতলের গায়ে সূর্য আঁকা। সেই যে গোল ইমারতটা থেকে যাজকরা বেরিয়ে আসছিলো তার সামনে দিয়ে যাবার সময় তি নোয়েল আবিষ্কার করলো সেটা আসলে নিষ্কলুষ জন্মের প্রতিমা বসানো একটা গির্জে—পর্দা, নিশেন আর চাঁদোয়ায় সাজানো।

কিন্তু তি নোয়েলকে যেটা সবচেয়ে তাজ্জব করলো সেটা এই আবিষ্কার, যে এই অবিশ্বাস্য জগৎ—এর সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কিছুর কথা এল্ কাবোর ফরাশি রাজ্যপালরা কক্‌খনো জানেননি—আসলে নিগ্রোদেরই জগৎ। কারণ ঐ রূপবতী সুডৌল নিতম্বের মহিলারা, ঐ যারা ট্রাইটনের ফোয়ারাটাকে ঘিরে-ঘিরে নাচছে, তারা নিগ্রো, ঐ যে শাদা দুই আলখাল্লা পরা ধর্মযাজক বগলে চামড়ার থলে নিয়ে প্রধান সোপান দিয়ে নেমে আসছেন, তাঁরাও নিগ্রো; বাবুর্চি—সেও নিগ্রো; তার লম্বা টুপিটায় একটা নেউলের ল্যাজ; প্রধান শিকারির নেতৃত্বে কয়েকজন গ্রামবাসী ঐ যে একটা হরিণকে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে, বাবুর্চি সেটা নিতে বেরিয়েছে; ঐ যে ঘোড়সোয়ারবাহিনীর ছোকরাগুলো ঘোড়া চালানোর গোল চত্বরে ধনুকের মতো পিঠে বাঁকিয়ে ঘোড়াদের দিয়ে যে লাফ দেয়াচ্ছে, তারাও নিগ্রো; ঐ যে প্রধান কঞ্চুকী ঐ যার গলায় রুপোর হার বাইরের নাটমঞ্চে নিগ্রো অভিনেতাদের মহড়া দেখছে রাজার রাজপারিষদালকের সঙ্গে, সে নিগ্রো; ঐ যে শাদা পরচুল পরা খানশামার দল—ঐ যাদের সোনার বোতামগুলো ঘুঁটিয়ে দেখছে সবুজ মখমলে শোভিত এক খানশামা—তারাও সবাই নিগ্রো; আর, সবশেষে, নিগ্রো, শুভ, সুমঙ্গল এবং নিগ্রো—যে অভিনন্দনগানের মহড়া দিচ্ছে নিগ্রো-সংগীতজ্ঞরা, তাদের দিকে তাকিয়ে গির্জের উঁচু বেদী থেকে যে নিষ্কলুষ জনমদাত্রী মৃদুমধুর হাসছেন, তিনিও নিগ্রো। তি নোয়েল বুঝতে পারলো সে সান্ সুসিতে এসেছে, রাজা ক্রিস্তফের যেটা প্রিয় আবাস, যে ক্রিস্তফ একদিন ছিলো ওবের্জ দ্য লা কুরন্-এর মালিক, যে-ক্রিস্তফ একদিন ছিলো রু দ্য এস্‌পানিওলের প্রাক্তন বাবুর্চি, যে এখন নিজের স্বাক্ষর করা টাকা বানাচ্ছে, যে-টাকার গায়ে খোদাই করা হচ্ছে এই আপ্ত বাক্য: 'ঈশ্বরই আমার ন্যায় এবং আমার তরবারি।'

বুড়োর পিঠে একটা ভারি চাপড় পড়লো। সে মুখ ফুটে কোনো প্রতিবাদ করার আগেই, এক প্রহরী তার পাছায় লাথি কষাতে-কষাতে তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে চললো একটা ছাউনির দিকে। যখন সে আবিষ্কার করলো যে একটা

ছোট্ট কুঠরিতে সে তালাবন্ধ প'ড়ে আছে, তি নোয়েল চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে বলতে লাগলো যে সে ব্যক্তিগতভাবে রাজা ক্রিস্তফের পরিচিত—শুধু তা-ই নয়, তার এই ধারণাটাও সে ব্যক্ত করতে ছাড়লে না যে সে শুনেছে ক্রিস্তফ যাকে বিয়ে করেছেন সেই মারিয়া-লুইসা কোয়াদাভিদকেও সে চেনে, সে ছিলো মুক্ত লেসনির্মাতার ভাগ্নী, মাঝে-মাঝে মঁসিয় লেনরমঁ দ্য মেজির খামারেও আসতো। কিন্তু কেউ তার দিকে দৃক্‌পাতও করলে না। বিকেলবেলায় অন্য কয়েদীদের সঙ্গে তাকেও নিয়ে যাওয়া হ'লো ল্য বনে দ্য লেভেক্-এর তলায়—যেখানে বাড়ি বানাবার জন্য ইটচুনশুরকির একটা বিশাল স্তূপ প'ড়ে ছিলো। তারও হাতে একটা ইট তুলে দেয়া হ'লো।

'নিয়ে যাও ওপরে—আরেকটার জন্য ফিরে এসো।'

'আমি বড্ড বুড়ো।'

একটা মুণ্ডরের বাড়ি পড়লো তি নোয়েলের মাথার খুলিতে। আর কোনো আপত্তি না ক'রে সে খাড়া পাহাড়টা বেয়ে উঠতে শুরু করলো, যোগ দিলো এক লম্বা মিছিলে: বাচ্চা-কাচ্চা, গর্ভিনী মেয়ে, বুড়োবুড়ি, সবাই একটা ক'রে ইট নিয়ে যাচ্ছে। বুড়ো পেছন ফিরে মিলো-র দিকে তাকালো। অপরাহ্নের আলোয় প্রাসাদকে আরো গোলাপি দেখাচ্ছে। পাউলিনা বোনাপার্তের একটা আবক্ষ মূর্তির সামনে—মূর্তিটা এককালে তার এল্ কাবো-র বাড়িতে শোভা পেতো—ছোট্ট রাজকন্যারা, আতেনা আর আমেতিস্তা, লেসের ঝালর লাগানো সাটিনে সেজে, হালকা ছোটো ঝাঁঝরি ব্যাট আর পালকে বানানো মোরগ-ফুলের বল নিয়ে খেলা করছে। একটু দূরেই, রানীর যাজক—সারা ছবির মধ্যে এই একটাই গোরামুখ—অঁরি ক্রিস্তফের তৃপ্ত দৃষ্টির নিচে যুবরাজকে প'ড়ে শোনাচ্ছেন প্লুতার্ক-রচিত 'জীবনচরিতগুলো,' অঁরি ক্রিস্তফ তাঁর সচিবদের নিয়ে পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছেন বানীর কুঞ্জবনে। মর্মরপাথরের রূপকগুলির মধ্যে চিরহরিৎ পাতাবাহারের ঝোপগুলো এমনভাবে সাজানো যে মুকুটের মতো দেখায় তাদের; যেতে-যেতে, মহামান্য রাজা, অবহেলাভরে হাত বাড়িয়ে ঝাড়ের মধ্য থেকে একটা সদ্য-ফোটা শ্বেত গোলাপ তুলে নিলেন।

৩

ষাঁড় বলি

লা বনে ছ লেভেক-এর শিখরে, মাচায়-মাচায় খাঁজ-কাটা, উঠে গেছে সেই দ্বিতীয় পাহাড়—পাহাড়ের ওপর আরেক পাহাড়—যা হ'লো লা ফেরিয়ে-র নগরদুর্গ। প্রধান মিনারের পাশ বেয়ে, কিংখাবের বাহুল্যহীন মসৃণতায় উঠে যাচ্ছে লাল ছত্রাকের সমারোহ—এর মধ্যেই তারা ছেয়ে দিয়েছে ভিত্তিভূমি আর আলম্ব, আর গেরি-রং দেয়ালগুলোয় ছড়িয়ে দিচ্ছে শতপদ পরিলেখ। পোড়া ইটের একটা বিরতিহীন বিস্তার—মেঘেরও ওপরে মিনারের মতো এমন ঋজু ও সটান উঠে গিয়েছে যে যথানুপাত চক্ষুর অভ্যাসকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করে: সুড়ঙ্গ, ঢাকা বারান্দা, মৌচাকের মতো বিন্যস্ত সব গুপ্ত পথ, ধোঁয়া ওগরানো লম্বা নলগুলো—সব ভারি ছায়ায় আচ্ছন্ন। কি-রকম যেন সিন্ধুশ্যামল দেখায় আলোকে, ঠিক যেমন দেখায় কাচের চৌবাচ্চায়, এরই মধ্যে শূন্যে তাতে ঝাউপাতার ছোপ লেগেছে—উঁচু-উঁচু গবাক্ষ ও বাতায়ন দিয়ে এসে এক বাষ্পময় কুয়াশার ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। বহুবিধ সাজসরঞ্জাম সমেত তিনটে প্রধান কামানশ্রেণীর বারুদশালা সমেত গোলন্দাজদের গির্জে, রান্নাঘর, চৌবাচ্চা, কামারশালা, ঢালাইঘর, বুরুজ—তাদের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে পাতালে নেমে যাচ্ছে সোপানশ্রেণী। কুচকাওয়াজের জন্য নির্দিষ্ট চৌকো চত্বরটায় প্রতিদিন কতগুলো ষাঁড়ের গলাকাটা হয় যাতে কেল্লাকে অভেদ্য ক'রে তোলবার জন্য রক্ত মিশিয়ে দেয়া যায় চুনশুরকির সঙ্গে। সমুদ্রের দিকে মুখ-করা যে-পাশটা সমভূমির মাথাঘোরানো সুবিস্তীর্ণ দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আছে, সেদিকে প্রাসাদের কোঠাগুলোয় মজুররা এর মধ্যেই জিপসাম আর গুঁড়ো মর্মরশিলা মিশিয়ে পলেস্তারা বোলাতে শুরু করেছে: জেনানামহল, খাবার আর বিলিয়ার্ড খেলার ঘর, দেয়ালে-দেয়ালে কাঠের কাঠামোর মধ্যে পোরা চতুশ্চক্রবগির চক্রনেমি, ঝোলানো সেতুটার গায়ে লাগানো তারা—যার ওপর দিয়ে সবচেয়ে উঁচু অলিন্দটায় ইটপাথর নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—সেতুটা যেন ছড়িয়ে আছে ভেতরের আর বাইরের পাতালের ওপর, যেটার ওপর দিয়ে যাবার সময় মিস্ত্রিদের পেট মোচড় দিয়ে ওঠে ঘূর্ণিরোগে। প্রায়ই কোনো

নিগ্রো মিলিয়ে যায় মহাশূন্যে, সঙ্গে নিয়ে যায় চুনশুরকির পাত্র। তক্ষুনি আরেকজন নেয় তার জায়গা; যে প'ড়ে গেলো, তার সম্বন্ধে আর-কিছুই ভাবে না কেউ। সেই বিশাল ইমারতটার পেটের মধ্যে, চাবুক বন্দুকের চিরজাগ্রত চোখের তলায়, শয়ে-শয়ে লোক কাজ ক'রে যায়, এমন কীর্তি সুসম্পন্ন করে আগে যা শুধু দেখা গিয়েছিলো পিরানেসির কাল্পনিক স্থাপত্যে। দড়ি দিয়ে ওপরে-তোলা, পাহাড়ের মুখোমুখি, প্রথম কামানগুলো আসতে শুরু করেছে, তাদের বসানো হচ্ছে সিডার কাঠের কামানবাহকে, ছায়া-ঢাকা ছোটে-ছোটো ধনুকাকৃতি কুঠুরিতে, গাঁয়ের দিকে এগুনো সব গিরিসংকট আর প্রবেশপথের ওপর নজর রাখা যায় এদের ঘুলঘুলি দিয়ে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে তিন কামান 'সিপিও', 'হানিবাল' আর 'আমিলকার', সাটিন-মসৃণ, এমন-এক ব্রন্জে তৈরি-করা যার রঙের ছোপটা যেন সোনারই; এগুলোর সঙ্গে আছে আরো কামান, সেগুলোকে ঢালাই করা হয়েছে ১৭৮৯-র পর, এখনও অপ্রমাণিত স্বাধীনতা ও সাম্যের নীতিবচন সমেত। আর আছে একটা ইস্পানি কামান যার নলটায় উৎকীর্ণ এক বিষণ্ণ বয়ান *Fiel pero desidichado* (বিশ্বস্ত কিন্তু দুর্ভাগা); আর কয়েকটা আছে যাদের চোঙের ব্যাস আরো বড়ো, আর যাদের নল আরো অলংকৃত ও প্রাচীন, যার ওপর সূর্যদেবতার মোহর খোদাই-করা, উদ্ধতভাবে যা ঘোষণা ক'রে যাচ্ছে *Ultima Ratio Regum* (রাজাদের চূড়ান্ত ভিত্তি)।

তি নোয়েল যখন একটা দেয়ালের নিচে তার ইটটা নামিয়ে রাখলো তখন প্রায় মধ্যরাত। তবুও অগ্নিকুণ্ড আর মশালের আলোয় নির্মাণের কাজ চলেছে। রাস্তার দু-পাশে লোকে ঘুমিয়ে আছে বড়ো-বড়ো শিলাখণ্ডের ওপর, কামানের ওপর, ওপরে ওঠবার সময় বারে-বারে হোঁচট খেয়ে প'ড়ে যে-খচ্চরগুলোর হাঁটুতে কড়া প'ড়ে গেছে তাদের পাশে। অবসাদে ছিঁড়ে গিয়ে বুড়ো ঝোলানো সেতুর তলাকার একটা পরিখায় নেমে পড়লো। ভোরবেলায় তাকে জাগিয়ে দিলে চাবুকের শপাং। ওপরে, আলো ফুটলে যে-ষাঁড়গুলোর গলা কাটা হবে, সেগুলো ডুকরোচ্ছে। ঠাণ্ডা মেঘগুলো চ'লে যেতেই নতুন মাচা নতুন ভারা বানানো হয়েছে; আর, আস্ত পাহাড়টাই জ্যান্ত হ'য়ে উঠেছে হ্রেষায়, চীৎকারে, হাঁকডাকে, রামশিঙার আহ্বানে, চাবুকের শপাংএ, আর শিশিরভেজা দড়ির আড়ভাঙার আওয়াজে। আরেকটা ইটের খোঁজে তি নোয়েল মিলো-র দিকে নামতে শুরু করলো। নামার পথে সে দেখতে

পেলে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সব পথ গলি ফাঁকফোকর দিয়ে উঠে আসছে শিশু, স্ত্রীলোকে, বৃদ্ধের স্তম্ভের মতো স্ফীত সার, প্রত্যেকের হাতে একটা ক'রে ইট, সেটাকে তারা কেল্লার পাদদেশে এনে রাখছে, আর কেল্লা উঠে যাচ্ছে পিঁপড়ের ঢিবির মতো; এই-যে অবিশ্রাম ঋতু থেকে ঋতুতে, বছর থেকে বছরে, সব মরশুমে পোড়া মাটির দানা ব'য়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তারই সৌজন্যে। তি নোয়েল অচিরেই জানতে পেলে যে বারো বছরেরও বেশি হ'য়ে গেলো এই রকমই চলেছে, আর এই অবিশ্বাস্য কাজের জন্য জোর ক'রে ধ'রে আনা হয়েছে উত্তরের সমস্ত লোককেই। সব প্রতিবাদকেই চুপ করিয়ে দেয়া হয়েছে রক্তে। হাঁটা, শুধু হাঁটা, ওপরে আর নিচে, নিচে থেকে ওপরে; নিগ্রোটির মনে হ'লো, সান্ সুসির সংগীতভবনের অর্কেস্ট্রা, উর্দির জমকালো সমারোহ, ফুলের কেয়ারির পাশে-পাশে আঁচলের মতো বিছানো সর্পিল অলংকৃত বেদীর ওপর রৌদ্রস্নাত গৌরাঙ্গিনীদের নগ্নমূর্তি—সবকিছুই এমন-এক দাসত্বের উৎপাদন, যা সে জেনেছিলো মঁসিয় লেনরমঁ দ্য মেজির খামারে—তেমনি জঘন্য তেমনি বমিপাওয়ানো দাসপ্রথার সৃষ্টি এইসব। এমন-কী তার চেয়েও অধম, কারণ নিজেরই মতো মিশমিশে কালো এক নিগ্রো, যার মাথায় নিজেরই মতো কোঁকড়া পশমচুল আর নিজেরই মতো যার পুরু ঠোঁট আর থ্যাবড়া নাক, তার হাতে মার খাওয়ায় একটা সীমাহীন সুপ্রকাশ অপমান আছে; তেমনি নিচু তারও জন্ম, হয়তো তার গায়েও আছে লোহাদাগা—ছ্যাঁকা দিয়ে খোদাই করা মালিকের নাম। এ যেন, একই পরিবারে, ছেলেমেয়েরা পেটাচ্ছে বাবা-মাকে, নাতি-পুঁতি ঠাকুমাকে, ঘরের বউরা শাশুড়িকে—যিনি কিনা এতকাল রেঁধেবেড়ে তাদের খাইয়েছেন সযত্নে। তাছাড়া, তখনকার দিনে, ঔপনিবেশিকরা—যখন তারা কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসতো সে-সময়টা বাদ দিলে—অন্তত সতর্ক থাকতো, দেখতো যে ক্রীতদাসটি যাতে প্রাণে না-মরে যায়, কারণ মরা ক্রীতদাস মানেই পকেট থেকে বেদম গচ্চা। অথচ এখানে কোনো দাসের মৃত্যু জনগণের কোষাগারে বিন্দুমাত্র চাপ ফ্যালে না। যতদিন ছেলেপুলের জন্ম দেবার জন্য কালো স্ত্রীলোক থাকবে—ছিলো তো অতীতে, থাকবেও ভবিষ্যতে, চিরকাল—ল্য বনে দ্য লেভেক-এর শিখরে ইট ব'য়ে নিয়ে যাবার জন্য মজুরের কোনো ঘাটতি হবে না।

কাজ কেমন এগুচ্ছে, সরেজমিন দেখতে এসে, রাজা অঁরি ক্রিস্তফ মাঝে-মাঝে নগরদুর্গের ওপরে উঠে যান, সঙ্গে থাকে ঘোড়সোয়ারদের এক বাহিনী।

দশাসই, বলিষ্ঠ, বুকের খাঁচাটা পিপের মতো, থ্যাবড়া, নাক, তাঁর চিবুক তাঁর পোশাকের গলবন্ধের ঝালরের আড়ালে আদ্ধেক ঢাকা, রাজা ক্রিস্তফ তন্নতন্ন ক'রে ছাখেন গোলন্দাজদের সাজসরঞ্জাম ও কামানশ্রেণী, কামারশালা, কারখানা; সীমাহীন সোপান বেয়ে ওঠবার সময় ঝনঝন ক'রে ওঠে তাঁর জুতোর গোড়ালির নাল। তাঁর নাপোলীয়ঁ ছিঁচড় টুপি থেকে তাকিয়ে থাকে দোরঙা মোরগঝুঁটির পক্ষীচোখ। কখনো-কখনো চাবুক একটু নেড়ে তিনি মৃত্যুদণ্ড দেন কোনো ফাঁকিবাজ অলসের যাকে আচমকা পাকড়ানো গেছে নিদারুণ আলস্যের মধ্যে, অথবা যে হয়তো খুব আস্তে একটা গ্র্যানাইট পাথরের চাঙড় তুলছে খাড়া ঢালটাকে বেয়ে। তাঁর আগমন সবসময়েই শেষ হয় সবচেয়ে উঁচু অলিন্দে নিয়ে-আসা একটা আরামকেদারায় ব'সে পড়ে, যেটা অপলক তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে, যার পাশেই প'ড়ে আছে হা-করা এক বিশাল পাতাল—যাকে দেখে যারা এমনকী সবচেয়ে অভ্যস্ত তারা অব্দি চোখ বুজে ফ্যালে। তারপর, যখন কিছুই থাকে না যা তাঁর ওপর কোনো উদ্বেগ বা ছায়া ফেলতে পারে, সকলের চেয়ে উঁচুতে, তাঁর নিজেরই ছায়ার ওপর দাঁড়িয়ে, তিনি পরিমাপ করেন তার ক্ষমতার প্রসার। দ্বীপটা ফিরে দখল ক'রে নেবার জন্য যদি কোনো চেষ্টা করে ফ্রান্স, তিনি, অঁরি ক্রিস্তফ, 'ঈশ্বরই আমার ন্যায় ও আমার তরবারি', তাদের প্রতিরোধ করবেন এখানে, মেঘেরও ওপরে, যতক্ষণ লাগে ততক্ষণ, আর তাঁর সঙ্গে থাকবে তাঁর গোটা রাজসভা, তাঁর সেনাবাহিনী, তাঁর ধর্মযাজক, তাঁর গায়ক-সাংগীতিক, তাঁর কাফ্রিভৃত্য, তাঁর ভাঁড় ও সং। ঐ একচক্ষু রাক্ষুসে দেয়ালগুলোর ভেতর তাঁর সঙ্গে থাকতে পারবে পনেরো হাজার লোক এবং কোনো অভাবেই তাদের কোনো কষ্ট হবে না। একমাত্র ফটকটির ঝুলসেতুটা একবার টেনে তোলবামাত্র লা ফেরিয়ে-র নগরদুর্গ হ'য়ে উঠবে তাঁর দেশ, তাঁর স্বাধীনতা, তাঁর রাজত্ব—তাঁর কোষাগার আর সব জাঁকজমক সমেত। কারণ, নিচে, এটাকে গ'ড়ে তোলবার পেছনে যে দুঃসহ যন্ত্রণা জড়ানো ছিলো, সে-সব ভুলে গিয়ে, সমভূমির লোকেরা মুখ তুলে তাকাবে দুর্গের দিকে—শস্য বোঝাই, বারুদ বোঝাই, লোহায় সোনায় ভরপুর, ভাববে যে সেখানে, পাখিদেরও ওপরে, ওখানে, যেখানে নিচের জীবন শুধু মোরগের ডাক আর ঘণ্টার শব্দের সুদূর ধ্বনি মাত্র, তাদেরই জাতির একজন রাজা অপেক্ষা ক'রে আছেন, স্বর্গের কাছাকাছি, আর রাজা—সবখানেই তিনি একরকম,—অপেক্ষা ক'রে আছেন ওগুনের দশ হাজার ঘোড়ার ব্রন্জের ক্ষুরের খটখট

আওয়াজের জন্য। এমনি-এমনি তো আর এই মিনারগুলো তৈরি হয়নি প্রবল ডুকরে-ওঠা রক্তাক্ত ষাঁড়গুলোর ওপর—যাদের অণ্ডকোষগুলো উঁচনো ছিলো সূর্যের দিকে ; যে কারিগররা নিজের হাতে এদের গড়েছে তারা ভালো ক'রেই জানে বলিদানের গভীর তাৎপর্য, যদিও তারা অজ্ঞদের এই কথাই বুঝিয়েছে যে এটা সামরিক প্রকৌশলবিদ্যারই অগ্রগতির প্রতীক।

৪

কারারুদ্ধ

নগরদুর্গের কাজ যখন শেষ হ'য়ে আসছে, ইটবাহকদের চাইতে যখন মিস্ত্রিদেরই প্রয়োজন বেশি, নিয়মানুবর্তিতার সুকঠোর শৃঙ্খলায় একটু ঢিলে পড়লো। চুনশুরকি আর সেকেলে সব কামানকে তখনও যদিও উঁচু শিখরটায় ব'য়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, অনেক স্ত্রীলোককেই অনুমতি দেয়া হয়েছিলো মাকড়শার জালে প্যাঁচানো তাঁদের হাঁড়িকুঁড়ির কাছে ফিরে যাবার। নিরতিশয় অপ্রয়োজনীয়তার জন্য যাদের চ'লে যেতে দেয়া হয়েছিলো তাদের সঙ্গে তি নোয়েলও একদিন সকালে পাহারার চোখে ধুলো দিয়ে শট্‌কে পড়লো—রাজকন্যাদের মহলের কামানগুলোর পাশে তখন আর কোনো ভারা বাঁধা ছিলো না—কিন্তু তবু তি নোয়েল সেদিকটায় আর ফেরেনি। বাসকক্ষের মেঝেগুলো তৈরি করা হবে ব'লে এখন ঢাল বেয়ে শাবলের সাহায্যে গড়িয়ে তোলা হচ্ছে বড়ো-বড়ো কাঠ। কিন্তু এ-সব কিছুতেই তি নোয়েলের আর কোনো আকর্ষণ ছিলো না ; তার শুধু একটাই চিন্তা—কেমন ক'রে আবার লেনরমঁ ছ মেজির পুরোনো জমি-জিরেতে ফিরে গিয়ে নিজের থাকার একটা ব্যবস্থা করতে পারে, যে-কাদার মধ্যে জন্ম হয়েছিলো কোন্ এক টানে তার মধ্যেই যেমন ক'রে ফিরে যায় বান মাছ, তেমনিভাবেই সে এখন ফিরে যাচ্ছে ঐ জমিতে। গোলাবাড়িতে ফিরে এসে নিজেকে তার কেমন একটু মালিক-মালিক লাগলো, এই জমির সীমানাসরহদ্দির যদি কোনো তাৎপর্য থেকে থাকে, সে তবে শুধু তার কাছেই : তার কাটারিটা দিয়ে সে ধ্বংসস্তূপটাকে একটু-একটু ক'রে সাফ করতে শুরু ক'রে দিলো। দুটো বাবলাগাছ ছড়মুড় প'ড়ে গিয়ে খুলে দেখালো দেয়ালের একটা অবশেষ। একটা বুনো ঝোপের পাতার আড়াল থেকে গা ঝাড়া

দিয়ে বেরুলো খাবার ঘরের নীল টালি। পুরোনো রশুই ঘরটার ফাটলগুলো তালগাছের বাগলো দিয়ে বুজিয়ে দিয়ে, নিগ্রোটি নিজের জন্য এমন-একটা শোবার ঘর ঠিকঠাক ক'রে নিলে, যার মধ্যে তাকে ঢুকতে হয় হামাগুড়ি দিয়ে ; সেটা সে ভরিয়ে দিয়েছে শুকনো ঘাসে, যাতে তার ওপর রাখতে পারে তার ক্লান্ত দেহ, ল্য বনে দ্য লেভেক-এর রাস্তায় মার খেয়ে-খেয়ে কালশিটে প'ড়ে গেছে তার শরীরে।

সেখানে সে পেলো কনকনে শীতের হাওয়ার কাছ থেকে আশ্রয়, তারপর যে বৃষ্টি নামলো তার কাছ থেকেও, তারপর তাকিয়ে দেখলো এসে পড়েছে বসন্ত। অতিরিক্ত পানসে আম আর কাঁচা ফলমূল খেয়ে-খেয়ে তার পিলে ফেঁপে উঠেছে ; অঁরি ক্রিস্তফের স্যাঙাৎদের এড়াবার জন্য যতটা সম্ভব রাস্তাঘাট থেকে দূরে থাকতো সে—তারা হয়তো নতুন-কোনো প্রাসাদ বানাবে ব'লে মজুর ধ'রে বেড়াচ্ছে, হয়তো তীরে যেটা বানাবে ব'লে গুজব শুনেছিলো সেটাই বানানো হচ্ছে এখন—বছরে যতগুলো দিন, সেখানে নাকি ততগুলো জানলা বসানো হবে। কিন্তু নতুন কোনো ঝুটঝামেলা ও ঘটনা ছাড়াই যখন মাসের পর মাস কেটে গেলো, তি নোয়েল, অনাহারে তার উদরভরা, বেরিয়ে পড়লো এল্ কাবো-র উদ্দেশে, সমুদ্রের ধার ঘেঁষে-ঘেঁষে প্রায়-মুছে-যাওয়া পায়ে চলার পথ ধ'রে ধ'রে—অন্য সময় এ-রাস্তা দিয়ে সে কতবার গেছে তার মালিকের পেছন-পেছন : একবার সে এই পথে খামারে ফিরেছিলো একটা বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে, তখনও ঘোড়াটার দাঁত ওঠেনি, সেই-যে ঘোড়াটা, ঘাড়ের ওপর কচি বয়েসের ভাঁজ-পড়া চামড়া ছিলো যার, যার কদমের আওয়াজ ছিলো করদোবার চামড়ার ঘষটানির মতো। শহর ভালো। পিঠের ঝোলায় পোরবার মতো কতকিছু জোটে সেখানে—কত কিছু কুড়োনো যায় আঁকশি দিয়ে। চিরকাল শহরে থাকে দু-একজন বেশ্যা, দয়ার শরীর, সবসময় কোনো বুড়োহাবড়াকে ভিক্ষে দিতে যারা সুপ্রস্তুত ; সেখানে আছে হাটবাজার, নাচগান, হল্লা, ফুর্তি, খেলদেখানো জানোয়ার, কথা-কওয়া পুতুল, আর এমন-সব রসুইকর যারা বেশ মজাই পায়, ভুখ পাওয়ার কথা না-ব'লে কোনো ভিখিরি যখন আঙুল তুলে দেখায় ব্র্যাণ্ডির বোতল। তি নোয়েল অনুভব করলে তার হাড়ে-মজ্জায় যেন বিষম হিম জ'মে গিয়েছে। অতীতের সেইসব বোতলের জন্য দীর্ঘশ্বাস পড়লো তার—বড়ো-বড়ো বাড়িগুলোর মাটির তলার ভাঁড়ারে থাকতো যে-সব বোতল—চৌকো, চ্যাপ্টা, পুরু কাচের, ভেতরে ভরা থাকতো ফলের খোশার কুচি, ওষধি, জাম, আর

কোহলে চোবানো শামুক বা শাপলা, যারা ছিটিয়ে দিতো খুবই মোলায়েম খুশবুর চুপি-চুপি চাপা রং।

কিন্তু শহরে এসে তি নোয়েল দেখতে পেলো সারা শহরটা যেন মৃত্যুর প্রহর গুনে ধুঁকছে। যেন সব বাড়িঘর, সব খড়খড়ি, সব ঘুলঘুলি, সব দরজা-জানলা আর্চবিশপের প্রাসাদের কোণটার দিকে ফেরানো কোনো-এক তীব্র ও শঙ্কাতুর প্রত্যাশায়—প্রত্যাশার তীব্রতাটা এতই বেশি যেন বাড়িঘরের সদরকেও তারা কোনো মানুষী ভ্রূকুটিতে বিকৃত ক'রে ফেলেছে। ছাতগুলো বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের কার্নিশের ছাঁইচ, কোণাগুলো উঁকি দিচ্ছে সামনে, তীক্ষ্ণভাবে, দেয়ালগুলোর গায়ে জোলো স্যাঁতসেঁতে সব দাগ যেন রাশি-রাশি কান এঁকে দিয়েছে। প্রাসাদের কোণায় নতুন চুনশুরকির পলেস্তারা লেপা চৌকো চত্বরটা সবে শুকিয়েছে, মিশে গিয়েছে দেয়ালের চুনশুরকির সঙ্গে, কিন্তু ছোট্ট একটা ফোকর খোলা রেখে গেছে। এই কোটরটার মধ্য থেকে—দন্তহীন মুখের মতো কালো এই কোটরটা—মাঝে-মাঝেই ফেটে বেরোয় এমন-এক আর্তচীৎকার যেটা এমনই ভয়ানক যে সব লোককে তা শিউরে তোলে আর বাচ্চাদের কাঁদিয়ে ছাড়ে। চীৎকারটা যখন ফেটে পড়ে, গর্ভবতী মেয়েরা দু-হাতে চেপে ধরে তাদের পেট, আর পথিকরা ক্রুশ আঁকার তর সয় না এত জোরে ছুট লাগায়। আর আর্তচীৎকার অর্থহীন ডুকরানি—চলতেই থাকে আর্চবিশপের প্রাসাদের কোণায়, যতক্ষণ-না গলাটা—রক্তে দম আটকানো—নিজেকে ছিঁড়ে ফ্যালে শাপশাপান্তে, আঁধার শাসানিতে, ভবিষ্যদ্বাণীতে আর জুজুর ভয়ে। তারপর স্বর বদলে যায় কান্নায়, এমন এক কান্না যেটা উঠে আসে একেবারে বুকের তলা থেকে, যেন কোনো বুড়োর গলায় কোন-এক ছিঁচ-কাঁদুনে বাচ্চার হেঁচকি-তোলা নাকি কান্না, ঐ গলাফাটানো আর্তচীৎকারের চেয়েও যেটা সহ্যাতীত। অবশেষে অশ্রু হ'য়ে ওঠে ফোঁস-ফোঁস দমকা তেতালা শ্বাস—যেটা ক্রমে মিলিয়ে যায় দীর্ঘ এক হাঁপানির টানে, তারপর পরিণত হ'য়ে যায় নিছক সাধারণ শ্বাস-প্রশ্বাসে। আর এই একই জিনিশের পুনরাবৃত্তি হয় দিন-রাত, প্রাসাদের কোণায়। এল্ কাবোতে কেউ ঘুমোয় না। কেউ সাহস করে না আশপাশের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে। বাড়ির সবচেয়ে ভেতর ঘরে নিচু স্বরে ইষ্টদেবতার নাম জপে। কী যে ঘটছে, সে-সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করারও সাহস নেই কারু। আর্চবিশপের প্রাসাদে কারারুদ্ধ সেই কাপুচিন—ছোট্ট উপাসনা কুঠুরিটায় তাঁর জীবন্ত সমাধি হয়েছে—হলেন কোর্নেহো ব্রেইয়ে, স্বয়ং ডিউক, আঁরি ক্রিস্তফের স্বীকারোক্তি শ্রোতা। সেখানেই মরবার

দণ্ডাদেশ বর্তেছে তাঁর ওপর, নতুন পলেস্তারা লাগানো দেয়ালের আড়ালে, কারণ তাঁর অপরাধ নাকি এটাই যে তিনি রাজার সব গুপ্ত তথ্য, নগরদুর্গের যাবতীয় গুপ্ত রহস্য জেনে ফেলে ফ্রান্সে যেতে চেয়েছিলেন; আর, লাল মিনারগুলোয় এর মধ্যেই বাজ পড়েছে কয়েকবার। মিথ্যেই রানী মারিয়া-লুইসা স্বামীর জুতো জড়িয়ে ধ'রে তাঁর হ'য়ে কাকুতি-মিনতি করেছেন। তাঁর দুর্গের বিরুদ্ধে এইমাত্রই একটা নতুন ঝড় লেলিয়ে দেবার জন্য সান পেদ্রোকে অপমান ও ভর্ৎসনা করেছেন আঁরি ক্রিস্তফ, ফলে কোন-এক ফরাশি কাপুচিন তাঁকে নিষ্ফলভাবে ধর্মচ্যুত করলো। তাতে তিনি মোটেই ভয় পান না। আর, কোনো সন্দেহের লেশই যাতে না থাকে, সান্ সুসিতে এক নতুন অনুগ্রহভাজন এসেছেন, এক ইস্পানি ধর্মযাজক, মাথায় তাঁর লম্বাটে সূক্ষ্মাগ্র টুপি, তাঁর চমৎকার দানাদার খাদে ভরা গলায় তিনি যেমন প্রার্থনায় গান করেন তেমনি সারাক্ষণ নানা কেচ্ছাকাহিনী নিয়ে হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটোছুটি করেন, সবাই যাঁকে জানে পাদ্রি হুয়ান দে দিওস নামে। কড়াই-শুঁটি আর শুকনো গোমাংস খেয়ে-খেয়ে ক্লান্ত হ'য়ে ধূর্ত এই ধর্মযাজক অবশেষে হাইতির রাজসভাকে মনের মতো জায়গা ব'লে আবিষ্কার করেছেন, যেখানে মহিলারা স্তূপ ক'রে তাঁকে খাওয়ায় শর্করার রসে চোবানো ফলমূল আর পোর্তুগালের মদ। একদিন যখন রাজা ক্রিস্তফ ডালকুত্তোগুলোকে শেখাচ্ছিলেন ফ্রান্সের রাজার নাম শোনবামাত্র কেমন ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, তখন এই পাদ্রি এমন ভঙ্গিতে তাঁর সামনে কিছু-কিছু কথা ব'লে ফেলেছিলো যেন খুব কিছু ভেবেচিন্তে বলেনি, সেই কথাগুলোই কোর্নেহো ব্রেইয়ের এই ভয়ংকর অসম্মানের কারণ ব'লে জনরব।

এক সপ্তাহ কারাবরোধের পর কাপুচিনের গলার স্বর প্রায় অশ্রুত হ'য়ে এলো: এমন-এক মৃত্যুঘর্ঘরে তা মিলিয়ে যাচ্ছে যে সেটা শোনা যায় না, শুধু অনুভব করা যায়। অতঃপর আর্চবিশপের প্রাসাদের কোণায় স্তব্ধতা এসে হাজির হ'লো। স্তব্ধতাকে যে-শহর বিশ্বাস করে না, সেই শহরে নেমে এলো এক অতিপ্রলম্বিত স্তব্ধতা—গোড়ায় যাকে ভাঙবার সাহস পেতো শুধু কোনো সদ্যোজাত শিশুই, তার অজ্ঞানতার কাংরানিতে। তারপর জীবনকে আবার ফেরৎ পথে শহর নিয়ে এলো তার অভ্যস্ত শোরগোলে: ফিরিওলার হাঁক, রাস্তার হৈ-হল্লা, নমস্কার বিদায়, গুজব-জনরব, রোদে কাপড় শুকোতে দেয়ার সময় গেয়ে-ওঠা গান। এই সেই মুহূর্ত যখন তি নোয়েল অবশেষে তার ঝোলায় ঢোকাতে পেরেছে কিছু-কিছু জিনিশ, আর একের পর এক ঢক ক'রে গেলা পাঁচ-পাঁচ

গেলাশ ব্র্যাণ্ডির বদলে এক মাতাল খালাশির কাছ থেকে বাগিয়েছে কিছু টাকা। চাঁদের আলোয় টলতে-টলতে সে বেরিয়ে পড়লো তার বাড়ির উদ্দেশে, মাথায় ঝাপশা ভাবে গুনগুন করছে একটা গান, অতীতে শহর থেকে বাড়ি ফেরার পথে যেটা সে গাইতো। এমন একটা গান যেটা কোনো রাজার প্রতি খিস্তি আর খেউড় দিয়ে ভরপুর। আর সেটাই জরুরি : **কোনো রাজার প্রতি**। আর এই-ভাবে, অঁরি ক্রিস্তফ, তাঁর মুকুট, তাঁর বংশধর—সকলের সম্বন্ধে যত খিস্তি যত খেউড় সে ভাবতে পারে সব গলগল ক'রে বার ক'রে দিলো নিজের ভেতর থেকে—আর তাইতে ফেরার পথটা তি নোয়েলের কাছে এতই ছোটো লাগলো যে সে যখন হাত-পা ছড়িয়ে গড়িয়ে পড়লো তার তৃণশয্যায়, সে এমনকী নিজেকেই বারে-বারে জিগেশ করলো, সত্যি সে গিয়েছিলো তো এল্ কাবোতে!

পনেরোই আগস্টের কালপঞ্জি

Quasi palma exaltata sum in Cades, et quasi plantatio rosae in Jericho. Quasi oliva speciosa in Campis, et quasi platanus exaltata sum juxta aquam in plateis. Sicut cinnamonum et balsamum aromatizans odorem dedi : quasi myrrha electa dedi suavitatem odoris.

হুয়ান দে দিওস গন্‌সালেসের উদাত্তস্বরের উত্থান-পতনের অব্যর্থ অভিঘাতে সম্মোহন জাগানো লাতিনের এককোঁটাও না-বুঝে রানী মারিয়া-লুইসা সেই সকালটিতে অনুভব করেছিলেন এক রহস্যময় একতানের স্বর—ধূপের গন্ধ, কাছের উঠোনের নারঙ্গ গাছগুলোর সৌরভ, আর দিনের সেই স্তবগানের কতগুলো কথা যার মধ্যে এইসব সুবাসেরই নাম, সান্‌ সুসির ওষধিবিক্রেতার দোকানের চিনেমাটির বোয়মগুলোর গায়ে তো লেখা থাকে এ-সবেরই নাম। অঁরি ক্রিস্তফ, পক্ষান্তরে, ঠিকমতো মন দিয়ে উপাসনাকে অনুসরণ করতে

পারেননি, তাঁর বুকের মধ্যে এমন-একটা উৎকণ্ঠা চেপে বসেছিলো, তার কোনো কারণই তিনি বুঝতে পারছিলেন না। লিনোনাদ-এর গির্জের সুস্মশির ধূসর মর্মরশিলা ঠাণ্ডার এমন-এক উপভোগ্য আমেজ তৈরি ক'রে দেয় যে কেউ বোতামআঁটা সোয়ালোপুচ্ছ কোট আর পদকভূষণের ওজনের তলায় কম ঘামে—সেইজন্যই সকলের পরামর্শের বিরুদ্ধেই ক্রিস্তফ হুকুম করেছিলেন যাতে এই গির্জেতেই মাতা মারিয়ার স্বর্গলাভের ভোজসভার স্তবগান গাওয়া হয়। কিন্তু এখন রাজার মনে হচ্ছিলো তাঁকে যেন প্রতিকূল, বিরূপ আবহাওয়া ঘিরে আছে। তাঁর আবির্ভাবের সময় যে-জনসমাবেশ তাঁকে সমস্বরে বিপুলভাবে স্বাগত জানিয়েছিলো, এখন তারাই রুষ্ট ও অশুভ অভিপ্রায়ে মুখ ভার ক'রে আছে—এই শস্যসুফলা উর্বরা দেশে যে কোনো ফসল ফলেনি তার কারণ সব লোককে কাজ করতে হয়েছে নগরদুর্গে, আর এই কথা কেউই ভোলেনি। কোনো দূর বাড়িতে—তাঁর সন্দেহ—হয়তো তাঁর কোনো মূর্তি বানিয়ে অজস্র ছুঁচ দিয়ে বেঁধানো হয়েছে অথবা হৃৎপিণ্ডে ছোরা বসিয়ে তাঁকে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে পা ওপরে মুণ্ডু তলায়। দূর থেকে সময়-সময় ভেসে আসছে ঢাকের আওয়াজ, নিশ্চয়ই এই ধ্বনি তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করছে না। কিন্তু, এই যে, উৎসর্গের গান শুরু হ'য়ে যাচ্ছে :

Assumpta est Maria in caelum ; gaudent Angeli,

collaudantes benedicunt Dominum, alleluia !

হঠাৎ হুয়ান দে দিওস গন্‌সালেস রাজ আসনগুলোর দিকে কুঁকড়ে পিছোতে লাগলো, আর তিনটে মর্মরসোপানের গায়ে ধাক্কা খেয়ে কেমন জেব্রাজোব্রা-ভাবে আছাড় খেলো। রানীর জপমালা প'ড়ে গেলো তাঁর আঙুলের ফাঁক দিয়ে। রাজার হাত পৌঁছে গেলো তাঁর তলোয়ারের বাঁটে। বেদীর সামনে, মুখ ক'রে, উঠে দাঁড়িয়েছেন আরেকজন যাজক—যেন হাওয়া থেকেই ভোজবাজির মতো তাঁর উদয় ঘটেছে, তাঁর কাঁধ আর বাহু এখনও অসম্পূর্ণভাবে গড়া। আর যখন তাঁর মুখ নিচ্ছে পরিণাহ আর অভিব্যক্তি, তাঁর ওষ্ঠাধরবিহীন দন্তহীন মুখ—এমন কালো যেন কোনো ইঁদুরের গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো বাজের মতো গমগমে স্বর, যেটা গির্জের ভেতরটা ভরিয়ে দিলো কোনো অর্গানের শব্দতরঙ্গকম্পে রাঙানো কাচের জানলাগুলো তাদের শিশের কাঠামোয় কাঁপিয়ে দিয়ে যেন অর্গানটার সব চাবি একসঙ্গে বাজানো হয়েছে :

Absolve Domine, animas omnium fidelium defunctorum ab

omni vinculo delictorum···

তাঁকে কেমন বোবা ক'রে দিয়ে, কোর্নেহো ব্রেইয়ের নামটা আঁর ক্রিস্তকের গলায় আটকে গেলো। কারণ, এ যে সেই কারারুদ্ধ আর্চবিশপই, যাঁর মৃত্যু আর অবক্ষয় সকলেরই সুপরিজ্ঞাত, অথচ যিনি এখন দাঁড়িয়ে আছেন উঁচু বেদীর সামনে তাঁর আনুষ্ঠানিক পোশাকে, উচ্চারণ করছেন Dies irae। কোনো নাকাড়ার বজ্রধ্বনির মতো যখন Coget omnes ante thronus কথাগুলো উঠলো, হুয়ান দে দিওস গন্‌সালেস গোঙাতে-গোঙাতে উপুড় হ'য়ে পড়লো রানীর পায়ের কাছে। আঁরি ক্রিস্তফ—তাঁর চোখ দুটি মাথা থেকে বেরিয়ে এসেছে—সহ্য করলেন Rey tremende majestatis অব্দি। সেই মুহূর্তে একটা বাজ—যা শুধু তাঁরই কর্ণকুহর বধির ক'রে দিলো—আঘাত হানলো গির্জের মিনারে, সব ঘণ্টাকে একযোগে কাঁপিয়ে দিয়ে। উপাসকদের প্রধান গায়ক, ধুনুচিবাহক, সমস্বরগায়করা দাঁড়িয়ে উঠলো। খাঁশে নেমে এলো প্রচারবেদী। রাজা প'ড়ে রইলেন মেঝেয়, অভিভূত, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, ছাদের কড়িবরগার দিকে তাঁর বিস্ফারিত চোখ নিবদ্ধ। এবার, এক প্রচণ্ড লাফ দিয়ে, ছায়ামূর্তি গিয়ে বসেছেন ও-রকম একটা কড়ির ওপর, ঠিক আঁরি ক্রিস্তকের দৃষ্টিরেখায়, ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর দুই পা আর দুই বাহু যেন তিনি ভালো ক'রে দেখাতে চান তাঁর রক্তরাঙা কিংখাব। রাজার কানের মধ্যে ক্রমশ গড়িয়ে আসছে একটা ছন্দ, যা হয়তো তাঁর নিজেরই ধমনীর স্পন্দন, অথবা পাহাড়ের ঐ ঢাকগুলোর গুমগুম। তাঁর অফিসারদের বাহুতে ধরাধরি ক'রে বেরিয়ে গিয়ে রাজা বিড়বিড় ক'রে অভিশাপ দিচ্ছেন, লিমোনাদ-এর সব অধিবাসীকে শাসাচ্ছেন, ভয় দেখাচ্ছেন, যদি কোথাও মৃত্যুর কোনো মোরগ ডাকে। যখন মারিয়া-লুইসা ও রাজকন্যারা তাঁকে প্রাথমিক শুশ্রূষা করছেন, সমস্ত গ্রামবাসীরা সব মোরগ-মুরগি ঝুড়িতে চাপাতে শুরু ক'রে দিলো আর তারপর তাদের নামিয়ে দিতে লাগলো গভীর সব কূপের অন্ধকারে, যাতে তাদের সব ক্যাচর ম্যাচর বা অবাধ্যতা ভুলে থাকা যায়। দুমদাম লাঠির বাড়ি আঁৎকে-ওঠা গাধার পালকে ছোটালো পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। ঘোড়াগুলোকে পরিয়ে দেয়া হ'লো মুখঢাকা, নইলে কেউ যদি ভুল মানে ক'রে বসে তাদের হ্রেষার!

আর সেদিনই অপরাহ্ণে, ছটি জোরকদমে ছোটা ঘোড়ায় টানা রাজশকট এসে দাঁড়ালো সান্ সুসির সম্মানে গড়া এস্‌প্লানাদেয়। জামার বুক খোলা, রাজাকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে যাওয়া হ'লো তাঁর শোবার ঘরে। একটা স্কেলের বস্তার মতো ধপ ক'রে পড়লেন তিনি বিছানায়। তাঁর চোখ—

কনীনিকার চাইতে অচ্ছোদপটলই বেশি—উদ্‌ঘাটিত করে দিলো এমন-এক ক্ষিপ্ত বিক্ষোভ যেটা হাত-পা নাড়তে না-পারায় এলো তাঁর আত্মার গভীরতম দেশ থেকে। তাঁর অসাড় শরীরে ব্র্যাণ্ডি মালিশ করতে লাগলো চিকিৎসকেরা, সঙ্গে বারুদ আর লঙ্কার গুঁড়ো মেশানো মলম। রাজপ্রাসাদ জুড়ে ওষুধের গন্ধ, রস আর আরক, নুন, মলম, অফিসার আর সভাসদে ঠাশাঠাশি বসবার ঘরগুলোয় উষ্ণ আবহাওয়ায় ঝিম ধরিয়ে দিলো। রাজকন্যা আতেনা আর আমেতিস্তা তাঁদের উত্তরমার্কিন আয়ার বুকে মুখ গুঁজে কাঁদছেন। উপকুঠুরিতে, রানী—সহবতের দিকে খোড়াই নজর—কাঠকয়লার উনুনে একটা পাতিলে কী-একটা শেকড় সেদ্ধ হচ্ছে, তার সামনে উবু হ'য়ে ব'সে আছেন, উনুনের শিখা প্রতিফলিত হচ্ছে পারীতে তৈরি জরির কাজ করা চাঁদোয়ায়, যাতে দেখা যাচ্ছে ভালকানের নেহাইয়ের পাশে ভীনাস, দেয়ালশোভিত করা চাঁদোয়ার কারুকাজের রঙে তা এক অদ্ভুত বাস্তবতা ছিটিয়ে দিয়েছে। নিচু আঁচের উনুনটার আঁচ চড়াবার জন্য, রানী একটা পাখা দিতে হাঁকলেন। বড্ড তাড়াতাড়ি ঘিরে ফেলছে ছায়াদের প্রদোষ—কেমন একটা অলক্ষুণে ভাব তাতে। পাহাড়ে-পাহাড়ে সত্যি-সত্যি ঢাকের গুমগুম উঠছে কি না জানা অসম্ভব। কিন্তু মাঝে-মাঝে, দূর শিখর থেকে আসে একটা ছন্দের রেশ, সিংহাসনঘরে যে মেয়েগুলো 'আভে মারিয়া' গাইছে তার সুরের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিলে যায় সেটা, আর একাধিক বুকেই জাগিয়ে দিয়ে যায় অস্বীকৃত অনুরণন।

৬

Ultima Ratio Regum

[রাজাদের চূড়ান্ত ভিত্তি]

পরের রোববার সূর্যাস্তের সময় আঁরি ক্রিস্তফের মনে হ'লো যে তাঁর হাঁটু আর হাত —যদিও এখনও অসাড়—হয়তো ইচ্ছাশক্তির কোনো বিপুল তাড়নায় সাড়া দেবে। কেমন বিদঘুটেভাবে বিছানায় পাশ ফিরে, চিৎ হ'য়ে শুয়ে-শুয়েই তিনি তাঁর পা নিয়ে এলেন পাশে, যেন কোমরের ওপর থেকে তাঁর পক্ষাঘাত হয়েছে।

তাঁর পরিচারক সলিমান তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলে। রাজা তারপর একটা কলের পুতুলের মতো আস্তে হেঁটে যেতে পারলেন জানলায়। ভৃত্যের কথা শুনে, রানী আর রাজকন্যারা পা টিপে-টিপে ঘরে ঢুকেছিলেন, তাঁরা এসে দাঁড়িয়েছিলেন ঘরের যেখানটায় মহামান্য রাজার এক ঘোড়ায় চড়া মূর্তি ছিলো, তার তলায়। তাঁরা জানতেন যে ও-ল-কাতে বড্ড বেশি মদ টানছে লোকে। রাস্তার মোড়ে-মোড়ে মস্ত সব ডেকচি থেকে বিক্রি হচ্ছে সুরুয়া আর ভাপে-শুকনো শুওরের মাংস, ঘেমে অস্থির বাবুর্চিরা টেবিল চাপড়াচ্ছে চামচেয় আর হাতায়। উৎফুল্ল হৈ-হৈ দর্শকদের সারির মধ্যে নাচের তালে-তালে রুমাল উড়ছে।

অপরাহ্নের বাতাসকে গভীরভাবে বুকে টেনে নিলেন রাজা, আর যে-একটা ভার তাঁর বুকের মধ্যে চেপে বসেছিলো সেটা আস্তে-আস্তে স'রে যেতে শুরু করলো। পাহাড়ের ঢালের ওপর গুঁড়ি মেরে নামছে রাত, গাছপালা আর দুর্বোধ্য জড়াজড়ি করা বস্তুগুলোর রূপরেখা ঝাপশা হ'য়ে আসছে। তখনি হঠাৎ অঁরি ক্রিস্তফের চোখে পড়লো রাজবাড়ির বাজনদারেরা তাদের বাজনা সঙ্গে নিয়ে প্রবেশচত্বরটা পেরিয়ে যাচ্ছে। সবাই কেমন খুলে দেখাচ্ছে তাদের পেশাদার অঙ্গবিকৃত। হার্পবাদক ঝুঁকে আছে, যেন তার হার্পের ভারে নুয়ে-পড়া এক কুঁজো ; আরেকজন সরলরেখার মতো রোগা, কিন্তু তাকে তার গলা থেকে ঝোলা তম্বুরাটার জন্য দেখাচ্ছে গর্ভবতী ; আরেকজন আঁকড়ে ধ'রে আছে এক হেলিকন। আর তাদের পেছন-পেছন চলেছে এক বামন, এক বিশাল চৈনিক শিঙার ভারে হারিয়ে যাওয়া, প্রতি পদক্ষেপে সেটার ছোটো ঘুন্টিগুলো ঝুনঝুন ক'রে বাজছে। তাঁর বাজনদারেরা যে এই সময়ে হঠাৎ বেরিয়ে যাচ্ছে—যেন তারা কোনো একটা বিশাল নিঃসঙ্গ সাইবা গাছের তলায় বাজনার আসর বসাবে এখন,—এটা দেখে রাজার বিস্ময়ে বাধা পড়লো আটটি সামরিক কাড়ার ঝাপটায়। এটা প্রহরীবদলের সময়। মহামান্য রাজা তাঁর পদাতিকদের দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলেন : তিনি যে কঠোর শৃঙ্খলায় তাদের অভ্যস্ত করেছেন, তাঁর এই অসুখের ফাঁকে তাতে কোনো ঢিলে পড়েনি তো! কিন্তু হঠাৎ রাজার হাত একটা ক্রুদ্ধ বিস্ময়ের ভঙ্গি ক'রে উঠলো। সুরে না-বাঁধা ঢাকগুলো সুনির্দিষ্ট আহ্বানটা বাজাচ্ছে না, বরং বাজাচ্ছে ছাঁটাই-করা একটা তিন-তালের সুর, ঢাকের কাঠি দিয়ে নয়, বরং চামড়ার ওপর হাত চাপড়ে।

'ওরা মান্দুকুমান বাজাচ্ছে,' মেঝেয় তাঁর দ্বিচূড় টুপিটা ছুঁড়ে ফেলে অঁরি ক্রিস্তফ চেঁচিয়ে উঠলেন।

সেই মুহূর্তে প্রহরীরা সার ভেঙে বেরিয়ে এলো, সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলভাবে তারা পেরিয়ে গেলো এসপ্লানাদে। অফিসাররা দৌড়ুচ্ছে খোলা তলোয়ার হাতে। ছাউনির জানলাগুলো থেকে ঝপঝপ ক'রে লাফিয়ে নামছে লোক, দলে-দলে, কুর্তা খোলা, পাঁৎলুনের ডগা জুতোর ওপর গোটানো। আকাশের দিকে ফাঁকা আওয়াজ করা হ'লো। যুবরাজের বাহিনীর ঝাণ্ডার মুকুট আর শিশুমারের ওপর পৎপৎ ক'রে এলোপাথাড়ি উড়লো একটা রঙিন নিশেন। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই একদল হালকা অস্ত্রে সজ্জিত অশ্বারোহী জোর কদমে তুলকালাম ছুটে এলো প্রাসাদ থেকে, পেছনে এলো জিন-লাগামে বোঝাই একটি পরিবহণশকটের খচ্চরেরা। হাত দিয়ে চাপড়ে বাজানো সামরিক কাড়ার আওয়াজ ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই পুরো ব্যাপারটা উর্দি ও শৃঙ্খলার একটা সামগ্রিক উচ্ছেদ। ম্যালেরিয়ায় কাতর এক সৈন্য, সেনাবাহিনীর বিক্ষোভে চমকে গিয়ে, তার পালক-গোঁজা টুপির চিবুকবন্ধ গালে লাগাতে-লাগাতে, একটা চাদরে গা মুড়ে হাসপাতালের রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। অঁরি ক্রিস্তফ যেখানে দাঁড়িয়ে সেই জানলার তলা দিয়ে যেতে-যেতে সে একটা অশ্লীল ভঙ্গি করলো, তারপরেই ছুট লাগালো যত জোরে পারে। তারপরে নেমে এলো সন্ধেবেলার দমকা স্তব্ধতা, কোথায় দূর-এক ময়ূরের কেকাধ্বনিতে সেটা অকস্মাৎ ছিঁড়ে গেলো। রাজা তাঁর মুখ ফেরালেন। ঘরের মধ্যেকার জমাট রাত্রির মধ্যে রানী মারিয়া-লুইসা আর রাজকুমারী আতেনা আর আমেতিস্তা তখন কাঁদতে শুরু ক'রে দিয়েছেন। এতক্ষণে বোঝা গেলো কেন লোকে সেদিন অমন হল্লা ক'রে ও-ল-কা-তে মদ টানছিলো।

রেলিং, পর্দার কোণা, চেয়ারের পিঠ ধ'রে-ধ'রে ভর সামলে, অঁরি ক্রিস্তফ প্রাসাদের মধ্যে এগিয়ে চললেন। সভাসদ ও পরিষদ, অনুচর ও প্রহরীদের অনুপস্থিতি ঘরে-বারান্দায় এক বুকচাপা শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। দেয়ালগুলোকে দেখাচ্ছে যেন আরো উঁচু, চৌকো-চৌকো টালিগুলোকে আরো চওড়া। দর্পনভবন শুধু ফিরে দেখালো রাজারই প্রতিবিম্ব, এমনকী দূর-দূর মুকুরের সর্বশেষ কোণাতেও। আর তারপর, ছাতের কড়িকাঠ থেকে এলো ঝিঁঝিপোকার গুঞ্জন, তাদের লাফিয়ে-লাফিয়ে এগিয়ে চলা—অথচ আশ্চর্য, আগে কিন্তু কখনো তাদের শোনা যায়নি, আর এখন তারা, তাদের বিরতি ও বিশ্রাম সমেত, স্তব্ধতাকে যেন গভীরতার পঞ্চমে পৌঁছে দিচ্ছে। শামাদানগুলোয় আস্তে গ'লে যাচ্ছে মোমবাতি। একটা পতঙ্গ পরামর্শঘরের মধ্যে অনবরত পাক খেয়ে-খেয়ে ঘুরে যাচ্ছে। একটা সোনার কাঠামোয় নিজেকে ছুঁড়ে ফেলবার পর একটা

শ্যামাপোকা থুবড়ে প'ড়ে গেলো মেঝেয়, প্রথমে এখানে, তারপর ওখানে, আর উড়ন্ত একটা আরশোলার সন্দেহাতীত ফরফর উঠলো তারপর। তাঁর চরম নিঃসঙ্গতার বোধটাকে আরো বাড়িয়ে দিয়ে বিশাল আপ্যায়নভবন, তার দুই দেয়াল জোড়া গবাক্ষ, ফিরিয়ে দিলে অঁরি ক্রিস্তফের গোড়ালির প্রতিধ্বনি। ভৃত্যদের একটি দরজা দিয়ে তিনি নেমে এলেন রান্নাঘরে; না, শিককাবাবের শিকগুলোয় মাংস পরানো নেই, আর শূলগুলোর তলায় আগুন নিভু-নিভু হ'য়ে এসেছে। মাংস কাটার টেবিলের পাশে মেঝেয় প'ড়ে আছে কতগুলো মদের বোতল। আগে যেখানে ধোঁয়ানলের সরদল থেকে ঝুলতো রঙনের কোয়া, সারি-সারি দিওন-দিওন ব্যাঙের ছাতা ঝোলানো সুতো, ভাপে শুকোনো শুওরের মাংস—সব নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রাসাদ পরিত্যক্ত, নিশ্চাঁদ রাতের কাছে ফেলে যাওয়া। এ হচ্ছে অবাধ লুঠের সম্পত্তি—যে যা চায়, তা-ই পাবে, কারণ এমনকী শিকারি কুকুরগুলোও আর নেই। অঁরি ক্রিস্তফ আবার তাঁর নিজের তলায় ফিরে এলেন। শাদা সিঁড়িগুলো কেমন অলুক্ষুণে ও শীতলভাবে উঠে গেছে, শামাদানের মিটমিটে আলোয় কেমন করুণ আর আর্ত দেখাচ্ছে তাদের। গোল ঘরের উঁচু গবাক্ষ দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছিলো একটা বাদুড়, কড়িকাঠের ক্যাকাশে সোনারঙের তলায় কেমন জবড়জংভাবে ঘুরে-ঘুরে উড়ছে সে। রাজা রেলিঙের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন, থুঁজলেন মর্মরশিলার নিরেট সমর্থন।

নিচে যেখানে তাঁর গৌরবসোপানের শেষ ধাপে ব'সে ছিলো পাঁচটি তরুণ নিগ্রো, তারা তাদের উদ্বিগ্ন কষ্ট-কষ্ট মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকালো। সেই মুহূর্তে অঁরি ক্রিস্তফ অনুভব করলেন তাদের জন্য ভালোবাসার উৎসারণে তাঁর বুক ভ'রে যাচ্ছে। এই পাঁচজন রাজার দেহরক্ষী, পরিচারক ডেলিভারেন্স, ভালেন্তিন, লা কুরোন, জন, আর বির্য-এমে। সবাই এরা আফ্রিকার, এদের মুক্তি দেবার জন্য রাজা তাদের কিনেছিলেন এক দাসব্যবসায়ীর কাছ থেকে, তারপর তাঁর বালকভৃত্য হিশেবে এদের শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়েছেন। হাইতির স্বাধীনতার প্রথম নেতাদের আফ্রিকাঘটিত মরমিয়াবাদ থেকে সবসময়েই নিজেকে উদাসীন সরিয়ে রেখেছিলেন অঁরি ক্রিস্তফ, চেষ্টা করেছিলেন তাঁর রাজসভাকে একটা পুরোপুরি ইওরোপীয় চেহারা দিতে। কিন্তু যখন এখন নিজেকে আবিষ্কার করলেন একাকী, সঙ্গহীন, তাঁর ডিউক, ব্যারন, সেনাপতি আর সচিবদের দ্বারা ফেঁসে-যাওয়া, শুধু যে-ক-জন ব'য়ে গেছে এখনও তাঁর বিশ্বস্ত ও অনুগত, সে এই পাঁচজন আফ্রিকার ছেলে, পাঁচজন কঙ্গো, ফুলাহ্, কিংবা মান্দিঙ্গ কিশোর, অপেক্ষা

ক'রে আছে বিশ্বস্ত কুকুরের মতো, তাদের পাছা বসানো সিঁড়ির ধাপের হিম মর্মরশিলায়; তাঁর রাজত্বের চূড়ান্ত যা ভিত্তি তা আর কখনো কামানের মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে না। অঁরি ক্রিস্তফ, একটু থেমে, তাদের দিকে তাকালেন, তাদের উদ্দেশ ক'রে স্নেহের একটা ভঙ্গি করলেন, তারা যার উত্তর দিলো করুণভাবে মাথা নুইয়ে, তারপর রাজা চ'লে গেলেন সিংহাসন কক্ষে।

যে-চাঁদোয়াটায় তাঁর রাজভূষণ আঁকা, তার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। মুকুটপরা দুই সিংহ তুলে ধরেছে এক বর্শা, যার গায়ে আঁকা মুকুট-শোভিত এক ফিনিক্স পাখি, আর সেইসঙ্গে অলংকৃত হরফে লেখা: 'আপন ভস্মেরই মাঝে আমার উত্থান'। একটা সংকেত নিশানের গায়ে লেখা ধ্বজার মূলমন্ত্র: 'ঈশ্বরই আমার ন্যায় ও আমার অসি'। মখমলের আঁচলের তলায় লুকিয়ে রাখা একটা ভারি পেটিকা খুললেন অঁরি ক্রিস্তফ। এক মুঠো রৌপ্যমুদ্রা তুলে নিলেন তিনি হাতে, তাতে তাঁরই নামের মোহর আঁকা। তারপর তিনি ঝনঝন ক'রে মেঝেয় ছুড়লেন ভিন্ন-ভিন্ন ওজনের কতগুলো স্বর্ণমুকুট—একটার পর একটা। একটা গড়িয়ে গেলো দরজায়, তারপর দুমদুম ক'রে গড়িয়ে গেলো সিঁড়ি বেয়ে, সারা প্রাসাদ জুড়ে তার প্রতিধ্বনি উঠলো। রাজা উঠে বসলেন তাঁর সিংহাসনে, তাঁর চোখ প'ড়ে রইলো শামাদানে নিভু-নিভু একটা মোমবাতির ওপর। যান্ত্রিকভাবে তিনি আবৃত্তি ক'রে গেলেন তাঁর সরকারের সব ঘোষণার ভণিতাটুকু: 'হাইতির রাজা, তোরতু আর বোসভে দ্বীপ দুটি ও সমীপবর্তী অঞ্চলের শাসনকর্তা, অত্যাচারের ধ্বংসকর্তা, হাইতির অধিবাসীদের পুনর্জনক ও পালক, তার নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলির সৃষ্টিকর্তা, নতুন জগতের প্রথম অভিষিক্ত নৃপতি, আস্থা ও বিশ্বাসের রক্ষক, সাঁ অঁরি নামক রাজকীয় ও সামরিক ভূষণের প্রতিষ্ঠাতা, অঁরি ক্রিস্তফ, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও রাজ্যের সাংবিধানিক আইন বলে, উপস্থিত ও অনাগত সকলের উদ্দেশে জানায়: স্বাগতম্!'…আর অকস্মাৎ ঠিক তক্ষুনি অঁরি ক্রিস্তফের মনের মধ্যে উপস্থিত হ'লো লা ফেরিয়ে-র নগরদুর্গটির কথা—মেঘেরও ওপরে যে-কেল্লাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই রাত্রি যেন নিবিড় হ'য়ে গেলো ঢাকের গুমগুম শব্দে। একে অন্যকে ডাক পাঠিয়ে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে সাড়া দিয়ে, উপকূল থেকে ছিটকে উঠে, গুহার মুখ ছুটে বেরিয়ে এসে, গাছের তলা দিয়ে দৌড় দিয়ে, সব নয়ানজুলি আর নদীর খাতে গুমগুম করতে লাগলো ঢাক, রাদা আর কঙ্গো আর বুকমানের ঢাক, মহান সম্মিলনের ঢাক, ভুডুর সব ঢাক। এক সুবিশাল

সর্ববিসারী ঢাকের আওয়াজ এগিয়ে আসছে সান্ সুসির দিকে, বৃত্তটাকে ক্রমশ আঁটো ক'রে ছোটো ক'রে। যেন বজ্রের একটা দিগন্ত কাছে এগিয়ে আসছে। এমন-একটা তুফান যার চোখ এখন সিংহাসন – চামরবাহক অথবা নকিববিহীন সিংহাসন। রাজা তাঁর শোবার ঘরে তাঁর জানলায় ফিরে এলেন। আগুন ধরানো হচ্ছে তাঁর ক্ষেতখামারে, দুধের গোশালায়, আঁখের ক্ষেতে। এখন আগুন দৌড়ের বাজিতে হারিয়ে দিয়েছে ঢাককে, লাফিয়ে-লাফিয়ে ছুটে আসছে বাড়ি থেকে বাড়িতে, ক্ষেত থেকে ক্ষেতে। গোলঘর থেকে ভুউশ ক'রে উঠে এলো লেলিহান এক শিখা, খড়ের গাদায় ছিটিয়ে দিলো লাল-কালো জলন্ত ফুলকি। উত্তুরে হাওয়া তুলে নিয়ে এলো গমের ক্ষেতের জলন্ত ছড়াগুলো, তাদের নিয়ে এলো কাছে, আরো কাছে, আগুনজলা ছাই ঝ'রে পড়ছে প্রাসাদের বারান্দা থেকে বারান্দায়।

অঁরি ক্রিস্তফের ভাবনা নগরদুর্গের কাছে ফিরে গেলো। রাজাদের চূড়ান্ত ভিত্তি। কিন্তু, বিশ্বে-অপ্রতিম, অদ্বিতীয়, সেই সুরক্ষিত শক্তির আশ্রয় কোনো একজন লোকের পক্ষে বড্ড বড়ো, বিষম বিশাল, আর রাজা কক্‌খনো ভাবেননি এমন-একটা দিন হয়তো আসবে যেদিন তিনি নিজেকে আবিষ্কার করবেন সম্পূর্ণ একা। ঐ মোটা দেয়ালগুলো যে-ষাঁড়ের রক্ত পান করেছে তা শাদা আদমিদের অস্ত্রশস্ত্রের বিরুদ্ধে এক অব্যর্থ, অভ্রান্ত জাদু। কিন্তু এই রক্ত তো কোনোদিনও লেলিয়ে দেয়া হয়নি নিগ্রোদের বিরুদ্ধে যাদের চীৎকার ও হট্টগোল এখন কাছে, আরো-কাছে এসে পড়েছে, মন্ত্র প'ড়ে ডাকছে সেই শক্তিদের যাঁদের কাছে এই রক্ত আহুতি দেয়া হয়েছিলো। অঁরি ক্রিস্তফ, সংস্কারক, চেয়েছিলেন ভূডুকে অস্বীকার করতে, চাবুকের শপাং দিয়ে ছাঁচ গ'ড়ে দিতে চেয়েছিলেন ক্যাথলিক ভদ্রলোকের। এখন তিনি টের পেলেন যে তাঁর আসল দুশমন হ'লো তাঁর সব চাবি সমেত সান্ পেদ্রো, সান্ ফ্রানসিস্‌কোর কাপ্লচিন, তাঁর নীল আলখাল্লায় ঢাকা কৃষ্ণামুখাশ্রি সম্বল কুমারীমাতা সমেত কালোমুখ সান্ বেনিতো, এবং সেই খ্রীস্টিয় যাজকেরা যাঁদের সুসমাচারের পুথি তিনি চুম্বন করতে হুকুম করেছিলেন প্রতিবার আনুগত্যের শপথ নেবার সময়। আর, অবশেষে, সেই তাঁরাও তাঁর শত্রু— সেই শহীদেরা, যাঁদের উদ্দেশে তিনি তেরোটি স্বর্ণমুদ্রাভরা মোম জ্বালাতে হুকুম করেছিলেন। গির্জের শাদা গম্বুজটাকে এক ক্রুদ্ধ কটাক্ষে বিদ্যুৎঝলশিত ক'রে গির্জে ভ'রে গেলো সেইসব মূর্তিতে যারা এখন যোগ দিয়েছে দুশমনদের সঙ্গে, রাজা হেঁকে বললেন বসন আর সুবাস পালটাতে। রাজকুমারীদের ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে যেতে আদেশ করলেন তিনি, প'রে নিলেন

তাঁর সবচেয়ে জমকালো ও দামি পোশাকি বেশ। তিনি পরলেন তাঁর দু-রঙা বিশাল কোমরবন্ধ ; যা ছিলো তাঁর অভিষেকের চিহ্নপ্রতীক, তাকে বাঁধলেন তাঁর তলোয়ারের বাঁটের ওপর। ঢাকের আওয়াজ এখন এতটাই কাছে যে মনে হচ্ছে তারা যেন এখানেই দপদপ করছে, প্রধান ফটকের রেলিঙের আড়ালে, ভিত্তিমর্মরের বিশাল সোপানশ্রেণীর পায়ের কাছে। সেই মুহূর্তে আগুন আলো ক'রে দিলো প্রাসাদের সব আয়না, বেলোয়ারি সব পানপাত্র, বাতির, গেলাশের ফটিক, দেয়াল থেকে বেরিয়ে আসা টেবিলের গায়ের শুক্তির কারুকাজ—শিখারা সবখানে, আর এটা বোঝা অসম্ভব কোন্‌টাই বা শিখা, আর কোন্‌টাই বা তার প্রতিফলন। সান্ সুসির সব আয়না একসঙ্গে জ্ব'লে উঠেছে লেলিহান। আস্ত ইমারতটা এই হিমশীতল আগুনে উধাও হ'য়ে গেলো, যে-আগুন ছড়িয়ে গেলো রাতের মধ্যে, সব ক-টা দেয়ালকে ক'রে তুললো আঁকাবাঁকা বিসর্পিল শিখার তরলিত আধার।

গুলির আওয়াজটা প্রায় শোনাই যায়নি, যেহেতু ঢাকের আওয়াজ ছিলো এত কাছে। তাঁর হা-করা কপাল ছোঁবে ব'লে, অঁরি ক্রিস্তফের হাত খুলে গেলো, খ'শে পড়লো পিস্তলটা, সব ভূষণ-পদকের মধ্যে মুখ থুবড়ে প'ড়ে যাবার আগটায়, তাঁর শরীর ঋজু দাঁড়িয়ে রইলো একঝলক, সটান, যেন একটা পা ফেলবেন সামনে। বালকভৃত্যেরা এসে দাঁড়ালো ঘরের চৌকাঠে। রাজা মরতে চলেছেন, নিজের রক্তে মাখামাখি।

৭

'দ্বার সঙ্কীর্ণ ও পথ দুর্গম'

পাহাড়ের দিকে মুখ-করা, পেছনের একটা দরজা দিয়ে কাফ্রি বালকভৃত্যেরা বেরিয়ে এলো ; যত জোরে পারে, ছুটছে তারা, কাঁধে ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে কাটারি দিয়ে ছিমছাম কাটা ডাল, যা থেকে ঝুলছে দোলখাটিয়া, আর জাল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে রাজার জুতোর নাল। তাদের পেছনে, পেছনের দিকে তাকিয়ে, রাজার পেয়েনসিয়ানা গাছের ডালপালায় শেকড়ে হোঁচট খেতে-খেতে আসছেন

রাজকুমারীরা, আতেনা আর আমেতিস্তা, তাঁরা তাঁদের মিজেদের শৌখিন জুতোর বদলে পরেছেন দাসীদের চপ্পল ; আর রানী—তিনি ছুঁড়ে ফেলেছেন তাঁর চপ্পল যখন রাস্তার পাথর হ্যাঁচকা ছিনিয়ে নিয়ে গেলো একটা গোড়ালির শুখতলি। রাজার সাজভৃত্য সলিমান—এককালে সে ছিলো পাউলিনা বোনাপার্তের অঙ্গসংবাহক—আসছে সকলের পেছনে, কাঁধ থেকে ঝুলছে বন্দুক, আর হাতে কাটারি। যত তারা পাহাড়ের তরুগুল্মনিবিড় নিশীথিনীর গভীরে ঝাঁপ খেলো, নিচের আগুনকে দেখালো আরো ঘন, প্রকাণ্ড, শিখায়-শিখায় নিরেট জমাট, আটা, যদিও প্রাসাদের এস্প্লানাদেতে পৌছুবার আগেই সেটা নিভতে শুরু ক'রে দিয়েছে। মিলো-র দিকে অবশ্য খড়ের গাদায় আগুন ধরেছে। যন্ত্রণায় হুমড়ে-যাওয়া বাচ্চাদের তীক্ষ্ণ আর্তনাদের মতো সুদূর হ্রেষাধ্বনি ভেসে আসছে, আগুন-জলা ফিনকিছোটা কাঠকুটো ভেঙে যাওয়ার এক বিরাট বিস্ফোরণের মধ্যে পুরো আস্তাবলটাই ভেঙে গিয়েছে আর উগরে দিয়েছে একটা উন্মত্ত ঘোড়াকে, তার বালামচি পোড়া, ল্যাজটা হাড় অব্দি জ্বলে যাওয়া। হঠাৎ প্রাসাদে আলো নড়তে শুরু করলো। মশালের একটা নাচ, ঘুরে-ঘুরে চলেছে রান্নাঘর থেকে চিলেকোঠায়, খোলা জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ছে, সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে, জল-পড়ায় নালীর ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, যেন অগুনতি জোনাকি দখল ক'রে নিয়েছে ওপরতলাগুলো। লুঠতরাজ শুরু হ'য়ে গেছে। বালক-ভৃত্যেরা চলার গতি বাড়িয়ে দিলো। জানে যে লুঠপাট এখন বেশ কিছুক্ষণ বিদ্রোহীদের চিত্তবিনোদন করবে। সলিমান তার বন্দুকের ঘোড়ার নিরাপদ ঢাকাটা বসালো, বাঁটটা ঢুকিয়ে দিলো বগলের তলায়।

দিন যখন ফুটলো, তখন পলাতকেরা লা ফেরেইয়ের নগরদুর্গের প্রত্যন্তে এসে পৌছেছে। উৎরাইয়ের খাড়াইয়ের জন্য গতি তাদের মন্থর, তাছাড়া পথে প'ড়ে আছে অগুনতি কামান, সেইসব কামান যারা এখনও ওঠেনি তাদের কাঠের আসনে, আর এখন তারা প'ড়েই থাকবে এইভাবে, যতদিন-না জং ধ'রে যায়। ইল দ্য লা তোরতুর দিকে সমুদ্র আলো হ'য়ে উঠছে, অলুক্ষুণে ভাবে আওয়াজ ক'রে পাথরের গায়ে আছাড় খাচ্ছে ঝুলসেতুর শেকল। আস্তে-আস্তে একমাত্র ফটকটার পেরেকখচিত ভারি পাল্লাটা খুলে গেলো। আর অঁরি ক্রিস্তফের মৃতদেহ ঢুকলো ; প্রথমে ঢুকলো নেয়ারের জাল দিয়ে জড়ানো তাঁর বুটজুতো—যে-নেয়ারের খাটটায় ক'রে তাঁকে বয়ে নিয়ে এসেছে নিগ্রো বালকভৃত্যেরা। প্রতি পদক্ষেপে আরো ভারি হ'য়ে উঠছে শরীর, তিনি উঠতে শুরু করলেন অন্দরমহলের সিঁড়ি,

শিশির ভেজা, ওপরের ধনুকাকৃতি খিলান থেকে ঠাণ্ডা ফোঁটা ঝরছে। দুর্গের এককোণা থেকে আরেক কোণার পরস্পরের ডাকে সাড়া দিয়ে স্তব্ধতাকে চুরমার ক'রে ফেললো ঊষা, সমভূমির অগ্নিশিখায় পেটফোলা ধূসর মেঘের রাশির মধ্য থেকে, লাল ছত্রাকে আগাগোড়া মোড়া, এখনও রাত্রি-ঢাকা, নগরদুর্গ বেরিয়ে এলো।—ওপরটা রক্তরাঙা, নিচেটায় জং ধরা লোহার রং।

এখন, এই বিশৃঙ্খল কোলাহলের মধ্যখানে, নগরদুর্গের রাজ্যপালকে পলাতকেরা খুলে বললো শোকান্তিক দুর্ভাগ্যকাহিনী। খবরটা দাউদাউ ক'রে ছড়িয়ে পড়লো গবাক্ষ, সুড়ঙ্গ, ঢাকা বারান্দা দিয়ে—ঘুমন্ত ঘরে-ঘরে, রান্নাঘরে। কামানের পাশ থেকে, প্রহরী তোরণ থেকে, যে যার পাহারা ছেড়ে সবখান থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলো সৈন্যরা, সিঁড়ি দিয়ে নামা নতুন উর্দির পর-পর ঠেলায় বিশৃঙ্খল। প্রধান মিনারের বারান্দায় একটা উল্লাসের রোল উঠলো, কারারক্ষীরা মুক্ত ক'রে দিলে বন্দীদের, আর কয়েদীরা বেরিয়ে এলো তাদের কুঠুরি ছেড়ে, এক তেরিয়া উদ্ধত আনন্দ ছুটে আসছে যেন রাজপরিবারের সদস্যদের দিকে। এই ভিড় এঁটে বসছে চারদিক থেকে, উশকো-খুশকো। বালকভৃত্য, খালি পা রানী মারিয়া লুইসা, আর রাজ-কুমারীদের অসহায়ভাবে আগলাবার চেষ্টা করছে সলিমান, তাদের বাঁচাতে চাচ্ছে উদ্ধত সব উদ্যত হাত থেকে, আর দলটা একটু পেছিয়ে গেলো একরাশ নতুন মেশানো চুনসুরকির দিকে, এখনো-অসমাপ্ত কাজটার জন্য মেশানো চুনসুরকির মশলার একটা প্রকাণ্ড স্তূপ, যার মধ্যে এখনো মিস্ত্রিদের কতগুলো শাবল আর বেলচা প'ড়ে আছে। পরিস্থিতি ক্রমেই আয়ত্তের বাইরে চ'লে যাচ্ছে দেখে রাজ্যপাল হুকুম দিলেন এক্ষুনি চত্বর সাফ ক'রে দিতে। তাঁর হুকুম একটা বিশাল টিটকিরির অট্টরোল তুললো। বন্দীদের একজন—তার গায়ের জামাকাপড় এতই ছেঁড়া যে পাৎলুনের মধ্য থেকে বেরিয়ে পড়েছিলো তার পুরুষাঙ্গ—একটা আঙুল বাড়িয়ে দেখালো রানীর গ্রীবা :

'গোরাদের দেশে, যখন কোনো সর্দার মারা যায়, তারা তার বউয়েরও গলা কেটে ফ্যালে।'

রাজ্যপাল যেই বুঝতে পারলেন যে প্রায় তিরিশ বছর আগে ফরাশি বিপ্লবের আদর্শবাদীরা যে-দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলো, সেটা এখনও এই লোকটার স্পষ্ট মনে আছে, তাঁর মনে হ'লো, সব বুঝি গেলো। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে গুজব ছড়ালো যে একদল প্রহরী শিবির ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে, তারা

হুড়মুড় ক'রে পাহাড় বেয়ে ছুটে আসছে, অমনি ঘটনার স্রোত একটা নতুন বাঁক নিলে। ছুটতে-ছুটতে, এ ওর গায়ে আছাড় খেতে-খেতে, ভিড় সিঁড়ি বেয়ে, সুড়ঙ্গ দিয়ে, বারান্দা দিয়ে হুড়মুড় ক'রে বিশৃঙ্খলভাবে এগুলো নগরদুর্গের বিশাল ফটকের দিকে। লাফিয়ে, পিছলে প'ড়ে, ঢাল বেয়ে গড়িয়ে তারা ছুটলো রাস্তার দিকে, খুঁজলো হ্রস্বতম রাস্তা, যা তাদের সান্ সুসি নিয়ে যাবে সকলের আগে। আঁরি ক্রিস্তফের সেনাবাহিনী প্রায় পাহাড়ের ধস নামার মতো ভেঙে পড়ছে। এই প্রথমবার এই বিশাল ইমারত দাঁড়িয়ে রইলো ফাঁকা, জনশূন্য, আর তার ঘরগুলোর বিপুল স্তব্ধতার মধ্যে নিয়ে এলো এক রাজসমাধির অন্ত্যেষ্টির গাম্ভীর্য।

মহামান্য রাজাকে শেষবারের মতো দেখবেন ব'লে রাজ্যপাল দোলখাটিয়ার ঢাকা খুললেন। ছুরি দিয়ে তিনি কেটে নিলেন একটি ক'ড়ে আঙুল, রানীর হাতে সেটা তুলে দিলেন, তিনি সেটা অমনি গুঁজে দিলেন বুকের জামার মধ্যে, অনুভব করলেন যে একটা কিলবিলে পোকার মতো সেটা পিছলে নেমে যাচ্ছে উদরের দিকে। তারপর রাজ্যপাল আদেশ দিলেন আর বালকভৃত্যেরা মৃতদেহটা শুইয়ে রাখলো চুনশুরকির মশলার স্তূপে, আর মৃতদেহটা তার মধ্যে ডুবে যেতে লাগলো, যেন চটচটে আঠালো কতগুলো হাত মৃতদেহটাকে টেনে নামাচ্ছে নিচে। পাহাড়ের গা বেয়ে ব'য়ে আনতে-আনতে মৃতদেহটা একটু আড় ধ'রে বেঁকে গিয়েছিলো, তবে এখনো উষ্ণ আছে। সেই জন্যেই তলপেট আর উরুদুটি অদৃশ্য হ'য়ে গেলো প্রথমে, বাহুদুটি আর বুটজুতোজোড়া একটু ভেসে রইলো ওপরে, ঐ ফুলে-ওঠা ধূসর মিশ্রণের ওপরে, যেন মনস্থির করতে পারেনি কী করা উচিত। তারপর যা বাকি রইলো, সেটা মুখটাই, দ্বিচূড় টুপির চিবুকবন্ধের কাঠামোয় তুলে-ধরা। মাথাটা পুরোপুরি ডুবে যাবার আগেই যদি চুনশুরকি শুকিয়ে যায়, রাজ্যপাল তাই তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন রাজার কপালে, তাকে দ্রুত ঠেলে ঢোকাবেন ব'লে; এমন একটা ভঙ্গি তাঁর, যেন কোনো রোগীর কপালে হাত দিয়ে কেউ বোঝবার চেষ্টা করছে জ্বর কত। চুনশুরকি অবশেষে আবার ঘনিয়ে এসে ঢেকে দিলো আঁরি ক্রিস্তফের চোখ দুটি—ভেজা পলেস্তারার নাড়িভুঁড়ির মধ্যে তাঁর মন্থর অবতরণ শুরু হ'য়ে গেছে। তারপর মৃতদেহ থেমে গেলো একসময়, যে-পাথর তাঁকে বন্দী ক'রে রেখেছে তার সঙ্গে মিলে এক হ'য়ে গেলো।

নিজের মৃত্যু নিজেই বেছে নিয়ে, আঁরি ক্রিস্তফ কোনোদিনই জানতে পাবেন না যে তাঁর শরীরের ক্ষয়, তাঁর মাংস আর মজ্জা সব মিলে গেলো দুর্গেরই উপকরণের সঙ্গে, নিজের স্থাপত্যের মধ্যেই প্রস্তরিত হ'য়ে গেলো, ঢেউ়াল-দেয়া ছাইয়ের সঙ্গে মিলে গেলো। ল বন লেভেক—পুরো পাহাড়টাই হ'য়ে উঠেছে হাইতির প্রথম রাজার সমাধিসৌধ।

চতুর্থ

আমার আতঙ্ক ছিলো এইসব ভবিষ্যদর্শনে।
অথচ যেহেতু এই অন্যসব পর-পর দেখেছি
আমার আতঙ্ক আরো, সহ্যাতীত, প্রচণ্ড বেড়েছে।

—কাল্‌দেরোন

১

পাষাণমূর্তির নিশা

চুড়িবালা তাগাতাবিজের ঠুনঠুন বাজিয়ে মাদ্‌মোয়াজেল আতেনা তাঁর বোন আমেতিস্তার নতুন-কেনা পিয়ানোটায় সুর বাজাচ্ছিলেন, আর আমেতিস্তা নিজে ঈষৎ ঝাঁজালো স্বরে অলস বিলম্বিত মূর্ছনা তুলছিলেন রস্‌সিনির 'তানক্রেদি'র একটা আরিয়ায়। গায়ে একটা প্রাতঃকালীন শাদা ঢোলা জামা, হাইতির কেতায় মাথায় একটা রুমাল বাঁধা, রানী মারিয়া লুইসা ব'সে-ব'সে পিসার কাপুচিনদের জন্য একটা বেদিঢাকায় সূঁচ-সুতো দিয়ে ফুল তুলছিলেন আর একটা বেড়ালকে বকছিলেন—তাঁর সুতোর গোলা নিয়ে বেড়ালটা খেলা করছিলো। যুবরাজ ভিক্তরের প্রাণদণ্ডের শোকাতুর দিনগুলোর পর, যে ইংরেজ বানিয়ারা তাঁদের রশদ জোগাতো, তাদেরই সাহায্যে পোর্‌-ও-ফ্রাঁস থেকে বিদায় নিয়ে, এই প্রথম বার ইওরোপে এসে রাজকুমারীরা এমন-এক বসন্তকে উপভোগ করছিলো যাকে সত্যি সত্যিই বসন্ত ব'লেই মনে হয়। এমন-এক সূর্যের তলায় দরজা-জানলা খোলা রেখে রোম আছে, যা সব মর্মরশিলা ঝলশে তুলেছে, তাড়িয়ে দিয়েছে সাধুসন্তদের আলখাল্লার বিকট বদ গন্ধ, আর মনে করিয়ে দিচ্ছে পেস্তার বরফিওলাদের ডাক।

এমন-এক নির্মেঘ আকাশের তলায় নগরীর হাজারটা ঘণ্টা অনভ্যস্ত আলস্যে বেজে ওঠে, যেটা মনে করিয়ে দেয় সমভূমির জানুয়ারি মাসের আকাশ। অবশেষে, ঘেমে-নেয়ে, হাসিখুশি আর উষ্ণ, আতেনা আর আমেতিস্তা তাঁদের দিন কাটান, পাথরের মেঝেয়, খালি পায়ে, ঘাগরাগুলোয় ফাঁস না-লাগানোই থাকে, আর খেলার ছকের মধ্যে ফ্যালেন পাশার দান, তাক থেকে পেড়ে নেন সর্বশেষ উপন্যাসগুলো, যাদের মলাটগুলো, হালফ্যাশন অনুযায়ী, হয় গভীর রাতের গোরস্থান, স্কটল্যাণ্ডের হ্রদ আর ঝিল, তরুণ শিকারিকে ঘিরে কৃশাঙ্গী সুন্দরী, অথবা বুড়ো ওকগাছের কোটরে প্রেমপত্র-লুকিয়ে-রাখা কুমারীদের কাঠখোদাইতে সুশোভিত।

রোমের এই বসন্ত সলিমানেরও বেশ মনোমতো হয়েছে। বাঁধাকপির পাতা, কফির গুঁড়ো, উচ্ছিষ্ট আর জঞ্জালে নোংরা, ভেজা কাপড় থেকে টপটপ ক'রে জল ঝ'রে স্যাঁৎসেঁতে হ'য়ে-থাকা, গরিব পাড়াগুলোয় তার অবির্ভাব দারুণ একটা আলোড়নই তুলেছিলো। নাপোলির অন্ধতম ভিখিরিরও চোখ দুটি খুলে দিয়েছিলো এই প্রচণ্ড বিস্ময় আর তার ম্যাণ্ডোলিন ও হার্মনিকাকে চুপ করিয়ে দিয়েছিলো—এই নিগ্রোটিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখবার জন্য। কিছু-কিছু ভিখিরি সামনে বাড়িয়ে দিয়েছিলো টুঁটো হাত, তাদের ক্ষত আর অঙ্গবিকৃতির যাবতীয় ছলকৌশল—কে জানে, দৈবদয়ায় এ যদি হ'য়ে থাকে সমুদ্রপারের কোনো রাজদূত। সে যেখানেই যায়, বাচ্চারা তার পেছন নেয়, রীতিমতো শুরু ক'রে দেয় হার্মনিকা আর য়িহুদিদের বীণার সেরেনাদ। শুঁড়িখানায় তাকে আপ্যায়িত করা হয় মদ ভর্তি গেলাশে। সে পাশ দিয়ে চ'লে যাবার সময় দোকানিরা দোকান থেকে বেরিয়ে এসে কখনো তাকে উপহার দেয় টোম্যাটো বা একমুঠো আখরোট। অনেক দিন ধ'রেই কোনো সত্যিকার নিগ্রোর ছায়া পড়লো ফ্লামিনিও পন্‌সিওর বাড়ির দেয়ালে অথবা আন্তোনিও লা বাক্কোর দুয়ারে। তাকে যখন কেউ জীবনকাহিনী শোনাতে বলে, সে সোৎসাহে শুরু ক'রে দেয় এক রূপকথা, তাকে অলংকৃত ক'রে তোলে প্রচণ্ডতম অলীক তথ্যে ও অনৃতভাষণে, নিজেকে সে চালিয়ে দেয় জঁরি ক্রিস্তফের ভাগ্নে ব'লে, যে প্রায় অলৌকিকভাবেই হাত এড়িয়েছে এল্ কাবো-র সেই নৃশংস হত্যারজনীর মরণদূতদের, যারা বেরিয়েছিলো রাজার বেজন্মা সব ছেলেদের খতম ক'রে দিতে, সডিনের খোঁচায়, কারণ বন্দুকের অজস্র গুলিও কিছুতেই তাকে পেড়ে ফেলতে পারেনি। তার বিস্ময়ে-হা-করা শ্রোতাদের কোনো স্পষ্ট ধারণাই ছিলো না কোথায় কোন্ দেশে

ঘটেছে এইসব ঘটনা। কেউ-কেউ ভাবলে ঘটেছে নিশ্চয়ই মাদাগাস্কারে, অন্যদের ধারণা নিশ্চয়ই পারস্যে, অথবা বর্বরদের মুলুকে। সবসময়েই উৎসুক হ'য়ে থাকতো কেউ-না-কেউ, সে ঘামতে শুরু করলেই রুমাল দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দেবার জন্য—এটাই দেখতে যে রংটা উঠে আসে কি না। একদিন বিকেলে, ঠাট্টা হিশেবেই, তারা তাকে নিয়ে গেলো এক সরু, ঘিঞ্জি, দুর্গন্ধেভরা নাট্যশালায় যেখানে এক উদ্ভট হৈ-হৈ রৈ-রৈ পালাগান হচ্ছিলো। একটা জটিল কাহিনীর উপসংহারের পর—কাহিনীটা ছিলো আলজেরিয়ার ইতালীয়দের সম্বন্ধে—তাকে ঠেলাঠেলি ক'রে উঠিয়ে দেয়া হ'লো মঞ্চে। তার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব দর্শকদের মধ্যে এমনই তুলকালাম হুল্লোড় তুললো যে দলের অধ্যক্ষ এসে তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বললে যে যখন খুশি এসে সে যেন আবার এমনতর অভিনয় ক'রে যায়। এখন, সবকিছু আরো জমিয়ে তোলবার জন্য, সে আবার বোর্গেস প্রাসাদের এক দাসীর সঙ্গে প্রেম চালিয়ে যাচ্ছিলো, পিয়েমঁর এক দশাসই তরুণী, যার ঐসব পুতু-পুতু মধুর-মধুর প্রেমিকে মন উঠতো না। সত্যিকার গরম দিনগুলোয় সলিমানের অভ্যাস ছিলো ফোরামের ঘাসের ওপর লম্বা একটা সিয়েস্তা লাগানো, যেখানে সবসময়েই ঘাস খেয়ে বেড়াতো পালে-পালে ভেড়ারা। ধ্বংসস্তূপ বেশ মধুর ছায়া ফেলতো সুপ্রতুল ঘাসের ওপর, আর কেউ যদি নোংরা-টোংরা একটু খুঁড়ে দেখতো, তো, তার পক্ষে মর্মরশিলায় তৈরি কোনো কর্ণকুহর, পাথরের তৈরি কোনো অলংকার অথবা কোনো জং-ধরা ধাতুমুদ্রা পেয়ে যাওয়া বিচিত্র ছিলো না। জায়গাটা আবার মাঝে-মাঝে বেছে নিতো রাস্তার বেশ্যা—সেমিনারির এক ছাত্রের সঙ্গে তার জম্পেশ ব্যাবসা চালাবার জন্য। কিন্তু তার সবচেয়ে অধ্যবসায়ী অতিথিরা ছিলো চিন্তাশীল ব্যক্তিরা, অথবা সবুজ ছাতা হাতে যাজকেরা, অথবা কোমল হাতের ইংরেজরা—একটা ভাঙা থাম দেখেই যারা ভাবাবেশে প্রায় মূর্ছা যেতো, আদ্ধেক ক্ষয়ে-যাওয়া কোনো শিলালিপি তারা নকল ক'রে নিতো কাগজে। সন্ধের দিকে নিগ্রোটি দাসদাসীদের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়তো বোর্গেজ প্রাসাদে, আর পিয়েমঁর তরুণীর সঙ্গে লাল মদের বোতলের ছিপি খোলার কাজে নিজেকে সঁপে দিতো। প্রাসাদের মধ্যে রাজত্ব করতো চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা, কারণ মালিকরা কেউই বাড়ি ছিলো না। দরজার বাতিগুলো কালো হয়েছে মরা শ্যামাপোকার স্তূপে, দাসদাসীদের উর্দিগুলো সব নোংরা, কোচোয়ানেরা সবসময়েই নেশায় বুঁদ, ঘোড়ার গাড়ি ঘষামাজা হয় না, আর গ্রন্থাগারের মাকড়শার জালগুলো এমনই নিবিড়ঘন যে ভয়ে কত বছর হ'লো

এ-ঘরে কেউ আর ঢুকতে যায়নি—যদি এই বীভৎস মাকড়গুলো ঘাড় বেয়ে হাঁটে অথবা বুকের জামার মধ্যে ঢুকে পড়ে। এক ছোকরা মোহান্ত যদি না-থাকতো, সে আসলে যুবরাজেরই এক ভাগ্নে, দাসদাসীরা তবে কবেই ওপরতলায় গিয়ে সেইসব বিছানায় শুতো এককালে যেখানে ঘুমোতেন কার্দিনালরা।

একদিন গভীর রাতে, যখন সলিমান আর তার হৃদয়রানী রান্নাঘরে একা আছে, নিগ্রো—সে নেশায় টং—ঠিক করলে যে সে দাসদাসীদের এলাকা ছেড়ে সব ঘুরে-ঘুরে টহল দিয়ে দেখবে। একটা লম্বা ঢাকা বারান্দা দিয়ে দুজনে এসে পড়লো এক প্রকাণ্ড ভেতর-উঠোনে, মর্মরশিলায় ভর্তি, জ্যোৎস্নায় কেমন যেন কেঁপে-কেঁপে উঠছে। দু-সার স্তম্ভ, একটার গায়ে যেন আরেকটা চাপানো, ভেতর উঠোনটাকে কাঠামোর মতো ধ'রে আছে, স্তম্ভশীর্ষের ছায়া দেয়ালের অর্ধেক ওপরে কেমন সব রেখা ফেলেছে। যে-হাতলণ্ঠনটা হাতে ক'রে যাচ্ছিলো, সেটা উঠে-নামিয়ে পিয়েম'র তরুণীটি সলিমানের চোখে উন্মোচিত ক'রে দিলে পাশের দরদালানটায় সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো রাশি-রাশি পাষাণমূর্তি। সব নগ্ন স্ত্রীলোকের মূর্তি—যদিও সবাই প'রেছিলো ওড়না, তবু কোনো কাল্পনিক হাওয়ার ঝাপটা আঁচলটাকে এমন-সব জায়গা থেকে সরিয়ে দিয়েছে, শোভনতা যতটুকু অনুমোদন করে। অনেক জীবজন্তুও ছিলো সেখানে, কারণ এক মহিলা তাঁর কোলে ক'রেছিলেন এক রাজহাঁস, আরেকজন জড়িয়ে ধ'রেছিলেন এক ষাঁড়ের গলা, অন্যরা ডালকুত্তোর সঙ্গে ছুটেছে অথবা ছাগলের পাওলা শিংওলা মানুষদের কাছ থেকে পালাচ্ছে—তারা সম্ভবত শয়তানেরই আত্মীয়। একটা শাদা, হিমজমাট, অচঞ্চল জগৎ কিন্তু তাদের ছায়ারা যেন প্রাণ পেয়ে গেছে আর ক্রমশ বড়ো হচ্ছে লণ্ঠনের আলোয়, যেন দৃষ্টিহীন চোখের এই জীবেরা, যারা কিছু না-দেখেই তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ, তাদের গভীর রাতের আগন্তুকদের মধ্যে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাতালের যেটা দুর্লভ ক্ষমতা, আড়চোখেই ভয়ংকর সবকিছু দেখে ফেলা, তার দরুনই সলিমানের মনে হ'লো একটা মূর্তি যেন তার হাতটা একটু নামালো। অস্বস্তিভরে সে পিয়েম'র যুবতীটিকে টেনে নিয়ে গেলো ওপরতলায় যাবার একটা সিঁড়ির দিকে। এবার মনে হ'লো দেয়াল থেকে নেমে আসছে ছবিরা: এক সহাস্য তরুণ তুলে ধরলো পর্দার কোণা, আঙুর পাতার মুকুটপরা এক নওল কিশোর তার ঠোঁটে তুলে ধরলো বোবা একটা নলখাগড়ার বাঁশি অথবা চুপ করতে ব'লে ঠোঁটের ওপর তুলে ধরলো তর্জনী। ফুলপাতায় অলংকৃত মুকুরশোভিত

একটা দরদালান পেরিয়ে গিয়ে, দাসী, একটু চেতিয়ে-তোলা কামনার ভঙ্গিতে, ছোট্ট একটা আখরোট কাঠের দরজা খুলে লণ্ঠনটা নামিয়ে নিলে।

সেই ছোট্ট কুঠুরিটায় দূর দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটিই মূর্তি। এক নগ্ন স্ত্রীমূর্তি, শুয়ে আছে বিছানায়, তুলে ধ'রে আছে একটা আপেল। তার বিশৃঙ্খল তালগোলপাকানো ভাবনাগুলোকে ঠিকভাবে সাজাবার চেষ্টা ক'রে সলিমান টলোমলো পায়ে চ'লে গেলো মূর্তিটার কাছে। বিস্ময় তার নেশা বেশ খানিকটা ছুটিয়ে দিয়েছে। এই মুখটাকে সে চেনে, এই শরীরটাকেও সে জানে; আস্ত শরীরটা জাগিয়ে তুলছে একটা স্মৃতি। উৎসুক হাতে সে ছুঁয়ে দেখলো মর্মরশিলা, তার আঙুলের ডগাতেই মেশানো আছে দৃষ্টি আর ঘ্রাণের শক্তি। সে হাত বুলিয়ে দেখলো স্তনে। উদরের ওপর ঝোলানো অবতল তালু, নাভির তলায় নেমে গেলো তার কড়ে আঙুল। সে আদর ক'রে হাত বোলালো পিঠের বঙ্কিমায়, যেন শরীরটাকে উলটে দেবে। তার আঙুল খুঁজে বেড়ালো সুগোল নিতম্ব, সুকোমল উরুদেশ, স্তনের আঁটো সুষমা। তার আঙুলের এই অভিযান সজীব ক'রে তুললো তার স্মৃতি, ফিরিয়ে আনলো সুদূর সব ছবি। এই স্পর্শ—তাকে সে তো জেনেছিলো আগে। এই একই বৃত্তাকারে হাত বুলিয়ে একদিন সে ব্যথা কমিয়েছিলো তার মচকানো গোড়ালির। বস্তুটা ভিন্ন, কিন্তু রূপ, অবয়ব—সে তো হুবহু এক। এবার ইল্ দ্য লা তোর্তুর সেই ভয়ের রাতগুলো ফিরে এলো তার কাছে, যখন এক ফরাশি সেনাপতি মুমূর্ষু শুয়েছিলো এক বন্ধ দুয়ারের ওপাশে। তার মনে প'ড়ে গেলো সেই তাকে, যার মাথা সে টিপে দিয়েছিলো ঘুম পাড়াবে ব'লে। আর, আচমকা অস্বীকার করার জো নেই, এমন এক স্মৃতির তাড়ায়, সলিমান শুরু করলো অঙ্গ সংবাহনের প্রক্রিয়া, অনুসরণ ক'রে গেলো পেশীর কাঠামো, কণ্ডরার পরিণাহ, পিঠের মাঝখান থেকে দু-পাশে ডলতে-ডলতে নিয়ে এলো হাত, আঙুল দিয়ে ডললো স্তনের পেশী, তর্জনীটা বোলালো এখানে-সেখানে। কিন্তু হঠাৎ তার কব্জিতে উঠে এলো মর্মরের হিম, যেন মৃত্যুর এক কঠোর সাঁড়াশি তাকে চিপ্‌টে ধ'রে তার ভেতর থেকে নিংড়ে নিয়ে এলো আর্তনাদ। তার মাথার মধ্যকার মদিরা বনবন ক'রে ঘুরতে শুরু করেছে। এই মূর্তি, লণ্ঠনের আলোয় পীতাভ, পাউলিনা বোনাপার্তের মৃতদেহ, এমন-এক মৃতদেহ যেটায় সদ্য আড় ধ'রে গেছে, অতি সম্প্রতি বেরিয়ে গেছে যার প্রাণবায়ু ও সজীব দৃষ্টি, হয়তো সংবাহন এখনও তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে জীবনে। এক ভীষণ আর্তনাদ ক'রে—যেন তার

বুকটা ছিঁড়ে গেছে—নিগ্রোটি বোর্ঘেজ প্রাসাদের সেই স্তব্ধতায় চীৎকার করতে শুরু ক'রে দিলে, গলা ফাটানো চীৎকার, যত জোরে পারে তত জোরে। আর তার চেহারা এমনই আদিম হ'য়ে গেলো,—সে তার গোড়ালি ঠুকছে মেঝেয় জোরে-জোরে, নিচের গির্জেটাকেই যেন বদ্‌লে দিয়েছে ঢাকের চামড়ায়—যে আতঙ্কিতা পিয়ের্ম যুবতীটি ছিটকে পালিয়ে এলো সিঁড়ি বেয়ে, সলিমানকে কানোভার ভীনাসের কাছে একা রেখেই।

উঠোন আলোয় আলোময় হ'য়ে গেলো মোমবাতিতে আর লণ্ঠনে। তেতলা থেকে এমন জোরালোভাবে প্রতিধ্বনিত-হওয়া চীৎকারে জেগে উঠে, দারোয়ান আর কোচোয়ানেরা তাদের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো রাতকাপড়েই, পাৎলুন আঁটতে-আঁটতে। পাশের দরজায় কড়া নাড়ার জোরালো আওয়াজ, রাত-পাহারার শান্ত্রীদের ভেতরে আসবার জন্য সেটা খুলে দেয়া হ'লো, অনেক ভীত সন্ত্রস্ত পড়শিকে পেছনে নিয়ে সার বেঁধে ঢুকে পড়লো শান্ত্রীরা। আয়নাগুলো যখন আলো হয়ে উঠলো, নিগ্রোটি চট ক'রে ঘুরে দাঁড়ালো। এইসব আলো, শাদা মর্মরমূর্তির মধ্যে লোকের ক্রমবর্ধমান ভিড়, তাদের হালকা বাঁশি সমেত উর্দি, সন্দেহাহীত সব দ্বিচূড় টুপি, কোষখোলা এক তরবারির হিম বক্রতা,—তাকে পলকে হিঁচড়ে নিয়ে এলো অঁরি ক্রিস্তফের মৃত্যুর রাত্রির শিহরনে। জানলায় একটা চেয়ার তুলে ছুঁড়ে ফেলে, সলিমান লাফিয়ে পড়লো রাস্তায়। আর প্রথম প্রভাতী উপাসনার গান তাকে আবিষ্কার করলো জ্বরাতুর, কম্পমান, কারণ সে ছিলো মস্তিষ্কের ম্যালেরিয়ার বলি—আর পাপা লেগবাকে সে অনুনয় ক'রে বলছিলো তাকে এক্ষুনি সান্তো দোমিঙ্গোতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। তার হাতে তখনো লেগে আছে দুঃস্বপ্নের যন্ত্রণাময় স্পর্শ। তার মনে হ'লো সে যেন বিকারের ঘোরে এসে পড়েছে কবরের পাথরের ওপর, ঠিক যেমন হ'তো ঐ ওখানে, ভূতে ধরতো যাদের, চাষীরা যাদের ভয়ও করতো আবার ভক্তিও করতো, কারণ তারা তো সবার চাইতে বেশি ভাব ক'রে ফেলেছে কবরের সব প্রভুদের সঙ্গে।

তেতো শেকড়বাকড়ের রস খাইয়ে রানী মারিয়া-লুইসা তাকে মিথ্যেই শান্ত করার চেষ্টা করলেন—শেকড়বাকড়গুলো তিনি পেয়েছিলেন এল্ কাবো থেকে, লণ্ডন মারফৎ, রাষ্ট্রপতি বোয়ারের বিশেষ অনুগ্রহ হিশেবে। সলিমানের দেহ হিম ঠাণ্ডা। এক বেমরশুমি শীত ঠাণ্ডা ক'রে যাচ্ছে রোমের মর্মরশিলা। বসন্তকে ঢেকে ফেলছে এমন-এক কুয়াশা যেটা ঘণ্টায়-ঘণ্টায় গাঢ় হচ্ছে।

রাজকুমারীরা ডেকে পাঠালেন ডাক্তার আন্তোমার্চিকে—সান্তা এলেনায় তিনিই ছিলেন নাপোলিয়ঁর চিকিৎসক, অনেকে বলতো তাঁর নাকি অসাধারণ পেশাদারি নৈপুণ্য আছে, বিশেষ ক'রে হোমিওপ্যাথ হিশেবে। কিন্তু যে বাড়িগুলোর তিনি ব্যবস্থা করলেন, সেগুলো কখনো কৌটো থেকে বেরুলো না। সকলের দিকে পেছন ফিরে, সবুজ জমির ওপর হলদে ফুল-ফুল ছবিআঁকা কাগজসাঁটা দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে, সলিমান খুঁজে বেড়াচ্ছে এমন-এক দেবতাকে, যাঁর আবাস কোনো দূর-সুদূর দাহোমে, কোনো আঁধার চৌরাস্তায়, তাঁর লাল পুরুষাঙ্গ তিনি ব'য়ে চলেন একটা যষ্টির ওপর, সেই উদ্দেশ্যেই।

Papa Legba, l'ouvri barrie'-a pou moin, ago' ye',

Papa Legba, ouvri barrie'-a pou moin, pou moin pusse'.

২

রাজপ্রাসাদ

সান সুসির রাজপ্রাসাদের লুঠতরাজের চক্রিদলের একজন সর্দার ছিলো তি নোয়েল। তার ফলেই, লেনরূর্ম দ্য মেজির গোলাবাড়ির ধ্বংসস্তূপ এখন উদ্ভটভাবে আশবাবপত্রে সাজানো। কোনো কড়িবরগা, অথবা ছাত বসাবার জন্য দুই কোণে দুই থামের অভাবে ইমারতটায় এখন কোনো ছাত নেই। কিন্তু তার কাটারি দিয়ে ঘা মেরে-মেরে বুড়ো খুলে-খুলে সরিয়েছে ভাঙাচোরা সব পাথর, বুনিয়াদটার কোনো-কোনো অংশ বার ক'রে এনেছে আলোয়—জানলার গোবরাট, তিন ধাপ সিঁড়ি, এখনো-চোখে-পড়ে এমনি একটা দেয়ালের টুকরো ইটের গায়ে আঁকড়ে আছে, পুরোনো নর্ম্যান খাবারঘরের কাঠামোর ছাঁচ। যে-রাতে সমভূমি পুরুষ স্ত্রীলোক শিশুদের ভিড়ে গিশগিশ ক'রে উঠেছিলো, যারা মাথায় ক'রে নিয়ে এসেছিলো দোলক লাগানো ঘড়ি, চেয়ার, ঝালর, সন্তদের চাঁদোয়া, দুই ডাল শামাদান, উপাসনাচৌকি, বাতি, কাপড় কাচার গামলা, তি নোয়েলও কয়েকবার গিয়েছিলো সান সুসিতে। এইভাবে সে মালিক হ'য়ে বসেছে মস্ত একটা টেবিলের, যেটাকে দাঁড় করানো হয়েছে খড় বেছানো চুল্লির সামনে, যার ওপর সে এখন ঘুমোয়, টেবিলটা সে চোখের আড়ালে লুকিয়েছে

করমণ্ডল পর্দা টাঙিয়ে যার গায়ে আঁকা ছিলো বিবর্ণ সোনালি পটে ছায়ার মতো কতগুলো মূর্তি। আর ঐ শেকড় গজানো মেঝের টালির ওপর প'ড়ে আছে মলম মাখানো একটা চাঁদ মাছ—যুবরাজ ভিক্তরের প্রতি লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির উপহার, তার পাশেই প'ড়ে আছে একট ছোট্ট বাক্স—যার ডালা তুললেই সুর বেজে ওঠে, আর প'ড়ে আছে এক পানপাত্র, যার পুরু সবুজ কাচের মধ্যে রামধনু-রঙা বুদ্বুদ দেখা যায়। রাখাল মেয়ের সাজ পরানো একটা পুতুলও সে নিয়ে এসেছে, নিয়ে এসেছে এক আরামকেদারা, সেটা আবার কারুকাজ-করা কাপড় ঢাকা, আর তিন খণ্ড, 'গ্রাঁ এন্‌সিক্লোপেদি', যার ওপর ব'সে আখ চেবানো তার অভ্যাস।

কিন্তু বুড়োর সব অহংকার অঁরি ক্রিস্তফের একটা পোশাকি ঝুলকুর্তা নিয়ে—সবুজ রেশমে তৈরি, হাতার কাজটায় স্যালমন-রঙা লেসের কাজ,—সেটা সে সবসময় প'রে থাকে; তার রাজোচিত ভঙ্গিমাটা আরো উগ্র হ'য়ে ওঠে একটা ফিতে লাগানো খড়ের টুপি প'রে, সেটাকে সে ভাঁজ ক'রে নিয়েছে দ্বিচূড় টুপির মতো, মোরগঝুঁটির বদলে তাতে লাগিয়েছে লাল ফুল। কোনো অপরাহ্ণে তাকে দেখা যায় রোদ-জলে প'ড়ে-থাকা ঐ আশবাবগুলোর মধ্যে ব'সে পুতুলটাকে নিয়ে খেলতে—পুতুলটা আবার তার চোখ খুলতে বা মুছতে পারে—অথবা দেখা যায় মিউজিক বাক্সটায় দম দিতে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত সবসময়েই যেটা শোনায় একই আলেমান ল্যাণ্ডলার নাচের সুর। তি নোয়েল এখন অবিশ্রাম কথা বলে। সে কথা বলে, দুই হাত ছড়িয়ে, রাস্তার মাঝখানে; সে কথা বলে ঘোলাটে ঝরনার জলে হাঁটুগেড়ে বসা খোলা-মাই ধোবানিদের সঙ্গে; সে কথা বলে গোল হ'য়ে ঘুরে-ঘুরে নাচতে-থাকা বাচ্চাদের সঙ্গে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি সে কথা বলে যখন সে বসে তার টেবিলে, রাজদণ্ডের মতো ক'রে একটা পেয়ারার ডাল হাতে ধ'রে। তার মনে ঝাপশা-ঝাপশা উঁকি দেয় সেই একহাত-ওলা মাকান্দালের সব কথাবার্তা—এত বছর আগেকার কথা যে তার মনেও পড়ে না কখন সে শুনেছিলো সেইসব। যেদিন এ-সব তার মনে পড়ে, সেদিন তার মধ্যে কেমন একটা বিশ্বাস, একটা আস্থা জাগতে শুরু ক'রে দেয়—এই মর্তধামে আসার একটা পবিত্র উদ্দেশ্য আছে তার, আর সেই কর্তব্য তাকে সম্পাদন করতেই হবে, যদিও কোনো ইঙ্গিত, কোনো চিহ্নই ঠিক বুঝিয়ে দেয়নি সেই কর্তব্যের প্রকৃতি কী। তবে নিশ্চয়ই মহান-কিছু, গরীয়ান-কিছু, এমন-কিছু যেটা এত দীর্ঘকাল পৃথিবীতে থাকার ফলেই কারু সুমানান অধিকারে এসে পড়েছে—সমুদ্রের এপারে

ওপারে তার নিজের ছেলেপুলেরা যে যার নিজের ছেলেপুলে নিয়েই ব্যস্ত, তার কথা তাদের মনেও পড়ে না। উপরন্তু, এটাও তো স্পষ্ট যে সব মহান সব ঘটনা ঘটতে চলেছে। স্ত্রীলোকরা যখন তাকে আসতে ছাখে, সম্মান জানিয়ে জলজলে রংচঙা কাপড় নাড়ে, এক রোববারে যেমন ক'রে জিশুর কাছে অনেক আগে তারা বিছিয়ে দিয়েছিলো তালপর্ণ। যখন সে কোনো ছোট্ট কাঠের বাড়ির পাশ দিয়ে যায়, বুড়িরা তাকে আমন্ত্রণ জানায় একটু ব'সে যেতে, লাউয়ের খোলে তাকে এনে দেয় নির্জলা একটু রাম, কিংবা সগুপাকানো চুরুট। ঢাকের উৎসবে, একবার আঙ্গোলার রাজার আত্মা ভর ক'রেছিলো তি নোয়েলের ওপর, আর সে উচ্চারণ করেছিলো এক দীর্ঘ ভাষণ, যেটা ভরা ছিলো হেঁয়ালিতে আর প্রতিশ্রুতিতে। ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে নতুন যে-সব জীবজন্তু ঘাসের ওপর চ'রে বেড়ায়, তারা নিঃসন্দেহে তার প্রজাদের ভেট। তার আরাম কেদারায় ব'সে, গায়ের কুর্তার বোতাম খোলা, খোড়ো টুপিটা কান অব্দি নামানো, আস্তে-আস্তে খোলা পেটটা চুলকোতে-চুলকোতে, তি নোয়েল বাতাসের কাছে সব হুকুম দেয়। কিন্তু সেগুলো সবই কোনো শান্তিকামী সরকারের ঘোষণা; তার স্বাধীনতায় কেউ বিঘ্ন ঘটাবার ভয় দেখায় না—না শাদারা, না নিগ্রোরা। বুড়ো তার ভাঙাচোরা দেয়ালের ফাঁকফোকর ফাটল বুজিয়েছে চমৎকার সব জিনিশে, যে-কোনো পথিককেই সে নিয়ে দেয় অমাত্যের পদ, যে-কোনো খড়কাটিয়েকে সেনাপতিত্ব, বিলি ক'রে দেয় ব্যারনত্ব, উপঢৌকন দেয় পুষ্পস্তবক, আশিস জানায় ছোট্ট মেয়েদের, আর সেবা করার জন্য তাদের পারিতোষিক দেয় ফুলপল্লব। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তিক্ত ঝাঁটার রত্নশ্রী, বড়োদিনের উপহারের ভূষণ, প্রশান্ত সাগরের খেতাব, বিষকাঁটালির পুষ্পশ্রী। কিন্তু সবচেয়ে দামি হ'লো সূর্যমুখির ভূষণ, সেটাই সবচেয়ে সুন্দর ও শোভাবর্ধক। টালি বসানো মেঝের আদ্ধেকটা যেহেতু তার আমদরবার, এবং নাচের পক্ষেও খুব ভালো, তার রাজপ্রাসাদ তাই ভ'রে যায় গাঁয়ের লোকে, তারা নিয়ে আসে তাদের নলখাগড়ার বাঁশি, তাদের চাচা, তাদের ঢাক। জলন্ত মশাল গুঁজে দেয়া হয় দোফলা ডালের গেঁজে, আর তি নোয়েল, তার সবুজ রেশমি কুর্তা গায়ে আরো রাজোচিত, উৎসবের সভাপতিত্ব করে সাভান্নার এক পুরোহিতের পাশে ব'সে, সে হ'লো সগু গজানো এক দেশী গির্জের যাজক, আর এক বুড়ো যুদ্ধফেরৎ সৈনিক থাকে তার আরেক পাশে—সেই তাদেরই একজন যারা ভের্তিয়ের-এ রশাম্বুর বিরুদ্ধে যুঝেছিলো—বিশেষ উপলক্ষে যে বার ক'রে আনে তার রংচটা নীল-নীল অভিযানউর্দিটা,

যেটার রং এখন হ'য়ে উঠেছে ধমুকমণির মতো, যেহেতু তার বাড়িতে বর্ষাকালে চুঁইয়ে পড়ে বৃষ্টির জল।

৩

জরিপদল

কিন্তু একদিন সকালে এসে হাজির জরিপদল। কীটের কাজ বেছে নিয়েছে এরা, নিছক উপস্থিতি মারফৎ এরা কী আতঙ্ক জাগিয়ে তোলে, সেটা বোঝবার জন্যে জরিপদলকে কাজ করতে দেখা চাই কারু। মেঘের মতো পাহাড় পেরিয়ে সেই দূর পোর্-ও-প্রাঁস থেকে যে জরিপদল এসেছে তারা কথা বলে না. গোরা রং মানুষ তারা, প'রে থাকে—মানতেই হয়—মোটামুটি স্বাভাবিক পোশাক; তারা লম্বা-লম্বা দড়ি টেনে বিছায় জমিতে, খুঁটি পুঁতে দেয়, ব'য়ে বেড়ায় ওলনদড়ি, দূরবিনে চোখ লাগিয়ে ছাখে, আর কত যে মাপজোকের লাঠি আর চৌকো তাদের, তার ইয়ত্তা নেই। তি নোয়েল যখন তার রাজত্বের চৌহদ্দিতে এই সন্দেহজনক চরিত্রদের আনাগোনা করতে দেখলো, সে কঠোর স্বরে তাদের সঙ্গে কথা বললে। কিন্তু জরিপদল তাকে কোনো পাত্তাই দিলে না। তারা, অবাধ্য সব, এদিক-ওদিক ঘুরলো-ফিরলো, মাপলো সবকিছু, ছুতোরদের পেটমোটা পেনসিলে কী-সব যেন লিখে নিলো তাদের ধূসর খাতায়। বুড়ো রেগে টং হ'য়ে দেখলো যে তারা ফরাশিদের ভাষায় কথা বলে, যে-ভাষা সে ভুলেই গিয়েছে, সেই অতীতে, যেদিন মঁসিয় লেনর্মাঁ দ্য মেজি তাশের জুয়োয় তাকে হেরেছিলেন সান্তিয়াগো দে কুবায়। তি নোয়েল কুত্তির বাচ্চাগুলোকে তার জমি থেকে সটান কেটে পড়তে হুকুম দিলে; এমন ক্ষিপ্তভাবে সে চ্যাচাচ্ছিলো যে জরিপদলের একজন তার ঘেটিটা পাকড়ালো, দূরবিনের দৃষ্টিপথ থেকে সরাবার জন্য তার মাপলাঠি দিয়ে পেল্লায় একটা ঘা কষালো তার পেটে। বুড়ো ফিরে গেলো তার চিমনির কাছে, করমণ্ডল পর্দার আড়াল থেকে উঁকি মেরে-মেরে দেখলো, অভিশাপ দিতে লাগলো তাদের। কিন্তু পরদিন, কিছু খাদ্যের খোঁজে, সে যখন সমভূমিতে লক্ষ্যহারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে দেখতে পেলো চারপাশ গিশগিশ করছে জরিপদলে, আর ঐ

ঘোড়ায় চড়া মুলাটোগুলো—তাদের গলার কাছে জামা খোলা, রেশমের কোমরবন্ধপরা, পায়ে সামরিক জুতো—পরিচালনা করছে এক বিশাল কর্মকাণ্ড—হাল দিচ্ছে জমিতে, সাফ করাচ্ছে আশপাশ, আর খেটে মরছে শয়ে-শয়ে নিগ্রো বন্দী। তাদের গাধার পিঠে চ'ড়ে, রাশি-রাশি মুরগি-শুওর নিয়ে, শয়ে-শয়ে চাষী বেরিয়ে আসছে তাদের কুঠুরি থেকে—স্ত্রীলোকদের কান্নাকাটি আর ডুকরে-ওঠা বিলাপের মধ্যে—তারা পাহাড়ে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেবে। তি নোয়েল এক পলাতকের কাছে জানতে পেলে যে কাজ বাধ্যতামূলক ক'রে দেয়া হয়েছে, আর চাবুকগুলো এখন গণপ্রজাতন্ত্রী মুলাটোদের হাতে—উত্তরের সমভূমির এরা নতুন প্রভু।

মাকান্দাল এই বেগার শ্রমের ব্যাপারটা আগে থেকে দেখতে পায়নি। জ্যামেকার সেই বুকমানও না। মুলাটোদের এই উত্থান এমন-একটা নতুন জিনিশ যেটা হোসে আন্তোনিও আপোন্তেরও মাথায় আসেনি, যার মুণ্ডচ্ছেদ করেছিলো সোমেরুলোর মার্কি, আর বিদ্রোহের প্রতিবেদন তি নোয়েল শুনেছিলো কুবায় তার দাস দিনগুলোয়। এমনকী আঁরি ক্রিস্তফও সন্দেহ করতে পারেনি যে সান্তো দোমিঙ্গো একদিন নিয়ে আসবে এই বেজন্মা হঠাৎ-নবাবদের, এই চৌআঁশলার জাতকে, যারা এখন দখল ক'রে নিচ্ছে পুরোনো সব ক্ষেতখামার, তাদের পদাধিকার ও বিশেষ সুবিধার বলে। বুড়ো তার ঘোলাটে চোখ মেলে তাকালো লা ফেরের-এর নগরদুর্গের দিকে। কিন্তু অদ্দূরে আর তার চোখ চলে না আজকাল। আঁরি ক্রিস্তফের প্রথা পাথরে পরিণত—সে-সব কিছুই আর আমাদের মধ্যে বেঁচে নেই। তাঁর সেই অতিকায় জীবনের ঝরতি-পড়তি অংশটুকুই প'ড়ে আছে রোমে, একটা বেলোয়ারি শিশিতে ব্র্যাণ্ডির আরকের মধ্যে চোবানো একটা আঙুল। আর সেই দৃষ্টান্ত অনুযায়ীই রানী মারিয়া-লুইসা, কার্লসবাডের হামামে তাঁর মেয়েদের নিয়ে যাবার পর, তাঁর ইষ্টিপত্রে হুকুম করেছিলেন তাঁর ডান পা যেন কোহলে চুবিয়ে রাখা হয়, এবং তাঁর ধর্মপ্রাণ বদান্যতায় নির্মিত একটা গির্জেয় যেন পিসার কাপুচিনদের তা দিয়ে দেয়া হয়। যতই চেষ্টা করুক, তি নোয়েল কোনো পথ খুঁজে পেলে না—কেমন ক'রে সে তার প্রজাদের চাবুকের তলায় কুঁকড়ে-যাওয়া থেকে বাঁচাবে। শেকলের এই অবিশ্রাম প্রত্যাবর্তন, বেড়ির এই বিরামহীন পুনর্জন্ম, দুঃখবেদনার এই অনবরত বংশবৃদ্ধি—যা দেখে আরো-হালছাড়া লোকেরা অবশেষে সব বিদ্রোহের অপ্রয়োজনীয়তার প্রমাণ হিশেবে মানতে শুরু ক'রে দিয়েছে—বুড়োর বুক ভেঙে দিলে। তি নোয়েল ভয় পেয়ে গেলো: হয়তো

তাকেও বলবে হাল চষতে, তার এত বয়েস হওয়া সত্বেও। আর তারই ফল হিশেবে মাকান্দাল তার স্মৃতি দখল ক'রে বসলো। মানুষী বেশ যদি এক দুঃসহ সর্বনাশ নিয়ে আসে তার কাছে, তবে তো সাময়িকভাবে এটা ত্যাগ করাই ভালো, চোখে-না-পরার মতো অন্যকোনো বেশ ধ'রে সমভূমির ঘটনাগুলো লক্ষ করাই তবে উচিত। একবার এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুবামাত্র তি নোয়েল অবাক হ'য়ে দেখলো, কারু যদি বিশেষ ক্ষমতা থাকে তবে কত সহজে সে কোনো জন্তুতে রূপান্তরিত হ'য়ে যেতে পারে। এরই প্রমাণ হিশেবে সে একটা গাছে চ'ড়ে বসলো, সমস্ত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করলো পাখি হ'য়ে যাবার জন্য—আর, মুহূর্তে, সে পাখি হ'য়ে গেলো। মগডালে ব'সে সে লক্ষ করতে লাগলো জরিপদলকে, তার চঞ্চু ঠোকরালো মেদলার গাছের জীর্ণ বাকলে। পরদিন সে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করলো টাট্টু ঘোড়া হ'য়ে যাবার জন্য, আর হ'য়ে গেলো একটা টাট্টু ঘোড়াই, কিন্তু মুলাটোটা তাকে ল্যাসো ছুঁড়ে পাকড়ে একটা মাংসকাটা ছুরি দিয়ে তাকে খোজা ক'রে দিতে চাচ্ছিলো ব'লে, গায়ের জোরে পাই-পাই ক'রে তাকে ছুটে পালাতে হ'লো। তারপর সে নিজেকে বদলে ফেললো একটা বোলতায়, কিন্তু মোম বানাবার একঘেয়ে একটানা জ্যামিতিতে শিগগিরই সে ক্লান্তবিরক্ত হ'য়ে পড়লো। পিঁপড়ে হ'য়ে উঠে একটা মস্ত ভুলই ক'রে বসেছিলো সে, হ'য়েই দেখতে পেয়েছিলো অন্তহীন রাস্তা ধ'রে ভারি-ভারি মোট ব'য়ে তাকে চলতে হচ্ছে—বড়োমাথা পিঁপড়েদের সজাগ প্রহরায়, যারা তাকে বিশ্রীভাবে মনে করিয়ে দিচ্ছিলো লেনর্মঁ দ্য মেজির উপদর্শকদের, অঁরি ক্রিস্তফের পাহারাদের আর আজকের দিনের এই মুলাটোদের। সময়-সময় ঘোড়ার ক্ষুর ধ্বংস ক'রে ফ্যালে শ্রমিকবাহিনী, শয়ে-শয়ে মজুর মেরে ফ্যালে। যখন এটা হয়, ডেঁয়ো পিঁপড়েরা আবার ছিমছাম ক'রে সাজিয়ে দেয় সার, এগিয়ে-পেছিয়ে খুঁজে বার ক'রে নেয় রাস্তা, আর আবার সব চলতে থাকে আগের মতো, সেই একই ব্যস্ত আসা-যাওয়া। তি নোয়েল যেহেতু সেখানে ছিলো ছদ্মবেশে, আর নিজেকে এক ঝলকও পিঁপড়েদের একজন ব'লে ভাবতে পারেনি, সে গিয়ে শেষটায় আশ্রয় নিলে তার টেবিলের তলায়, যেটা সে-রাতে তার শরীর বাঁচালে একটানা গুঁড়ি বৃষ্টি থেকে, যার পর সারা মাঠ ভ'রে গিয়েছিলো ভেজা শরবনের খোড়ো গন্ধে।

৪

Agnus Dei

মেঘলা দিন, গরম পড়বে বিষম। মাকড়শার জালগুলোয় শিশির তখনও পুরোপুরি শুকোয়নি, এমন সময় তি নোয়েলের রাজত্বের ওপর আকাশ থেকে নেমে পড়লো প্রচণ্ড এক নির্ঘোষ। ছুটে, ছুটোপাটি ক'রে, হোঁচট খেতে-খেতে, সান্ সুসির পুরোনো গোলাবাড়ি থেকে পড়ছে হাঁসেরা, ছুটে আসছে, তারা বন্যা থেকে পালিয়েছে দল বেঁধে, কারণ নিগ্রোদের ভালো লাগে না হাঁসের মাংস, আর তাই অ্যাদ্দিন যেমন খুশি খেয়াল মাফিক বাঁচছিলো তারা, পাহাড়-পর্বতের আখের ক্ষেতের মধ্যে। বুড়ো এদের গ্রহণ করলে সাদরে, পরমানন্দে। তাদের আগমনে সে দারুণ খুশি, কারণ খুব বেশি লোকে তো আর তার মতো অত ভালো ক'রে জানে না হাঁসেদের বুদ্ধিশুদ্ধি আর হাসিখুশির ধরনধারণ, কারণ সে তো কবেই লক্ষ ক'রে দেখেছিলো তাদের আদর্শ রীতিনীতি, সেই যখন ম'সিয় লেনর্মঁ দ্য মেজি অনেক বছর আগে তাদের চেষ্টা করেছিলেন নতুন জলবায়ুতে খাপ খাইতে নিতে। তারা যেহেতু গরম জলবায়ুর জন্য তৈরি ছিলো না, মাদীগুলো প্রতি দু-বছর অন্তর মাত্র পাঁচটা ক'রে ডিম পাড়তো। কিন্তু ছানা ফোটাবার জন্য তাদের তা দেয়া উৎপন্ন করেছিলো এমন-সব রীতিনীতি যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে হাত-ফেরতা হ'য়ে চ'লে আসছিলো। একটা অগভীর ঝরনার ধারে মিলনক্রিয়া শুরু হ'তো পুরুষ আর মেয়ের, পুরো গোষ্ঠীটার সামনেই। এক তরুণ মরদ প্রেম করতো তার জীবনসাথীর সঙ্গে, তাকে ঢেকে দিতো নিজের পাখায়, উল্লসিত ভেঁপুর আওয়াজের মধ্যে, সেইসঙ্গে চারপাশে চলতো পার্বণী নাচ,—ঘুরপাক, পা ঠোকা আর গলার সব কতরকম উদ্ভট তকেলাগানো ভঙ্গি। তারপর পুরো গোষ্ঠী শুরু করতো নীড় বানাতে। তা দেবার সময় বধূর ওপর নজর রাখতো সব পুরুষ, সারা রাত, সজাগ, সতর্ক, যদিও তাদের গোল-গোল চোখগুলো ঢাকা থাকতো পাখার আড়ালে। যখন কোনো বিপদ ভয় দেখায় অলবড্যে হলদে-পালক হাঁসের ছানাগুলোকে, সবচেয়ে বুড়ো হাঁসেরা তেরিয়া হ'য়ে শানায় বুক আর ঠোঁটের ঠোকর, তোয়াক্কাই করে না শত্রুকে—তা সে যে-ই হোক না কেন—মাসটিফ, ঘোড়সোয়ার বা ঘোড়ার গাড়ি। হাঁসেরা সব নিয়মমানা জীব, রীতিশৃঙ্খলা জানে, তাদের আছে নীতিনিয়ম, ব্যবস্থাপদ্ধতি, একই প্রজাতির

আরেক জনের ওপর কেউ এসে ফোঁপর দালালি করবে, এটা তারা মানে না। কর্তৃত্বের যেটুকু রীতিনীতি প্রকাশ পেতো বুড়ো হাঁসেদের মধ্যে, তার উদ্দেশ্য ছিলো গোষ্ঠীর মধ্যে যাতে শৃঙ্খলা বজায় থাকে, আফ্রিকার পুরোনো খামার-গুলোয় যে-ভূমিকা ছিলো রাজার বা দলনায়কের। তি নোয়েল তার ভেলকি খাটিয়ে নিজেকে বানিয়ে ফেললো একটা হাঁস, যারা তার বাড়িটাকে তাদের আশ্রয় বানিয়ে নিয়েছে তাদের সঙ্গেই মিলে-মিশে জীবন কাটাবে ব'লে।

কিন্তু যখন সে চেষ্টা করলে গোষ্ঠীর মধ্যে নিজের জায়গা ক'রে নিতে, তাকে পেতে হ'লো ঠোঁটের ঠোক্কর আর গলার ধাক্কা—তারা তাকে দূরে ঠেলে দিতে চাচ্ছে। তাকে দেয়া হ'লো চারণভূমির কিনার, আর উদাসীনা হাঁসীদের ঘিরে রাখলো শাদা পালকের একটা দেয়াল। এ-সব দেখে তি নোয়েল সতর্ক হবার চেষ্টা করলে, নিজের প্রতি সে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় না, অন্যদের সিদ্ধান্তেই সায় দেয় সবসময়। বিনিময়ে তার পুরস্কার জুটলো ঘৃণা আর পাথার ঝাপটার তাচ্ছিল্য। মিথ্যেই সে হাঁসীদের দেখিয়ে দিলে কোথায় পাওয়া যায় রসালো সব গুগলি আর শামুক। তাদের ধূসর পুচ্ছ তবু বেঁকে যায় বিরক্তিতে, আর তাদের হলুদ চোখগুলো তাকে লক্ষ করে রাগি সন্দেহে, এমনকী ঘাড় ঘুরিয়েও তারা এভাবেই তাকায় তার দিকে। গোষ্ঠীকে এখন দেখায় অভিজাতদের একটা সমাবেশের মতো, অন্য জগতের কেউ যাতে ঢুকে পড়তে না-পারে সেইজন্যে নিবিড় আটকানো, রুদ্ধ। সান সুসির মহা-হাঁস নোন্দোর মহা-হাঁসের সঙ্গেও কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না। যদি তাদের দেখা হয় মুখোমুখি, শুরু হ'য়ে যায় শত্রুতা। এইভাবেই তি নোয়েল টের পেয়ে গেলো সে যদি বছরের পর বছর অসীম ধৈর্য নিয়ে লেগে থাকে, তবু সে কিছুতেই, কোনোভাবেই, গোষ্ঠীর রীতিনীতি ও দায়দায়িত্বের মধ্যে গৃহীত হবে না। এটা তার কাছে স্ফটিকস্বচ্ছ হ'য়ে গেছে যে হাঁস হ'য়ে যাওয়ার মানে এই নয় যে সব হাঁসেরাই সমান। তি নোয়েলের বিয়ের দিন কোনো জানাচেনা হাঁস এসে নাচেনি বা গান গায়নি। এই যারা বেঁচে আছে, তারা কেউ কোনোদিন চোখে ছাখেনি কবে সে ডিম ফুটে বেরিয়েছিলো। সে নিজেকে উপস্থাপিত করেছে কোনো যোগ্য সুষ্ঠ মর্যাদাময় পারিবারিক পরিচয়পত্র ছাড়াই, এমন-সব হাঁসীদের কাছে, যারা চার-চার প্রজন্ম অব্দি পূর্বপুরুষদের নাম জানে। এক কথায়, সে এক উটকো হাঁস, নামগোত্রহীন, বহিরাগত, আগন্তুক।

তি নোয়েল আবছা-আবছা বুঝতে পারলে যে হাঁসেরা তাকে যে প্রত্যাখ্যান

করেছে সে তার ভীরুতার শাস্তি হিশেবেই। মাকান্দাল তো কত বছর প'রে ছিলো জীবজন্তুর ছদ্মবেশ—মানুষেরই কাজে লাগার জন্য, মানুষের জগৎকে ত্যাগ করার জন্য নয়। এই সময়েই বুড়ো ফিরে ধরলো তার মানুষী রূপ—ঝলকের জন্য এক চরম প্রাঞ্জলতায় ভ'রে গেলো তার বোধ। শুধু একটা হৃদয়স্পন্দের প্রসরে সে বাঁচলো তার জীবনের সেরা সুন্দর মুহূর্তগুলো; আরো একবার সে চোখে আভাস পেলে সেই বীরদের যারা তার কাছে উন্মোচিত করেছিলো তার সুদূর মুহূর্তগুলো; আরো একবার সে চোখে আভাস পেলে সেই বীরদের যারা তার কাছে উন্মোচিত করেছিলো তার সুদূর আফ্রিকার পূর্বপুরুষদের শক্তি ও পূর্ণতা, তাকে তা বিশ্বাস করালো যে ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত আছে সম্ভাব্য সব নবজন্ম। নিজেকে তার মনে হ'লো অগুনতি শতাব্দীর সমবয়সী। এক বিশ্বজোড়া ক্লান্তি—যেন পাথরের ভারে নাজেহাল হ'য়ে আছে আস্ত একটা গ্রহই—পড়লো তার কাঁধের ওপর—অত মার, ঘাম, বিদ্রোহে যে-বাঁধ কুঁকড়ে গেছে, গুটিয়ে গেছে। তি নোয়েল অপচয় করেছে তার জন্মের অধিকার, আর দুঃসহ দারিদ্র সত্ত্বেও—যে দারিদ্রে সে ডুবে ছিলো সারা জীবন—সে রেখে যাচ্ছে সেই একই উত্তরাধিকার, যা সে নিজেও পেয়েছিলো: মাংসে-গড়া এক শরীর, যার গায়ে কত-কিছুই যে ঘটেছে। এখন সে বুঝতে পারলে যে কোনো মানুষ কখনোই সত্যি ক'রে জানে না কার জন্য সে কষ্ট পায়, কার জন্যেই বা সে আশায় বুক বাঁধে। সে কষ্ট করে আশা করে কাজ করে সেই মানুষদেরই জন্য যাদের সে কোনোদিনও জানবে না, আর যারা—তাদের নিজেদের যখন পালা আসবে—তাদেরই জন্য কষ্ট পাবে আশা করবে যারাও আর সুখী হবে না কখনো, কারণ মানুষ সবসময়েই হাতড়ায় সেই সুখ তাকে-দেয়া ছোট্ট পরিসরটির অনেক বাইরে যার অবস্থান। কিন্তু মানুষের মহিমা তো এইখানেই যে, সে যা, সে চায় তার চেয়েও ভালো হ'তে। নিজের ওপর কর্তব্য আরোপ করাতেই তো। স্বর্গের রাজত্বে তো জয় ক'রে নেবার মতো কোনো মহিমা নেই, সেখানে সবই তো আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠিত পারম্পর্যে সাজানো, ওপর থেকে নিচে, যেখানে অজ্ঞাত মাত্রেই উন্মোচিত, অস্তিত্ব সীমাবিহীন, সেখানে তো আত্মবিসর্জনের কোনো সম্ভাবনাই নেই, সেখানে সবই তো বিশ্রাম আর আনন্দ। এই জন্যেই, ব্যথার ভারে কাজের ভারে নুয়ে-পড়া, দুর্দশার মধ্যেও রূপবান, দুঃখদুর্বিপাকের মধ্যে ভালোবাসতে সক্ষম, মানুষ খুঁজে পায় তার মহিমা, তার পূর্ণতা, শুধু এই মর্তের রাজত্বেই।

তি নোয়েল বেয়ে উঠে পড়লো তার টেবিলের ওপর, তার কড়া পড়া পায়ে পায়াটা পেঁচিয়ে। আগুনের ধোঁয়ায় এল্ কাবো-র দিকে আকাশ অন্ধকার হ'য়ে আছে—ঠিক সেইরাতের মতো যেদিন পাহাড়ের উপকূলের সব শঙ্খ একসঙ্গে গান ক'রে উঠেছিলো। বুড়ো তার যুদ্ধ ঘোষণা করলো নতুন প্রভুদের বিরুদ্ধে, আদেশ করলো তার প্রজাদের—ক্ষমতাসীন মুলাটোদের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে সুশৃঙ্খল-ভাবে কুচকাওয়াজ ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে। সেই মুহূর্তে, সমুদ্র থেকে উঠে এসে, এক বিশাল সবুজ হাওয়া ঝেঁটিয়ে গেলো উত্তরের সমভূমি, প্রচণ্ড গর্জন ক'রে ছড়িয়ে গেলো দোন্দোর উপত্যকায়। আর যখন লা বনে ছ লেভেকের শিখরে ঢুকরে উঠলো গলাকাটা ষাঁড়গুলো, আরামকেদারা, পর্দা, 'গ্রাঁ এনসিক্লো পেদি'র খণ্ডগুলো, মিউজিক বাক্স, পুতুল আর চাঁদামাছ উঠে গেলো আকাশে, ঠিক যখন খামারের শেষ ধ্বংসাবশেষ নেমে এলো ধ্বসের মতো গড়িয়ে। গাছগুলো নুয়ে পড়লো অভিবাদনে, শিখরগুলো মুখ ফেরালো দক্ষিণে, মাটি থেকে উপড়ে এলো শেকড়। আর সারা রাত ধ'রে, বৃষ্টির দিকে মুখ ফিরিয়ে, সমুদ্র পাহাড়ের ঢালে রেখে গেলো লবণের দাগ।

সেই মুহূর্ত থেকে আর কখনো কেউ দেখতে পায়নি তি নোয়েলকে, দেখতে পায়নি তার সবুজ রেশমি কুর্তা, স্যাল্‌মন ঝালরের আস্তিন—হয়তো সেই ভিজে-যাওয়া গৃধিনীটা ছাড়া, যে সব মৃত্যুকেই বদ্‌লে ফ্যালে নিজের উপকারে, যে বসেছিলো ডানা ছড়িয়ে, নিজেকে শুকোচ্ছিলো রোদ্দুরে, পালকের এক এলো-পাথাড়ি সমাবেশ, যে শেষটায় গুটিয়ে তুললো নিজেকে আর উড়ে গেলো বোয়া কাইমঁর ঘন ছায়ার মধ্যে।

কারাকাস, ১৬ মার্চ, ১৯৪৮

'এই মর্তের রাজত্ব' প্রসঙ্গে

আলেহো কার্পেন্তিয়ের যখন ছাত্র, সেই সময় প্যারিসে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো গুয়াতেমালার ঔপন্যাসিক মিগেল আন্‌হেল আস্তুরিয়াসের, যিনি পরে ষাটের দশকের শেষে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পাবেন। আন্‌হেল আস্তুরিয়াস প্যারিসে এসেছিলেন মাইয়া বা মায়া সভ্যতার কিংবদন্তি, লোকপুরাণ ও রীতিপার্বণ নিয়ে কাজ করতে—যে-কাজটার জন্য তিনি ডক্টরেট পাবেন। প্যারিসেই কার্পেন্তিয়ের ও আন্‌হেল আস্তুরিয়াসের সঙ্গে আমরণ বন্ধুত্বের সূত্রপাত। এরই কাছাকাছি সময়ে প্যারিসে আরো দুজন বিদেশী ছাত্রের মধ্যে সৃষ্টিশীল বন্ধুত্বের জন্ম হয়েছিলো—সেনেগলের কবি লেওপোল্ড সেডার সেংহর আর মার্তিনিকের কবি এমে সেজেয়ারের—আর সৃষ্টি হয়েছিলো 'নেগ্রিচুড' আন্দোলনের। পরে আলেহো কার্পেন্তিয়েরের সঙ্গে এমে সেজেয়ারেরও ঘনিষ্ঠতা হবে, হাবানার কাসা দে লাস আমেরিকাস থেকে বেরুবে এমে সেজেয়ারের কবিতার ইস্পানি অনুবাদ—আর আমাদের মনে প'ড়ে যাবে এক সময় কাসা দে লাস আমেরিকাস-এর পরিচালক ছিলেন আলেহো কার্পেন্তিয়ের।

এঁরা সবাই যখন ছাত্র হিশেবে প্যারিসে, তখন ইওরোপে, বিশেষত ফ্রান্সে, পরাবাস্তববাদের তুখোড় প্রভাব। পরবাস্তববাদের প্রবক্তা আন্দ্রে ব্রেতঁ তখনও এমে সেজেয়ারের কবিতা 'দেশে ফেরার খাতা' আবিষ্কার করেননি, কিংবা মেহিকোয় (মেক্সিকোয়) এসে আন্দ্রে ব্রেতঁ এ-কথাও বলেননি যে 'পরাবাস্তবদের কোনো স্বদেশ যদি থেকে থাকে, তবে সেটা এই দেশ', আর এই দেশ মানে সম্প্রসারিত অর্থে গোটা লাতিন আমেরিকাই। তবু প্রশ্নটা থেকেই যায়: পরাবাস্তববাদ কতটা প্রভাবিত করেছিলো এই লেখকদের? না কি তাঁরা তাঁদের রচনার উপাদানগুলো পেয়েছিলেন লাতিন আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান অথবা আফ্রিকার ঔপনিবেশিক বাস্তবতায়? এমে সেজেয়ার কুবায় (কিউবা) এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, পরাবাস্তববাদ তাঁকে তাঁর কবিতার ভাষা কেমন হবে

সে-সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তুলেছিলো। আর তিনি ঋণ স্বীকার করেছিলেন লোত্রেয়ামঁর কাছে—যিনি বলাই বাহুল্য, 'ফরাশি ফরাশি' অর্থাৎ ফ্রান্সের ফরাশি নন—তাঁরও উৎস ঔপনিবেশিক জগৎ। অন্যরা, বলা উচিত, অস্বীকার করেছেন পরাবাস্তববাদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের কথা। লাতিন আমেরিকার লেখকদের অন্তত একটা সুবিধে ছিলো—তাঁরা ফরাশি ভাষায় লেখেন না, তাঁরা লেখেন ইস্পানি ভাষার লাতিন আমেরিকান সংস্করণ—যে-সুবিধেটা লেওপোল্ড সেডার সেংহর অথবা এমে সেজেয়ারের ছিলো না। তাছাড়া, স্পেনের সঙ্গে সম্পর্কের দরুণই হয়তো-বা, লাতিন আমেরিকার কথাসাহিত্যে অন্তত ছিলো বারোক প্রভাব, যে-কথাটা এসেছে হয় পোর্তুগিস 'বারুরোকো' থেকে যার মানে 'অসমাঙ্গ মুক্তো', আর নয়তো লাতিন 'ভেরুকা' থেকে, যার মানে ঢল, উৎরাই, টৌল—যদিও বারোক কথাটা প্রায়শই অসম্ভব, অবিশ্বাস্য, কিম্ভূতকিমাকার এ-সবেরই সমার্থক হিশেবে ব্যবহার করা হচ্ছিলো—অ্যাবসার্ড অথবা গ্রোটেস্কেরই কোনো-একটা পারিভাষিক নাম। প্রখর কল্পনা, প্রচণ্ড উদ্ভাবনী নৈপুণ্য, বিচারবোধের সজীব প্রয়োগ, এরই সঙ্গে বারোক রচনায় মিশেছিলো এমন শ্রী ও লাবণ্য আলেকজাণ্ডার পোপ যাকে বলবেন 'grace beyond the reach of the art'।

পরাবাস্তববাদের সঙ্গে লাতিন আমেরিকার আধুনিক কথাসাহিত্যের কোনো সংযোগ আছে কিনা—এ-প্রসঙ্গটা আদৌ অবান্তর নয়, যদিও প্রায় প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য লেখকই এই সংযোগের কথা অস্বীকার করেছেন। গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস তাঁর রচনাভঙ্গিকে বোঝাবার জন্য ব্যবহার করেছেন 'ম্যাজিক রিয়ালিজমের' কথা—আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে-শব্দ দুটি পাশাপাশি বসতেই পারে না, অথচ পাশাপাশি বসবার পর এই দুই শব্দের সংঘর্ষে ফুলঝুরির মতো ফুলকি বেরিয়ে আসে বৈকি। কিন্তু গার্সিয়া মার্কেস যখন কিশোর, যখন তিনি লিখতেও শুরু করেননি, তখন ১৯৪৩ সালে একবার হাইতি বেড়াতে এসেছিলেন আলেহো কার্পেন্তিয়ের—আর হাইতিতে এসে, সেখানকার মানুষজন, সেখানকার রাজনীতি, আচারব্যবহার, সংস্কৃতি এইসব দেখে বলেছিলেন 'লো রেয়াল মাভিস্মোসো,' মার্ভেলাস আর রিয়্যালের সম্ভবত এই প্রথম একসঙ্গে প্রয়োগ।

কেন হাইতি তাঁকে এই কথা মনে করিয়েছিলো? কেন না হাইতিতেই মিশেছিলো ইওরোপ, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকা। ক্যারিবিয়নের অন্য

অনেক রৌদ্রে ঝলশানো দ্বীপের মতোই হাইতিতে, যে-দ্বীপগুলো সম্বন্ধে এমে সেজেয়ার লিখেছেন 'দেশে ফেরার খাতা'য়:

দ্বীপগুলো, জলের যারা কাটা দাগ
দ্বীপগুলো, আঘাতের যারা প্রমাণ
দ্বীপগুলো, যারা চুরমার
দ্বীপগুলো, যারা অরূপিত
দ্বীপগুলো, বাজে কাগজের মতো জলের ওপর ছেঁড়া, ছড়ানো
দ্বীপগুলো, ভাঙা-ভাঙা সেই ফলাগুলো, যারা সূর্যের জলন্ত
তরোয়ালের গায়ে ঝন বেজে ওঠে
অবাধ্য কাণ্ডজ্ঞান তুমি পারবে না জলের ওপর অর্থহীনভাবে
গ'ড়ে তুলতে
আমার পিপাসার স্রোতের কাছে নতজানু
তোমাদের মূর্তি, হে অবয়বহারানো দ্বীপগুলো,
তোমার পূর্ণ রূপ, হে আমার তেরিয়া প্রতিরোধ।

দ্বীপগুলো, বলয়ের মতো সাজানো, তুলনাহীন জাহাজের
ওলটানো খোল, আমার সিন্ধুহাতে তোমাকে আমি আদর
করি। তোমাকে দোল দিই আমার বাণিজ্য বায়ুর গল্পে।
লেহন করি তোমায় আমার শ্যাওলার জিহ্বায়···

হাইতিতেই ইওরোপের লোভ আর লালসা প্রকাণ্ড দানবিক রূপ পেয়েছিলো। এসেছিলো স্পেনের কোন্‌কিস্তাদোর, এসেছিলো ফরাশি ঔপনিবেশিক, এসেছিলো ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ। দাস এসেছিলো আফ্রিকা থেকে। ছিলো—বেশির ভাগকেই মেরে ফেলবার পর—ইণ্ডিয়ানও। কিন্তু হাইতিতেই প্রথম উপনিবেশ-বাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলো মানুষ। লড়াই করেছিলো স্বাধীনতার জন্য, মুক্তির জন্য। এমন-কী হাইতিই ছিলো, যদিও-বা ক্ষণস্থায়ী, নেহাৎই সাময়িক, নতুন জগতের প্রথম স্বাধীন দ্বীপ—তুস্যাঁ লেভেরতিউরকে নাপোলীয়ঁ

জুরা পাহাড়ে বন্দী ক'রে রাখবার আগে, হাইতি এমন-কী কিছুকালের জন্য স্বাধীনও হয়েছিলো। স্বাধীন হয়েছিলো এমন-কী অঁরি ক্রিস্তফের আমলেও।

হাইতির ইতিহাস কার্পেন্তিয়েরকে কেবল রিয়্যাল আর মার্ভেলাস-এর সংযোগসূত্রগুলোই খুলে দেখায়নি, তাঁকে দেখিয়েছিলো বিদ্রোহ আর স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ। ব্যর্থ বিদ্রোহ, ব্যর্থ স্বাধীনতা। মাকান্দাল, বুকম্যান, অঁরি ক্রিস্তফ। আর রচিত হয়েছিলো, তাঁর এই হাইতি ভ্রমণের সাক্ষী, 'এই মর্তের রাজত্ব'। লক্ষ করতে হবে, সবগুলো বিদ্রোহকেই দেখানো হয়েছে আফ্রিকা থেকে উৎপাটিত এক কালো ক্রীতদাসের চোখ দিয়ে। সে লেখাপড়া শেখেনি, সে বিশ্বাস করে অলৌকিকে, এই মর্তের বাইরেও কোনো অন্য জগতের অস্তিত্বে, তার বিশ্লেষণ নেই—কিন্তু আছে অনুভূতি আর তুখোড় কল্পনা। আর তি নোয়েলের চোখ দিয়েই দেখানো হয়েছে ব'লে অন্য আয়তন পেয়ে যায় এই উপন্যাস—বিদ্রোহ আর স্বাধীনতার কত রকম অর্থ আর টানাপোড়েন গজিয়ে ওঠে। দাস ছাড়া আর কেই বা বোঝে স্বাধীনতার সর্বাঙ্গীন অর্থ?

ঐতিহাসিক উপন্যাস এটা, কেন না ইতিহাসই এর বিষয়। অঁরি ক্রিস্তফই শুধু নয়, পাউলিনা বোনাপার্ট ও অন্য অনেক চরিত্রই ইতিহাসের মানুষ। শিক্ষিত এই রচনা, শিক্ষিত ও পরিশীলিত। অঁরি ক্রিস্তফকে নিয়ে এমে সেজেয়ারও নাটক লিখেছেন—'রাজা ক্রিস্তফের ট্র্যাজেডি'—কেন না অঁরি ক্রিস্তফ সবসময়েই ভাবিয়েছে উপনিবেশের মানুষদের, তাঁর দুর্বোধ্য প্রহেলিকা এখনও পুরোপুরি ভেদ করা যায়নি—কেন বিদ্রোহ জন্ম দেয় স্বৈরাচারীর—যেটা আফ্রিকা, এশিয়া বা লাতিন আমেরিকায় আমরা বারে-বারে ঘটতে দেখেছি। সেই অর্থে এই বইয়ের বিষয়বস্তু এখনও সজীব, এখনও প্রাসঙ্গিক—আর তি নোয়েল তাই নিছক একজন মাত্র দাসই নয়—প্রায় সব ক্রীতদাসেরই প্রতিভূ।

আলেহো কার্পেন্তিয়ের (১৯০৪-১৯৮০) কালো মানুষের অভিজ্ঞতা নিয়ে অনেক লিখেছেন—তাঁর অপেরা 'লা পাসিয়ঁ নোয়া' ঝড় তুলেছিলো প্যারিসে। তিনি লিখেছেন কুবার সংগীতের প্রামাণিক ইতিহাস। বাতিস্তার আমলে জেলে যেতে হয়েছে তাঁকে, ১৪ বছর কাটিয়েছেন নির্বাসনে, ভেনেজুয়েলায়, কারাকাসে। তাঁর 'হারানো পদক্ষেপ' উপন্যাস এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কটি উপন্যাসের একটি। পাঁচবার তাঁর নাম প্রস্তাবিত হয়েছিলো সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের জন্য, কিন্তু কমিউনিস্ট ব'লে—বিশেষত কুবার কমিউনিস্ট ব'লে—তাঁকে সে-পুরস্কার দেয়া হয়নি—তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাবশিষ্য গার্সিয়া মার্কেসকে সে-পুরস্কার দিয়ে

নোবেল সমিতি অন্তত একটা প্রায়শ্চিত্ত করেছে। কার্পেন্তিয়েরের মা রুশী ব্যালেরিনা, বাবা ফরাশি স্থাপত্যবিদ। কিন্তু কার্পেন্তিয়েরের জন্মই শুধু কুবায় হয়নি, তিনি নিজেকে ওতপ্রোতভাবে কুবার মানুষ ব'লেই মনে করতেন। ১৯৫৯-এর পয়লা জানুয়ারিতে বাতিস্তার অপসারণের পর তিনি ফিরে আসেন কুবায়, সরকারি প্রকাশভবন কাসা দে লাস আমেরিকাস-এর অধ্যক্ষ ছিলেন কিছুদিন, ছিলেন ফ্রান্সে কুবার রাষ্ট্রদূত। কুবার স্বাধীনতার পঁচিশ বছর হ'লো এ-বছর, কেনেডি বা রেগান সত্ত্বেও। সেই উপলক্ষে কুবার সাহিত্যের এমন-একটা নিদর্শন তুলে দেয়া যাক, যার বিষয়বস্তু স্বাধীনতা—আর রচনা হিশেবে সেটা শুধু চমকপ্রদই নয়—কথাসাহিত্যেরও একটা গরীয়ান স্তম্ভ ব'লে স্বীকৃত। 'বিভাব'-এর বিশেষ ক্রোড়পত্রে তাই, এইজন্যেই, আলেহো কার্পেন্তিয়েরের আবির্ভাব।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

BIVAV

Price : Rs. 8 00 | July—Sept. '84 | Regd. No.

Vol. 7 No. 4 | Special Autumn Issue | RN. 30017/76

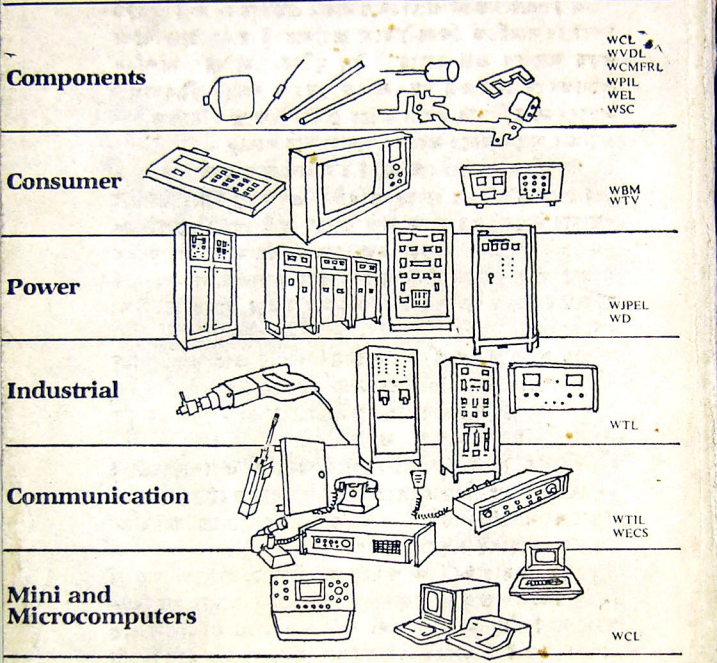

For your new Electronic Projects at Saltlec contact

WEBEL

West Bengal Electronics Industry Development Corporation Ltd

225-E Acharya J.C. Bose Road,
Calcutta-700 020, India.

Phones 44-2645; 43-1915/1981
Telex 021-2242
Gram BENTRONICS

WEBEL
The nucleus of 14 electronic companies now activates SALTLEC —

Salt Lake Electronics Complex

AGIL/WEBEL-1/84